গান্ধী ও স্টালিন

রচনা

লুই ফিশার

অনুবাদ

শ্রীমতী কমলা দত্ত

সম্পাদনা

শ্রীজগদিন্দু বাগচী

রিডার্স কর্ণার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী ১৩৫৮

দাম চার টাকা

প্রচ্ছদপট
কাফি খাঁ

কলিকাতা ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন থেকে শ্রীসৌরেন্দ্র মিত্র এম. এ. প্রকাশ
করেছেন আর ঐ ঠিকানায় বোধি প্রেসে শ্রীনৃপেন্দ্র হাজরা ছেপেছেন

নিবেদন

ভারতবর্ষের বাইরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রয়েছে প্রগাঢ় অজ্ঞতা, রয়েছে ভারতবর্ষেও। এরই প্রত্যক্ষ ফল হলো পাকিস্তান, কাশ্মীর, নব-ভারতের শাসনতন্ত্র···কিন্তু ঘরের কথা এখন থাক।

বাইরের প্রগাঢ় অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে যে দু'-চারজন মনীষী ভারতবর্ষে এসে চেনবার চেষ্টা করেছেন ভারতবর্ষকে, অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের মর্মবাণী, চেয়েছেন ভারতবর্ষের উপদেশ, আমেরিকার লুই ফিশার হলেন তাঁদের মধ্যে একজন। আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কাছে মোটেই অপরিচিত নয় তাঁর নাম। ম্যাক্সমূলারের সগোত্র তিনি নন, নন মাদাম ব্লাভাৎস্কি, কি অ্যান বেসান্তেরও, কোনও কুটুম্বিতা নেই তাঁর সিস্টার নিবেদিতা কি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে। মনে প্রাণে পুরোপুরি আমেরিকান তিনি।

লুই ফিশার

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়া শহরে দরিদ্র অবস্থার মধ্যে তাঁর জন্ম; দারিদ্র্যের মধ্যেই কেটে যায় তাঁর আগা-গোড়া উঠতি জীবনটা—শোনা যায় কুবেরের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেও, ১৭ বৎসর বয়সের পূর্বে বিদ্যুতের আলোয় বসে লেখাপড়া করা কাকে বলে তা' জানবার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। বিদ্যুৎ-প্রদীপেরও

তলায় যে কতখানি অন্ধকার দানা বেঁধে নিরন্ধ্র হয়ে উঠতে পারে, তরুণ বয়সেই সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন তিনি। আমাদের এই দরিদ্র দেশে বাস করে এ বিষয়ে এমন নিচ্ছিদ্র জ্ঞান লাভ করা না কি একান্তই দুষ্কর—এ দেশের উদার আকাশের তলায় অন্ধকারেও না কি চলে আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি খেলা। তাঁর গুণগ্রাহীরা বলেন এই থেকেই তাঁর অন্তরে উপজাত হয় সর্ব-মানবের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আর এরই পরিণতি-স্বরূপ তিনি হয়ে উঠেছেন সাম্রাজ্যতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, আর সামগ্রিক-তন্ত্রের ঘোর বিরোধী।

অল্প বয়সেই জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় তাঁকে গ্রহণ করতে হয় শিক্ষকতার কাজ। অনেকের মতে এরই ফলে তাঁর অন্তরে উপ্ত হয় শিক্ষকতার বীজ—সাংবাদিক-মহলে তিনি হচ্ছেন আপন দায়িত্বে সর্ব-মানবের শিক্ষক।

বৎসর ২২ বয়সের সময় তিনি প্রথম দেশের বাইরে পদার্পণ করেন—যান ইউরোপ পরিভ্রমণে। সেটা ছিল ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের প্রথম পর্বের অব্যবহিত পরবর্তী কাল। রণক্লান্ত, বিধ্বস্ত ইউরোপের অর্বাচীন পুনর্গঠন-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এই সময় হয় তাঁর প্রাথমিক চাক্ষুষ জ্ঞান।

ক্রমে বলশেবিক রুশিয়া অবধি সফর করেন তিনি। দেখতে দেখতে হয়ে পড়েন নবীন রুশিয়ার একজন গুণগ্রাহী—ভক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না বোধহয়। এই রুশিয়াই আবার তাঁর জীবনের বৃন্দাবন, এখানেই তাঁর জীবন-সঙ্গিনী আর তাঁর মধ্যে হয়ে যায় চার চোখের মিলন। দীর্ঘ ১৪ বছর বলশেবিক রুশিয়ায় কাটিয়ে এসেছেন লুই ফিশার, সযত্নে শিক্ষা করেছেন রুশীয় ভাষা, আলাপ করেছেন রুশিয়ার ছোট, বড়, মাঝারি অনেকের সঙ্গে—মহাসেনাপতি স্টালিনের সঙ্গে পর্যন্ত এবং একবার একটানা ছয় ঘণ্টা কাল।

এ হেন রুশিয়াকেও শেষ অবধি হার মানতে হয় এই আমেরিকান সাংবাদিকের কাছে। আসেন লুই ফিশার ভারতবর্ষে—ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে। বিশ্বজগতেরই ইতিহাসের এক বিরাট যুগসন্ধি সেটা। দর্শন করেন তিনি ভারতবর্ষের মহত্তম প্রাণ-মন্দির মহাত্মা গান্ধীকে। বোধহয় লাভ করেন তাঁর চিরন্তন জিজ্ঞাসার সদুত্তর।

তারই ফলস্বরূপ প্রথমে আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই 'গান্ধীর সঙ্গে এক সপ্তাহ', তারপর 'সাম্রাজ্য', আর এই 'গান্ধী ও স্টালিন'। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর এক জীবনীও রচনা করেছেন তিনি।

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় 'থীসিস্ অ্যান্টি-থীসিস্-সিন্থেসিস'-এর ভূত আর সনাতনী সংস্কারের অতৃপ্ত আত্মা, এই দুই তাল-বেতাল মিলে অতি-আধুনিক ভারতবর্ষে যে মহা-তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছে, দিগ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে ভারতের আজকের দিনের তরুণ এবং অদূর ভবিষ্যতের প্রবীণ মনীষাকে, সযত্নে তাদের পাশ কাটিয়ে চলেছেন লুই ফিশার। এরই ফলে, আমাদের দেশে স্বল্প কিছুকালের জন্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেও, বিশ্ব-মনীষীদের তালিকা থেকে নাম কাটা গেছে তাঁর।

অনুরূপ অপরাধে স্বয়ং গান্ধীজীরও নাম কাটা গিয়েছিল একদিন।

তাই কাটা নামের তালিকার সঙ্গে মিলিয়েই বইখানিকে নস্যাৎ করে দিতে পারিনি আমরা। বইখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পক্ষে আমাদের অন্যতম প্রধান যুক্তি হলো এই। বইপত্রকে 'নিষিদ্ধ' তালিকাভুক্ত করায় আস্থা নেই আমাদের।

জন্মাষ্টমী
১৩৫৮

জবা

সূচী

প্রথম অধ্যায়

জগতের ব্যাধি কোথায়?

গত পঞ্চাশ বৎসর অভাবনীয় উন্নতির সাক্ষী, কিন্তু সে উন্নতির মধ্যে পাইনে প্রাচুর্য ও প্রশান্তির আশ্বাস।

১৯১৯-২০ সালের বিবিধ সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মারফৎ শোনা যেত দ্বিতীয় মহাসমর সম্বন্ধে অজস্র সার্থক ভবিষ্যদ্বাণী। আবার দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যেই এবং তার অবসানের পরও কলরব উঠেছে অনাগত তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে। বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তাই আজ বিশ্বমানবের জীবনের মহাসমস্যা।

"পৃথিবীর দুই শ' কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকের জন্যে যথোপযুক্ত আহার্যের সংস্থান করবার মতো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আজ আমাদের করায়ত্ত হয়েছে"—এ কথা ঘোষণা করেছিলেন ডাঃ চার্লস্. এফ্. কেটারিং।* তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, ১৫০ কোটি লোককে, অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার তিনচতুর্থাংশ নরনারী ও শিশুকে দিনযাপন

---

* Dr. Charles F. Kettering, General Motors Corporation-এর গবেষণা-শাখার সহ-সভাপতি এবং American Association for the Advancement of Science, অর্থাৎ আমেরিকার বিজ্ঞানোন্নতি-পরিষদের, সভাপতি।

করতে হয় অর্ধাশনে। বিশ্বমানবের জীবনের দ্বিতীয় মহাসমস্যা হচ্ছে এই মানবসৃষ্ট অথচ প্রতিকারসাধ্য দারিদ্র্য।

মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশই তাই আজ রণ-সম্ভাবনায় শঙ্কিত এবং অভাবের দ্বারা নিপীড়িত।

অনিশ্চয়তার রাহুগ্রস্ত মনুষ্যত্ব।

বিবিধ শাসনযন্ত্র ও কূটতন্ত্রেও পরিস্ফুট এই নিরাপত্তার অভাব। ব্যষ্টির জীবনেও হয় বিস্মৃতি লাভের আগ্রহে, নয় নিরাপত্তা সাধনের উন্মাদ প্রচেষ্টায় এ ব্যাধি আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে আজ ভাঙন ধরেছে লোকের মানসিক স্থৈর্যে, তার স্বাস্থ্যে, তার অভ্যাসে, তার নীতিধর্মে, ব্যবসায়ে, নির্বাচন-প্রথায়, আইনের বিধি-বিধানে।

অর্থশালীদের কেউ কেউ তাঁদের আর্থিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকলেও থাকতে পারেন। তবু একথা আজ তাঁদেরও অজানা নেই যে, বর্তমানের এই যে শান্তি এ হলো পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতোই অস্থির; আর জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক, একথা অন্তরে অন্তরে তাঁরা বেশ অনুভব করে থাকেন যে, এই বিশ্বজোড়া বিরাট বুভুক্ষার সামনে, গৃহহীন জীর্ণচীর অগণিত মানবের সামনে, তাঁদের এ নিরাপত্তা কত বড় অন্যায়েরই না প্রশ্রয় দিচ্ছে—বিশেষতঃ বিজ্ঞান ও শিল্পের সমবেত শক্তি অনায়াসেই যখন পারত এই অভাব মোচন করতে!

এই সব দৃশ্যতঃ দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধানে হতাশ হয়ে দুঃখী

মানুষ এসে সান্ত্বনা খোঁজে ভোগবিলাসের মধ্যে, নয় তো ছুটে যায় যা কিছু দৃশ্যতঃ স্থায়ী, যা কিছু আপাতদৃষ্টিতে অভ্রান্ত ও শক্তিশালী এবং আশার বাণীতে মুখর তারই দিকে। নিরাপত্তার অভাব থেকেই উদ্ভব লাভ করে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ একনায়কত্বের প্রতি আগ্রহ। সুখের জন্য অসুখী মানবদল অবহেলে দেয় স্বাধীনতা বিসর্জন। হতাশাই সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রধান সহায়।

এই সব আশাহীন, সহায়হীন, সম্বলহীন, ক্লিষ্টের দলই অনায়াসে ডিক্টেটরদের কবলে পড়ে যায়।

শুধু এক সুসংহত শান্তি আর সর্বজনীন প্রাচুর্যের ফলেই হতে পারে আজ স্বৈরতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ।

বিশ্বজগৎ এসে উত্তীর্ণ হয়েছে এক সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে। এ সঙ্কটের সব চেয়ে বড় দুর্লক্ষণ হচ্ছে সামান্যতম নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের ভরসায় জনগণ কর্তৃক অবহেলে স্বাধীনতা ও নীতিধর্মে জলাঞ্জলি দেবার প্রবণতা। মুসোলিনী তাঁর দেশের যানবাহনের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন ; অতএব দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপসাধন, তাঁর প্রতিপক্ষদের গোপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা, শতসহস্র লোককে কারাগারে প্রেরণ, অথবা ইথিওপিয়ার অধিবাসীদের 'সভ্য' করে তোলার অজু-হাতে বিষবাষ্প প্রয়োগে তাদের ধ্বংসসাধন করায় ক্ষতিটা কি ? হিটলার জার্মান জননীদের জন্যে রাষ্ট্রসাহায্যের, শিশুদের জন্যে ভরণপোষণের, বেকারদের জন্যে কর্মসংস্থানের, দেশসেবীর

জন্যে রুটির এবং শ্রমিকদের আহার্য ও সঙ্গীতরস আস্বাদনের সুব্যবস্থা করেছিলেন বলে সগর্বে ঘোষিত হয়েছিল তাঁর নিজের দৈনিক পত্রিকা Voelkischer Beobachter-এর ১৯৩৯ সালের নববর্ষ-দিবসে। তবে আর একটা সমগ্র জাতিকে দাসত্বের নাগপাশে শৃঙ্খলিত করায় এবং সমগ্র বসুন্ধরাকে রক্তস্নাত করে তুলতে প্রস্তুত হওয়ায় জার্মানদের বা অপর কারও ক্ষতিটা কী?

ডিক্টেটর-মাত্রেরই গর্ব দেশে শিল্পসম্ভারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, গগনচুম্বী সৌধাবলী প্রতিষ্ঠা, অস্ত্রসজ্জা, শৃঙ্খলা স্থাপন ও প্রকৃতি-পুঞ্জের জন্যে বিনামূল্যে বিবিধ উপঢৌকন বিতরণ। তাদের ক্ষুৎ-পীড়িত রেখে তাদের অন্তরে বিভীষিকার সৃষ্টি করে, কল্পনার দূর-দিগ্বলয়ে তাঁরা সৃষ্টি করেন জাতীয় গৌরবের স্বর্গলোক, আর তারই অবসরে বিমূঢ় বিভ্রান্ত দেশবাসীকে তাঁরা করকবলিত করেন অলক্ষ্যে, ধীরে ধীরে। ক্রমে ডিক্টেটরদের সম্বন্ধে জনগণের মনে জাগে একটা ভীতি, উপজাত হয় সম্ভ্রম। সন্নীতিও স্বাধীনতা স্বৈরাচারীদের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত নয়; সামান্য একটা কলকারখানা, কি একটা বাণিজ্যপথের তুলনায় ঐগুলি তাঁদের কাছে অকিঞ্চিৎকর।

এই ভাবে একটার পর একটা করে চোখের সুমুখে প্রাচীরের পর প্রাচীর জেগে উঠতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রাচীর যে তৈরী করে সে দেখতে পায়, তার আপন হাতে গড়া প্রাচীরের মাঝে নিজে সে বন্দী,—কখন সে বিক্রীত হয়ে গেছে কঠিন শ্রম ও মিথ্যাচারের বিনিময়ে!

সুতরাং কোনো দেশের কলকারখানা বা স্থাপত্যের সংখ্যা দিয়ে সে দেশের স্বাধীনতার মূল্য যাচাই করা যায় না। আধুনিক ফেরেঁাগণ এমন সব ক্রীতদাসদের দিয়ে পিরামিড তৈরী করাচ্ছেন যারা জানে পরাধীনতার গ্লানি কাকে বলে; তাই তারা মুক্তির পূতসলিলে অবগাহনের আশায় সানন্দে যুগযুগান্ত ধরে মরুকান্তারে পরিভ্রমণ করতে সম্মত।

পিরামিডের গহ্বরে আছে ম্যমি: আছে নিশ্চিন্ত নীড়, আছে গোপন আশ্রয়, কিন্তু নেই বিন্দুমাত্র মায়ামমতা; আছে শুধু নীতিধর্মবর্জিত পশুবল। আর সেই পিরামিডের সন্নিধানে রয়েছে স্ফিংক্স—বাক্যহারা ভীষণ মৌন!

রণরাক্ষসের রসদ জোগাতে গিয়ে কোন-একটি জাতি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পারে তার মুখের গ্রাস, নিরাপত্তার আশায় সাজতে পারে দুর্মতি দুঃশাসন। তবু নাৎসী জার্মানী আজ কোথায়? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির বিলোপ সাধন করে কোনো-একটি বৃহৎ জাতি নিজের চারিদিকে হয়তো একটি নিরাপদ সুখস্বর্গমণ্ডলী রচনা করে তুলতে পারে, কিন্তু ঠিক সেই শ্রেণীরই অপর এক মণ্ডলীর সঙ্গে তখন তার সংঘর্ষ উঠবে অনিবার্য হয়ে, আর সেই সংঘর্ষের ফলেই একদিন বেধে যাবে কুরুক্ষেত্র।

ডিক্টেটরের গুপ্তপুলিশ যখন অপহরণ করতে পারে তোমার স্বাধীনতা, তখন নিরাপত্তার ভরসা কোথায় তোমার? যে শাসনতন্ত্রের মধ্যে নেই বিন্দুমাত্র নৈতিক চেতনা, আর এই

নৈতিক চেতনার একান্ত অভাববশতঃই যার ক্রিয়াকলাপ দুজ্ঞেয় রহস্যজালে পরিবৃত, সে শাসনতন্ত্রে নিরাপত্তার অর্থই বা কী?

তবুও অনুপম স্থাপত্যের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন আর জনগণকে নিরাপত্তা দানের ক্ষমতা দাবী করার ফলেই বহুক্ষেত্রে জনসাধারণ অবনত শিরে স্বৈরতন্ত্রকে নিয়েছে স্বীকার করে।

বর্তমান যুগের সঙ্কট হচ্ছে মূলতঃ এক নৈতিক সঙ্কট। আমরা বাস করি এমন একটা জগতে যেখানে স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ, উচ্চতর নৈতিক আদর্শের প্রতি মমত্ববোধ, অন্যায়ের প্রতি বীতস্পৃহার শক্তি, এবং মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, সবই এসেছে ক্ষয় পেয়ে। রাজনীতিকদের বিফলতার প্রধান কারণ এটাই।

সাক্কো (Sacco) এবং বানেত্তীর (Vanzetti) বিচার-প্রহসন ও প্রাণনাশ সচকিত করে তুলেছিল সমগ্র আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে। টম মুনীর (Tom Mooney) বিচারেও ঘটেছিল অনুরূপ ঘটনা। কিন্তু আইনের নামে লক্ষ লক্ষ লোকের হত্যাকাণ্ড ইদানীং আর সংবাদ হিসাবেও সংবাদ-পত্রের শোভাবর্ধন করে না। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সাইবেরিয়ায় রুশিয়ার জারের গুপ্তপুলিশের পাপাচার, বেলজিয়ান কঙ্গোতে ক্রীতদাসদের নিপীড়ন, বৈরীস্বরূপ ইহুদীদের নির্যাতন, আর্মেনিয়ানদের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি নানা ঘটনা সমগ্র জগৎকে সরোষে স্তম্ভিত মর্মাহত করে তুলত। কিন্তু অন্তরীণাবাসের (concentration camp) লক্ষ লক্ষ বন্দীর করুণ গাথা আজ কারও চিত্তে ভাবনার

শিহরণটুকুও জাগায় কি না সন্দেহ। ১৯৪২-৪৩ সালের মন্বন্তরে বাঙলায়ই তো মারা গেল অন্ততঃ দশ লক্ষ লোক; পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদীকে প্রাণ দিতে হয়েছে হিটলারের হাতে। এই তো ঠিক এই মুহূর্তটিতেই কোটি কোটি লোক অনাহারে দিনযাপন করছে চীনে, ভারতবর্ষে ও ইউরোপে। টিটো, ফ্রাঙ্কো, সালাজার, পেরোঁ প্রমুখ ডিক্টেটরগণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন প্রজাদের সমস্ত অধিকার। জাতীয়তার উগ্র উন্মেষের সাথী হলো পরজাতিবিদ্বেষ।

আমাদের এই ঐশ্বর্যমণ্ডিত, প্রগতিশীল, আধুনিক পৃথিবীতে আজ দুর্দশা ও অত্যাচার এমনই ব্যাপক, এতই অগণিত হয়ে উঠেছে যে, তা অধিকাংশ লোকেরই দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তিকে বহুদূর অতিক্রম করে গিয়ে থাকে। অথবা এমনও হতে পারে যে, মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই মন থেকে এ সব বিষয় সযত্নে পরিহার করে থাকি আমরা; এ সব ব্যাপার সদাসর্বদা মনের মধ্যে জেগে থাকলে বেঁচে থাকা দায় হয়ে ওঠে। কেউ কেউ নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা এবং দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে বোধশক্তি-বিরহিত হয়ে ওঠে; আবার কেউ কেউ এ সব ব্যাপার মোটেই সহ্য করতে পারে না। ভাবপ্রবণ ব্যক্তি সহজেই পড়ে ভেঙে, হয়ে ওঠে জরাজীর্ণ, কিংবা অজ্ঞতা, ঔদাস্য এবং নিস্পৃহতার মধ্যে, নয়তো নিজের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এর বাইরে নিজেকে সে একান্ত দুর্বল, অসহায় ও অকিঞ্চিৎকর বলেই

জানে। এরই ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন রকমের কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে, অথবা জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে কোনরূপ ঔৎসুক্য বোধ করে না সে। আমরা এ সব কাজে হয় একটা আধলা চাঁদা দিয়ে, না হয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে আমাদের কর্তব্য সমাধা করি। প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় এটুকু ত্যাগস্বীকার নিতান্তই নগণ্য।

আর আমাদের এ অলস ঔদাসীন্য যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমস্যাগুলোও হয়ে উঠছে ততই জটিল; সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্ত ডিক্টেটরদের আর রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে চলেছে।

সমস্যার পর সমস্যা আসছে এমনই দুরন্ত দুর্বার বেগে যে, মূল বিষয়ে মনঃসংযোগের অবকাশই মেলে না। একটা অধিবেশনের পর হয় আর একটা অধিবেশন, সন্ধিপত্রের পর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে যায়, রাজনীতিকেরা এ সবের ঘূর্ণিপাকে পড়ে উদ্দেশ্যের খেই হারিয়ে ফেলেন। তাই দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরের অবকাশটুকু বাঁধানো হয়ে আছে বহু 'সফল' অধিবেশনে, অজস্র শান্তিচুক্তিতে, অসংখ্য বিশ্বপ্রেমের বক্তৃতায়, অনেক বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতিতে: লোকার্ণো (Locarno), থয়রি (Thoiry), ১৯২৮ সালের কেলগ্-ব্রিয়াঁ চুক্তি ও ১৯৩৮ সালের মিউনিকের বোঝাপড়ায়। প্রত্যেকটি ঘটনার পরই আশাবাদী রাজনীতিবিশারদগণ উল্লসিত

হয়ে উঠেছেন, কিন্তু আসলে তারই মধ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে একটা মহাযুদ্ধের।

আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া রাজনীতির চলৃতি পরিপ্রেক্ষিত হলো রাজনৈতিক অধিবেশন, সন্ধিপত্র, প্রস্তাব, ব্যবসায়, তৈল সম্বন্ধীয় সুযোগসুবিধা, দলাদলি, ভোট, আইন, লাভ, রাজস্ব, চাকুরী ইত্যাদি ছোটবড় সব ক্ষেত্র জড়িয়ে। এ পরিপ্রেক্ষিত অবশ্য ভ্রান্ত নয়, কিন্তু মানুষের অন্তর ও তার নৈতিক ব্যবহারকে আলোচনা-বহির্ভূত করলে সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতটিই হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ—একদেশদর্শী। রাজনীতির মধ্যে সর্বাগ্রে যে বস্তুটির প্রয়োজন তা হলো নৈতিক সামঞ্জস্য। কেউ কেউ বলেন সমাজনীতির ফলেই গড়ে ওঠে এইরূপ অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য সুবিধাবাদীদের কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত একে অসত্য বলেই প্রমাণিত করেছে বার বার। একমাত্র নীতিধর্মের বলেই গড়ে উঠতে পারে সামঞ্জস্য এবং সদাচার।

মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজন হচ্ছে রাজনীতি ও নীতিধর্মের সমন্বয় এবং ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের সঙ্গে নীতিধর্মের সঙ্গতি। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, এ দুটি হচ্ছে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রত্যেকটি ব্যাপারেরই বিচারের মানদণ্ড হলো তার বাস্তব ফলাফল : "এতে আমার লাভটা কী?"

স্বৈরতন্ত্রে রাজনীতি ও নীতিধর্ম হচ্ছে পরস্পরবিরোধী। উদ্দেশ্যই সেখানে বৈধতা দান করে থাকে উপায়কে ; ফলে মিথ্যা-চার, হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধ, সব কিছুই পর্যবসিত হয় বৈধ ব্যাপারে।

কিন্তু সংজ্ঞা এবং মূলতত্ত্ব উভয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গেলে গণতন্ত্রমাত্রকেই উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হতে হবে।

মহাসেনাপতি স্টালিন ও মহাত্মা গান্ধী স্বৈরতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে বৈপরীত্যের হু'টি মূর্তিমান উদাহরণস্থল। বর্তমান জগতের সর্বপ্রধান বৈপরীত্যও এইখানেই।

জোসেফ স্টালিন কম্যুনিস্ট ডিক্টেটর, সমগ্র রুশিয়ার ভাগ্যবিধাতা, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি; তাঁর একমাত্র লক্ষ্য রাজনীতি। লক্ষ্য সাধনের উপায় সম্বন্ধে কোনও সংস্কার নেই তাঁর। হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণচুক্তি? অন্তরীণাবাস? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা? এ সবই বৈধ ব্যাপার, কেন না এ সবই হচ্ছে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধনের বিবিধ উপায় মাত্র—সে উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতালাভ ও ক্ষমতার সংরক্ষণ।

মহাত্মা গান্ধী সাধু, রাজনীতিক, দ্রষ্টা, আদর্শবাদী সমাজতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি; তাঁর কাছে রাজনীতি ও নীতিধর্ম এক ও অভিন্ন।

মানুষ, উপায় ও বাণী, সকল বিষয়েই এঁদের হু'জনের মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক—পরস্পরবিরোধী।

বুঝি গান্ধীর মধ্যেই রয়েছে শান্তির বাণী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজনীতি আর চীনাবাদাম

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একখানি বিরলপত্র ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন—নাম "হরিজন"। তাঁর স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ এবং প্রশ্নোত্তরের একটি স্তম্ভ থাকে কাগজখানিতে।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ শ্রমিক-শাসনসভার তিনজন পদস্থ সদস্যের দ্বারা গঠিত 'ক্যাবিনেট মিশন' এল ভারতবর্ষে। ভারতের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে একটা বিধিব্যবস্থায় উপনীত হবার জন্যে তাঁরা এসে সাক্ষাৎ করলেন গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে; তা ছাড়া মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আলি জিন্না এবং আরও অনেকের সঙ্গেও।

অবশেষে ১৬ই মে তারিখে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় শাসনতন্ত্র দান করার বিষয়ে নিজেদের এক পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন তাঁরা। প্রশ্ন দাঁড়ালো: ভারত কি ব্রিটিশের সে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে? এ প্রশ্নের অর্থ: মহাত্মা গান্ধী কি তা গ্রহণ করবেন? কেন না ভারতের মহত্তম শক্তিই হলেন মহাত্মা গান্ধী।

গান্ধী চারদিন ধ'রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্তগুলি বিচার করে দেখলেন; তারপর সওয়া এক পৃষ্ঠা ব্যাপী এক প্রবন্ধ লিখলেন;

তাতে তিনি মিশনকে প্রশংসা করে লিখলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই হয়েছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।" ঘোষণা করলেন তিনি, "সচিবসঙ্ঘের সদস্যরা এসেছেন কোন্ উপায় অবলম্বন করলে সব চেয়ে সহজে এবং সব চেয়ে সত্বর ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো যায় তার সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করবার অভিপ্রায়ে।"

হরিজন থেকে এই প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে ভারতের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে ছাপানো হলো। প্রবন্ধের সারমর্ম বেতার মারফৎ পৌঁছল গিয়ে ওয়াশিংটনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও কূটনীতিকদের অবগতির জন্যে; পূর্ণাবয়ব সঙ্কলন প্রকাশিত হলো ব্রিটিশ সংবাদপত্র-মহলে।

হরিজন-পত্রিকায় ব্রিটিশের এই ঐতিহাসিক দানোদ্যোগ সম্বন্ধীয় আলোচনার ঠিক নীচেই গান্ধী-স্বাক্ষরিত আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল—বিষয়বস্তু : 'আম-আঁটির শাঁস।" সে প্রবন্ধে আম-আঁটির শাঁসকে তিনি রবিশস্য ও গোমহিষের খাদ্যের প্রায় সমতূল্য বলে তার গুণবর্ণনা করলেন। লিখলেন তিনি, "আম-আঁটির শাঁস অযথা নষ্ট না করে রান্না করে খেলে বেশ ভালো হয়।"

ঠিক তার পরের সংখ্যাতেই মহাত্মা গান্ধী আলোচনা করলেন প্রাকৃতিক নিয়মে রোগমুক্তির বিষয় নিয়ে। মন্তব্য করলেন তিনি : "প্রাকৃতিক চিকিৎসার আছে দুটো ভাগ, একটা হলো ভগবানের নাম, অর্থাৎ রামনাম, স্মরণে রোগমুক্ত হওয়া,

অপরটি হলো চিত্তশুদ্ধি ও স্বাস্থ্যনীতিসম্মত জীবনযাপনের দ্বারা রোগ প্রতিরোধ করা।" বিশেষ জোর দিয়েই বল্লেন তিনি : "অন্তরে বাহিরে যখন পরিপূর্ণ পবিত্রতা বজায় থাকে তখন রোগ জন্মাতে পারে না কিছুতেই।" তারপর গোদুগ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় লিখলেন তিনি, "গোরুর দুধের সঙ্গে মহিষের দুধের কোনো তুলনাই চলতে পারে না।"

'হরিজন' পত্রিকার এই সংখ্যাটি যেমন, অন্যান্য সংখ্যাও ঠিক তেমনই ; আর এতে করেই অনুধাবন করা যায় গান্ধী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর আগ্রহ ব্যষ্টিজীবন সম্বন্ধে। এরূপ এক-একটি জীবনের থাকে বহু দিক। গান্ধী-চরিত্রও তাই বহু দিক-বিশিষ্ট। সাপ্তাহিক 'হরিজনের' সংখ্যার পর সংখ্যায় বলে গেছেন তিনি, দেশের লোকেরা কি ভাবে চীনাবাদামের চাষ করতে পারে। আবার হয়তো কোথাও জবাব দিয়েছেন কোন-এক মহিলার প্রশ্নের ; প্রশ্ন ছিল কেন তিনি যেখানে সেখানে থুথু ফেলাকে নিন্দা করেন না। জবাব দিলেন, চিরকালই তিনি এ কু-অভ্যাসকে দোষ দিয়ে এসেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন।

এক প্রবন্ধে হয়তো তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার সংজ্ঞা-নির্দেশ করলেন ; তার পরের প্রবন্ধেই হয়তো মিছরি তৈরির জন্যে চিনির রেশন হ্রাস করবার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ; তৃতীয় প্রবন্ধে আবার অপরাধ ও অপরাধীদের সম্বন্ধে আলোচনা হলো ; আবার চতুর্থ প্রবন্ধেই তিনি এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, স্বাধীন ভারত সৈন্যদল পরিপোষণ করা থেকে নিবৃত্ত হবে ;

পঞ্চম প্রবন্ধে বিধান দিলেন যে, মিথ্যাভাষণ কোনো অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়: "সত্যবাদিতায় কোনও ব্যতিক্রমের স্থান নেই।"

মহামানব মহাত্মা গান্ধীর কাছে রাজনীতি এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়, বাদামও এমন কিছু তুচ্ছ জিনিষ নয়।

গান্ধী সম্বন্ধে একটি পরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, প্রত্যহ তিনি দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টাই জনসাহচর্যে বাস করেন এবং তাতেই যেন দিব্য পুষ্টিলাভ করে থাকেন। তাঁর সামান্য শয্যা যখন যেখানে তিনি থাকেন সেখানেই রচনা করা হয়—হোক্ না তা ডাঃ মেহ্‌তার আরোগ্যভবনে অথবা অপর কোথাও। গৃহের অভ্যন্তরে তিনি শয়ন করেন না, কোন খাটপালঙ্কও ব্যবহার করেন না। তাঁর শয়নের খোলা চত্বরটুকু মাটির সঙ্গে সমতল। কাছাকাছি তাঁর কয়েকটি প্রিয় শিষ্যও শয়ন করেন।

ভোর চারটের সময় মহাত্মা ও তাঁর সহযোগীরা প্রার্থনামন্ত্র আবৃত্তি করে থাকেন। তারপর তিনি কমলা বা আমের রস পান করেন এবং চিঠির জবাব দিতে থাকেন নিজ হাতে লিখে। তাঁর বয়স আটাত্তর—তিনি বলেন তাঁর আশা ১২৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। হস্তলিপি তাঁর সবল ও পরিষ্কার; শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুই-ই বেশ প্রখর। দিনে একবার করে রাজকুমারী অমৃত কুঁয়ার এসে এক ব্রিটিশ টেলিগ্রাফ-এজেন্সীর অনুলিপি থেকে দিনের সংবাদগুলি তাঁকে পড়ে শোনান। অমৃত কুঁয়ার হচ্ছেন এক ভারতীয় রাজবংশের খৃষ্টীয় মহিলা। গান্ধীর

সেবায়ই ইনি আত্মোৎসর্গ করেছেন, এবং বর্তমানে গান্ধীর একজন সেক্রেটারীরূপে কাজ করছেন। মহাত্মা নিজে কখনো খবরের কাগজ পড়েন না, রেডিয়োও শোনেন না।

কিন্তু গোটা ভারতবর্ষটাই এগিয়ে আসে এই মহাত্মার সান্নিধ্যে ; আসে সহস্র সহস্র লিপি, আনাগোনা করে শত শত দর্শকের দল। মহাত্মার প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি বাণী, প্রত্যেকটি কাজ তাঁর হাতে-বোনা কটিবাসের কোমরবন্ধে ঝোলানো এক ডলার দামের ঐ নিকেলের ঘড়িটির সঙ্গে একে-বারে কাঁটায় কাঁটায় বাঁধা। অসম্ভব রকমের সময়নিষ্ঠ তিনি। দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারটা সাধারণতঃ চলে এক ঘণ্টা অবধি, ঠিক মুহূর্তটিতেই তিনি তা সাঙ্গ করে ফেলেন। এরূপ ক্ষেত্রে, বলতে গেলে, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র বক্তা। সংলাপ ভালোবাসেন তিনি। বস্তুতঃ যা কিছুই তিনি করে থাকেন তার সবই তিনি বেশ উপভোগ করেন, বিশেষতঃ আলাপ, ভ্রমণ, ভোজন ও নিদ্রা।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে এক চচ্চড়ে গ্রামে মহাত্মার সঙ্গে আমি ছিলাম এক সপ্তাহ। আবার ১৯৪৬ সালে আরও ছয়দিন কাটিয়েছি তাঁর সাহচর্যে। সাড়ে পাঁচটার সময় মহাত্মার সঙ্গে আমি প্রাতর্ভ্রমণে বের হতাম। প্রথম প্রভাতে তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, আমার ঘুম কেমন হয়েছিল। আমি বললাম, একটা মশা কামড়ানোতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছিল। তারপর তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ঘুম কেমন হয়েছিল ?"

"সর্বদাই আমার সুনিদ্রা হয়ে থাকে।"—উত্তর দিলেন তিনি।

পরদিন প্রভাতে তিনি ফের জানতে চাইলেন, আমার ঘুম কেমন হয়েছিল। আমি বল্লাম, "চমৎকার, আর আপনার?"

"প্রশ্ন কোরো না," উত্তরে বল্লেন তিনি : "সর্বদাই আমার সুনিদ্রা হয়ে থাকে।"

তৃতীয় প্রাতে ফের আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর ঘুম কেমন হয়েছিল। "প্রশ্ন করতে বারণ করিনি!"—বল্লেন তিনি।

তামাসা করে বললাম, "ভেবেছিলাম ভুলে গেছেন হয়তো।"

"ও, ভাবছ বুঝি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছি! তুমি ঘুমিয়েছিলে কেমন?"

"জিজ্ঞেস করবেন না," আমি বল্লাম।

হেসে উঠলেন তিনি, বললেন—"আচ্ছা, এক মাঘে শীত পোয়ায় না।"

দিনকয়েক প্রভাতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। একদিন একটু আপত্তির সুরেই বললাম, "আজ এই বৃষ্টিতে আর বেড়াতে বেরুবেন না নিশ্চয়ই?"

"বেরুবো বৈ কি! এসো। বুড়ো মেরে যেয়ো না।"

চার বৎসর আগে যতটা তাড়াতাড়ি হাঁটতেন তিনি, তার চেয়ে পদক্ষেপ তাঁর হয়ে এসেছে মন্থর, তবুও সে পদক্ষেপে প্রকাশ পায় তাঁর অন্তরের পরম উল্লাস, পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে একটানা হেঁটেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন না তিনি। ফিরে আসার পর

দ্বিতীয় বারের মতো প্রাতরাশ সেরে নিয়ে লেখার কাজে মন দেন তিনি, আগন্তুকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, তারপর ডাঃ মেহ্‌তা এলে বহুক্ষণ যাবৎ চলে তাঁর অঙ্গমর্দন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

নিদ্রা বা জাগরণ সর্ব অবস্থায়ই গান্ধী দিনযাপন করেন তাঁর ঘরের পাথরের মেজের 'পরে একখানি মাতুরে। তাঁর আহার্য আনা হয় ঝকঝকে চীনামাটির বাসনে, নয় তো কাঁসার পাত্রে করে। তিনি সাধারণতঃ সেদ্ধ বা কাঁচা শাকসব্জী, ফল, তুধে সেদ্ধ করা খেজুর, তুধের পুডিং, আর কাগজের মতো পাতলা আটার রুটি খেয়ে থাকেন। পাঁউরুটি, ডিম, মাংস, মাছ, কিংবা কফি, চা বা কোনোরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শও করেন না তিনি।

গান্ধী প্রায়ই এক বস্তির মাঝখানে একটি কুটিরে বাস করেম। বস্তিটিতে অস্পৃশ্যদের বাস। নিষ্ঠাবান হিন্দুরা সাধারণতঃ এদের স্পর্শ হতে শতহস্ত দূরেই অবস্থান করে থাকেন; তাঁদের বিশ্বাস এদের স্পর্শদোষে অশুচি হয়ে যাবেন তাঁরা। অস্পৃশ্যদের প্রতি এ নিষ্ঠুর ব্যবহার থেকে বর্ণহিন্দুদের বিরত করতে চান গান্ধী। তাই সুযোগ পেলেই তিনি এসে বাস করেন এদের মধ্যে। তার ফলেই অধুনা বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্যদের ভৃত্য হিসাবে রাখতে এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাচক রূপে নিযুক্ত করতেও সুরু করেছেন। ভারতবর্ষে সকলের কাছ থেকেই আমি শুনেছি যে, বর্ণহিন্দু আর অস্পৃশ্যদের মাঝখানের

প্রাচীর ক্রমশঃই ভেঙে পড়ছে, বিশেষতঃ শহরবাজারে। এই অস্পৃশ্য অশুচিদের জন্যে বহুযুগের রুদ্ধ মন্দির-দুয়ারও খুলে দিয়েছেন গান্ধী।

তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, "আমি অস্পৃশ্য।" কিন্তু জন্মের দিক দিয়ে তা নন তিনি—তিনি হলেন বর্ণহিন্দু। তবে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে নিজেকে একান্ত একাত্ম করে নিয়েছেন তিনি, যাতে করে অন্যান্য বর্ণহিন্দুরাও তা' করতে পারে। তিনি আমাকে আরও বলেছেন, "আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, সব কিছু।"

সামান্য দুই-একজন বাদে ভারতীয়দের সকলেই মহাত্মা গান্ধীর কাছে এলে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। অনেক সময় তিনি তাদের পিঠ চাপড়ে বিরত হতে বলেন। তারপর দর্শনার্থীরা সবাই মেজেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে; সুরু হয় কথাবার্তা। দুয়ার তাঁর সকলের জন্যেই খোলা, প্রবেশে বাধা নেই কারুর। তবে সাধারণতঃ কথাবার্তাটি মহাত্মা এবং যে ব্যক্তি আগে বন্দোবস্ত করে এসেছেন তাঁদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-দলীয় প্রধানমন্ত্রীরা সব আসেন মহাত্মার পরামর্শ ও উপদেশের জন্যে, শিক্ষাবিদ্‌রা আসেন তাঁদের পরিকল্পনা যাচাই করে নিতে। যারই মাথায় এসেছে কোন নূতন কর্মসূচী—তা' ভারতবাসীদের মধ্যে এমন কে আছে যার মগজে নেই কোনও নিজস্ব পরিকল্পনা—সে-ই

আসে তাঁর আশীর্বাদ কামনায়। সাধারণ লোকেরা আসে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের আশায়। আমি যখন তাঁর কাছে ছিলাম তখন একদিন এক অন্ত্যজ দম্পতি তাদের দাম্পত্য জীবনের অশান্তি প্রতিকারের ইচ্ছায় তাঁর কাছে এসে হাজির; বহুক্ষণ তাঁর সময় নষ্ট করে গেল তারা। চাষী এবং শ্রমিকরাও তাদের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসে হাজির হয়।

একবার আমি তাঁর সঙ্গে পুনা হতে বোম্বাই পর্যন্ত ট্রেনে গিয়েছিলাম। সময় লেগেছিল সাড়ে তিন ঘণ্টা। তিনি এবং তাঁর দলবল, অর্থাৎ সেক্রেটারী, ডাক্তার, ভক্ত ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় দশজন, একটা স্পেশাল কামরায় গিয়ে উঠলেন। কামরাটা ছিল তৃতীয় শ্রেণীর, বেঞ্চগুলো সব শক্ত কাঠের। অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে ছাদ দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা করে। তারই মধ্যে গান্ধী নীরবে 'হরিজন' পত্রিকার জন্যে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। তারপর প্রুফ সংশোধন করলেন আর একটা প্রবন্ধের। তারপর যে-সব রাজনৈতিক নেতারা এসেছিলেন সাক্ষাতের জন্যে তাঁদের সঙ্গে সুরু হলো আলাপ আর অলোচনা। এই আকাশভরা বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে স্টেশনে স্টেশনে জমেছিল দর্শনার্থীর ভীড়। একটা স্টেশনে দুটি প্রায় চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালক, আপাদমস্তক সিক্ত তাদের, জানলায় দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু হুঙ্কার ছাড়তে লাগল : "গান্ধীজী! গান্ধীজী!" ('জী' হচ্ছে একটি সম্মানসূচক প্রত্যয়)।

জিজ্ঞেসকরলাম, "এদের কাছে আপনি কী?"

কপালের দু'পাশে দুই আঙুল উঁচিয়ে জবাব দিলেন তিনি, "শিঙ! আমার দুটো শিঙ গজিয়েছে কিনা, তাই দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছি।" (নিখুঁৎ ইংরেজি বলেন ইনি)।

গান্ধীর কর্মশক্তি আমার চোখে ছিল এক পরম বিস্ময়। রাত্রি দশটার পূর্বে শয্যা গ্রহণ করেন না তিনি। কতদিন হয়েছে মহাত্মা হয়তো নৈশ বিরামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, আমি যাচ্ছি পাশ দিয়ে, আমার সঙ্গে কৌতুককর মন্তব্য বিনিময় করেছেন তিনি, নয় তো বলেছেন আরও নিবিষ্ট চিত্তে উপাসনা করলে আরও বেশি সুনিদ্রা হতো আমার।

পরম ধর্মনিষ্ঠ তিনি। তাঁর ধর্মনীতির সারতত্ত্ব হলো ভগবানে বিশ্বাস; নিজেকে সেই যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রমাত্র বলে জ্ঞান, আর অহিংসাকেই পরলোকে ভগবৎসান্নিধ্য এবং ইহলোকে সুখশান্তি বিধানের একমাত্র পন্থা বলে প্রত্যয়। তাঁর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কাজ, তাঁর যাবতীয় চিন্তা ও ভাষণ, এই অহিংসানীতির দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

কথাপ্রসঙ্গে বারকয়েক তিনি আমার কাছে বিগত দুইটি মহাসংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কেন তিনি প্রতীচ্যে তাঁর অহিংসানীতি প্রচার করেন না। হেসে জবাব দেন তিনি, "সামান্য একজন এশিয়াবাসী আমি, সামান্য এশিয়াবাসী মাত্র। তবে যীশুও ছিলেন বটে একজন এশিয়াবাসী।"

তারপর বলে যেতে লাগলেন তিনি, "ভারতবর্ষকেই যখন আমি অহিংসায় আস্থাবান করে তুলতে পারিনি তখন কোন্ মুখে যাব প্রতীচ্যের কাছে সে বাণী প্রচার করতে?" অন্তরে অন্তরে বেশ উপলব্ধি করছেন তিনি যে, তাঁর দেশের যুব-শক্তি আজ হয়ে উঠেছে হিংসাপরায়ণ, ধৈর্যহারা ও বিপ্লবকামী।

নিজের জীবন গান্ধী উৎসর্গ করে দিয়েছেন স্বদেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে। কিন্তু হিংসার পথে আদর্শলাভের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তাঁর। সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর বর্তমান বিভেদও এইখানে। "ওর জন্মেরও পূর্ব থেকে আমি সমাজ-তন্ত্রী"—ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদের ৪৫ বৎসর বয়স্ক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্বন্ধে এ মন্তব্য করেন গান্ধী। এক অচিন্ত্যপূর্ব চরিত্র বটে এই জয়প্রকাশ। আমেরিকার উইস্-কোন্‌সিন (Wisconsin) এবং ওহিয়ো (Ohio) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, শিকাগো (Chicago) শহরে এককালে বাড়ী বাড়ী প্রসাধন-দ্রব্য ফেরি করে বেড়ানো ছিল তাঁর কাজ, ভারতবর্ষে ফিরে এসে যথাবিধি কারাবাসও ঘটেছে তাঁর অদৃষ্টে। পৃথিবীর সর্বত্র সমাজতন্ত্রী মাত্রেই যেমন কম্যুনিস্টদের আর সোভিয়েটের ঘোরতর বিরোধী, জয়প্রকাশের বেলায়ও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। গান্ধী তাঁকে স্নেহ করেন, তিনিও গান্ধীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। তবুও ১৯৪২ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে যখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় তখন জয়প্রকাশের ইঙ্গিতে ভারতীয় সমাজতন্ত্রীরা হিংসার পথ অবলম্বন

করে। সমাজতন্ত্রীরা তখন সংগোপনে ধ্বংসাত্মক কার্য্যে অগ্রসর হয়, আত্মগোপনের অনুকূল ক্ষেত্র গড়ে তোলে, পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বেড়াতে থাকে, এবং বলপ্রয়োগে কর্তৃপক্ষের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। গান্ধীর অহিংসাশাস্ত্রে এ সবই অবৈধ বলে ঘোষিত।

গান্ধী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে তাই একটা বিরোধের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, অথচ তিনিই হলেন তাদের মুক্তিমন্ত্রের আদিগুরু ; তা' ছাড়া তাদের চরম লক্ষ্যের সঙ্গেও তাঁর আদর্শগত ঐক্য বিদ্যমান।

গান্ধী জাপ-বিরোধী এবং নাৎসী-বিরোধী হয়েও ছিলেন সংগ্রামের বিপক্ষে, কারণ তাঁর ধারণা এই ছিল যে, বিজয়ী শক্তিবর্গ অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজেদের অক্ষম বলেই প্রতিপন্ন করবে। সম্মুখবর্তী লক্ষ্য ভেদ করে সুদূর ভবিতব্যের 'পরে নিবদ্ধ তাঁর দূরদৃষ্টি।

মহাত্মা দেখতে পাচ্ছেন, সমগ্র মানবজাতি, এমন কি তাঁর সাধের ভারতবর্ষও, ক্ষমতার প্রতি অহেতুক লোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষমতালাভের পথই অনুসরণ করে চলেছে, চাইছে সে ব্যক্তিকে একান্তভাবে রাষ্ট্র-পরবশ করে তুলতে, ধনিকের অপরিমেয় সম্পদের তলায় তার সমাধি রচনা করতে। গান্ধীর অর্থনৈতিক স্বর্গলোক কৃষিসম্পদ ও কুটিরশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজ ও মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরীর সমবায়ে গঠিত। নিজেকে তিনি দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীর প্রতিভূ বলে জ্ঞান করে থাকেন।

অধিকাংশ ভারতীয়ের মতোই গান্ধীও 'ভারত-কেন্দ্রিক।' ভারতভূমি আজ রুগ্ন, রুগ্ন তার হৃদ্‌যন্ত্র; মুহূর্তের তরেও কে ভুলে থাকতে পারে তার রুগ্ন হৃদ্‌যন্ত্রের কথা? তাই প্রধানতঃ নিজেদের সমস্যার চিন্তায়ই মগ্ন থাকে ভারতবাসী। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে কথোপকথনে যে-কোন লোকেরই চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ভারতের মুকুরে সমগ্র বিশ্বের প্রতিচ্ছবি। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে কোনও অবস্থা, কোনও ঘটনাই, পড়ে থাকে না ধরণীর ধূলিস্তরে; সামান্য একটুখানি বাগ্‌বিভূতির স্পর্শে অবহেলে তাকে ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে থাকেন তিনি, নিমেষে সে আলোচ্য বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হয় মর্ত্যমানবের জীবনের পরম সমস্যাসঙ্কুল বৃহত্তর দার্শনিক পটভূমিকায়।

আমেরিকা থেকে এক দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সমিতি এল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। জনৈক সদস্য প্রশ্ন করলেন, এই তো দু'দিন আগে যা ছিল শত্রুদের দেশ সেই জাপানকে আহার্য দান করা উচিত কি না, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ যখন এসে দাঁড়িয়েছে উপবাসের প্রান্তসীমায়। উত্তর দিলেন তিনি, "এ কথা যদি সত্য হয় যে ভারতের চেয়ে জাপানের আহার্যের প্রয়োজন আজ বেশি, তবে আমেরিকার কর্তব্য সর্বাগ্রে জাপানকে আহার্য দান করা, কেন না এই আমেরিকাই জাপানের আত্মাকে ধ্বংস করবার উদ্যোগ করেছিল।" তারপর দীপ্ত হুতাশনের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে আক্রমণ করলেন তিনি আণবিক

বোমাটি প্রয়োগের ব্যাপারকে। দেশপ্রেমিক গান্ধী তাঁর মানবিকতার বলে বিশ্বপ্রেমিকও বটেন। তবুও তাঁর নিজের কাছে ভারতবর্ষেরই স্থান সর্বাগ্রগণ্য।

গান্ধীর কাছে সার স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সের সঙ্গে আলোচনা আর চীনাবাদামের চাষ, দুইয়েরই এক লক্ষ্য—চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের মঙ্গল সাধন। নিজেকে নিঃশেষে বিলীন করে দিয়েছেন তিনি তাদের মধ্যে। তাই সমগ্র ভারতবর্ষের অন্তরতম ধন তিনি, আর সেই জন্যেই সব চেয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তি। হিন্দুরা একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বরের উপাসক, অথচ অগণিত দেবদেবী এবং প্রতিমার অর্চনা করে থাকে তারা, কোন কোন হিন্দু-মন্দিরে ইতিমধ্যেই গান্ধীরও প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

"গান্ধীর অভ্যর্থনার অপেক্ষায় অবারিত হয়ে আছে স্বর্গের দুয়ার,"—বোম্বাইয়ের জনৈক বহুবিজ্ঞ মহাজন একদা এ অভিমত ব্যক্ত করেন আমার কাছে। অথচ স্বর্গবাসের জন্যে বিন্দুমাত্রও লালায়িত নন গান্ধী নিজে ; তাঁর প্রয়াস ধরণীতে স্বর্গ রচনার।

ক্ষুধার জ্বালায় প্রাচ্য আজ এমনই জর্জর, এতই জীর্ণচীর, এ হেন নিরানন্দ সে, যে, তার যাবতীয় চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে বুভুক্ষা, সমগ্র দৃষ্টিকে আবিষ্ট করে রেখেছে উলঙ্গতার বিভীষিকা, অনুভূতির পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে দৈন্যদশার বোধ। প্রাচ্যের সেই কোটি কোটি নরনারী শক্তিমানের সম্মুখে আতঙ্ক ও বিস্ময়ে বিহ্বল বোধ করে থাকে বটে, কিন্তু হৃদয়

নিবেদন করে দেয় তারা আত্মত্যাগী জনহিতৈষী মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে। গান্ধী হলেন আজীবন ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রতীক। ভারতবাসীর মতোই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকেন তিনি, তাঁর প্রাণধারণের একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো ভারতের মঙ্গল সাধন। তাঁর সঙ্গে মতদ্বৈধ আছে বহু লোকের; ব্রহ্মচর্য, একান্ত রণবৈমুখ্য (pacifism) এবং প্রাকৃতিক পন্থায় পীড়া উপশম সম্বন্ধে তাঁর মতামত অনেকেই অগ্রাহ্য করে থাকেন। কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা, তাঁর জ্ঞান, এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করেন সবাই। গান্ধীর স্ববিরোধিতা প্রতীচ্যবাসীর চোখে হলো তাঁর চারিত্রিক অনৈক্যের উদাহরণ, প্রাচ্যবাসীর চোখে তাঁর আন্তরিক সাধুতার নিদর্শন।

সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে স্বীকার করেন না গান্ধী। তিনি বলেন, "ঈশ্বরের দাস মাত্র আমি।" তবুও বিস্তর নাস্তিক্যপন্থীও নিজেদেরকে তাঁর অনুগামী বলে ঘোষণা করে থাকেন, কেন না তিনি হলেন জনসেবক। উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson) একস্থানে লিখেছেন: "ব্যাপকতম অর্থে গণতন্ত্র বলতে বিশেষ এক ধরণের শাসনযন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি বড় জিনিষকে বোঝায়।...প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা যা মানুষের সঙ্গে মানুষের যত রকমের সম্বন্ধ হতে পারে তার প্রায় প্রত্যেকটিরই স্বরূপ নির্ণয়ের সহায়ক।" এই তত্ত্বটি গান্ধীর কাছে যেন সহজ সংস্কারের বলেই অধিগত।

অধিকাংশ লোকের কাছেই রাজনীতি বলতে বোঝায়

দণ্ডনীতি, অর্থাৎ শাসনব্যবস্থা। গান্ধীর কাছে তার অর্থ বা উদ্দেশ্য হলো মানুষ। সাধারণ রাজনীতিক, এবং ডিক্টেটরও, নিজেকে জাহির করেন 'জনগণের বন্ধু' বলে। কিন্তু 'জনগণ' বলতে যে সমষ্টিগত মানবিক সত্তাকে বোঝায়, ঠিক তার প্রতি কোনরূপ আগ্রহ বোধ করেন না গান্ধী। তাঁর আগ্রহ ব্যষ্টির প্রতি। ব্যষ্টি হতে সমষ্টির দিকে তাঁর গতি।

১৯৪৬ সালে, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বেধে ওঠে দেশব্যাপী নিদারুণ বীভৎস সংঘর্ষ; সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি ঘটে তার ফলে। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী গিয়ে উপনীত হন সব চেয়ে সঙ্কটসঙ্কুল ক্ষেত্রে—পূর্ববঙ্গের এক মুসলমান -অধ্যুষিত অঞ্চলে। মাত্র একজন কি দু'জন সহচরের সঙ্গে এই শীর্ণকায় বৃদ্ধ পদব্রজে গ্রাম হতে গ্রামান্তর পরিভ্রমণ করতে থাকেন। মুসলমান চাষীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে রাত্রি-যাপনের জন্যে আশ্রয় ভিক্ষা করে ফিরতে থাকেন তিনি। সমাগত ব্যক্তি ও দলবলকে অভ্যর্থনা করে তাদের বুঝিয়ে দিতে থাকেন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা। যে এসেছে তাঁর কাছে তারই কাছে প্রচার করেছেন তিনি, জানিয়েছেন আবেদন। মাসের পর মাস কাটিয়ে ফেরেন তিনি অতি সাধারণ স্তরের লোকজনের সঙ্গে—সেই সব লোক যারা স্বহস্তে করেছে নরহত্যা, যাদের আত্মীয়স্বজন প্রাণ দিয়েছে আততায়ীর হাতে। তাদেরই কুটিরে বাস করতেন তিনি, গ্রহণ করতেন তাদেরই আহার্য, ভ্রমণও করতেন ঠিক তাদেরই মতো—পদব্রজে।

তাদের বোঝবার জন্যে এবং তাদের উদ্ধার সাধনের অভিপ্রায়ে নিজেকে নিঃশেষে তাদেরই মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিলেন তিনি।

একজন সাধারণ রাজনীতিক এরূপ ক্ষেত্রে উদারতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন মাত্র।

গান্ধী-সহধর্মিণীর পরলোক গমনে ভারতবাসীরা তাঁর স্মৃতি-পূজা উপলক্ষ্যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তারের উদ্দেশ্যে এক অর্থভাণ্ডার স্থাপন করে। ডাঃ দীনশাহ্ মেহ্‌তা উল্লসিত হয়ে ওঠেন; বহু বৎসর যাবৎ অপ্রচুর ও অব্যবহার্য আয়োজন, অর্থের অপ্রাচুর্য, এবং শিক্ষিত সহকারিবর্গের অভাবে বহু কষ্টে কাজ চালিয়ে আসতে হয়েছে তাঁকে। তবুও গান্ধী বললেন,—না, তা হয় না। একটি আদর্শ চিকিৎসাগার, যা থাকবে শুধু মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ব্যক্তির ভাঙা শরীর জোড়া দেবার জন্যে অধিগম্য, তার বিষয়ে বিশেষ কোনরূপ ঔৎসুক্য বোধ করেন না তিনি। তিনি চান প্রাকৃতিক চিকিৎসাকে একান্ত সুলভ করে তুলতে, যাতে করে তা দীনদরিদ্র চাষীদেরও অধিগম্য হতে পারে। তাই সস্তা ঘরোয়া কায়দায়, কাদার প্রলেপ, রোদের আলো, জল, আহার্য, অঙ্গমর্দন, ব্যায়াম, এই সব উপায় অবলম্বন করে প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়েছেন তিনি, নিজেই তিনি এ সব তদারক করে থাকেন।

মানবজীবনের পাপতাপ সমূলে উচ্ছেদ করতে প্রয়াস পাচ্ছেন তিনি—এ বিষয়ে তিনি হলেন চরম বিপ্লবপন্থী। উপদেশ বিতরণ এবং উদাহরণ স্থাপনের দ্বারা তিনি চান কোটি কোটি

লোককে উন্নত এবং পরিবর্তিত করে তুলতে। দৈনন্দিন জীবনে নিজেকে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে একীভূত করার দ্বারা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ মোচনে প্রয়াসী তিনি। হিন্দু-মুসলমানের আগ্নেয়গিরি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন তিনি গিয়ে তাঁর শিবির স্থাপন করেন সেই অগ্নিস্রোতের উৎসমুখে। অনুক্ষণ বাস করেন তিনি কৃষককুলের সান্নিধ্যে, কারণ ভারতবর্ষ হলো কৃষকদেরই দেশ।

কয়লা সংগ্রহের জন্যে যাকে অবতরণ করতে হয় বসুন্ধরার বাষ্পময় জঠরে, প্রাসাদসৌধে বাস করার প্রয়োজন তারই। কিন্তু বাস করতে হয় তাকে পর্ণকুটিরে, আর যাঁরা বাস করে আসছেন প্রাসাদসৌধে তাঁরা তার মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে নিরন্তন প্রকাশ করে আসছেন উষ্মা। কিন্তু উষ্মা যাঁরা প্রকাশ করে আসছেন তাঁরা অন্ততঃ একটি মাসের জন্যেও খনৎকারের জীবন যাপন করার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। দু'দিন আগে যারা ছিল শত্রুপক্ষ তাদের প্রতি বিদ্বেষের বশে যারা তাদের রাখতে চায় অনাহারে তারাও মাত্র বারো শ' ক্যালোরী (calories) উত্তাপ আহরণের উপযোগী সামান্য খাদ্যে দিনযাপনের চেষ্টা করে দেখতে পারে।

এ সংসারের নানা অনর্থের একটি মূল কারণ হলো শক্তিমান ও শক্তিহীনের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। যারা শক্তিমান তাদের উচিত সাধারণ লোকদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করা ; সাধারণ লোকের পক্ষে প্রয়োজন শক্তিমানের শক্তির অংশ গ্রহণ করা এবং তারই ফলে তার শক্তিভার লাঘব করে দেওয়া। শাসনযন্ত্র, রাজনৈতিক দল, সঙ্ঘসমবায়,

ট্রেড ইউনিয়ন, এক কথায় যাবতীয় মানবিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য। যাঁরা অতিরিক্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকেন, ক্ষমতার অতিশয্য তাঁদের পক্ষে যেমন, যারা সে ক্ষমতার দ্বারা শাসিত হয় তাদের পক্ষেও তেমনই তা একান্ত অস্বাস্থ্যকর।

ডিক্টেটর হলেন শক্তিমান পুরুষ, কেন না বল অথবা ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তিনিই। গান্ধীও শক্তিমান পুরুষ, অথচ একান্ত বলহীন, একান্ত ক্ষমতাহীন ব্যক্তি তিনি। তাঁর না আছে পুরস্কৃত করার ক্ষমতা, না আছে শাস্তিদানের অধিকার। কোনও পদমর্য্যাদাই নেই তাঁর। তিনি হলেন সামান্য একখানি উত্তরীয়শোভিত জনৈক কুটিরবাসী মাত্র। গান্ধীর প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস হলো মানুষের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ।

বলহীন, অর্থহীন, ব্যক্তিতান্ত্রিক মানুষ এই গান্ধী। তাঁর এ ব্যক্তিতন্ত্র আইনের বলে প্রাপ্য যাবতীয় বিষয়ও তাঁকে আত্মসাৎ করবার অধিকার দান করেনি। বৈষয়িক ব্যাপারের উপর তাঁর এ ব্যক্তিতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা নয়। এর ভিত্তি হলো ব্যক্তিত্ব। এ কথার অর্থ এই যে, যখন তিনি কোন বিষয়কে অন্তরে অন্তরে সত্য বলে অনুভব করে থাকেন তখন তার জন্যে একাকী সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবার শক্তি রাখেন তিনি। গান্ধীর কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অর্থ হচ্ছে সমুদয় জাগতিক শক্তির কবল হতে পরিপূর্ণ মুক্তি এবং অন্তরের যাবতীয় শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন।

অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ মুক্তপুরুষ এই গান্ধী।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী ও মহাসেনাপতি স্টালিন

অহিংস উপায়ে ভারতের মুক্তিসাধনার অগ্রদূত হলেন গান্ধী। গান্ধীর এই অহিংসামন্ত্র যখন জীবনের পটে মূর্ত হয়ে ওঠে তখন দেখতে পাই বিষয়টি সামান্য অপ্রতিরোধের মধ্যেই পর্যবসিত নয়—বহুদূরবিস্তৃত এর পরিসর। সমগ্র বিষয়টি তখন এক সুগভীর চমকপ্রদ তত্ত্বদর্শনে পর্যবসিত হয়ে থাকে।

উরুলি নামে এক অতি সাধারণ, দৈন্যদশাগ্রস্ত, অশান্তিময় গ্রামে বাস করতেন গান্ধী। এক রাত্রিতে জনৈক কৃষকের কুটির ভেঙে জনকয়েক চোর কৃষকটিকে মারধোর করে তার সামান্য যা কিছু জিনিষপত্র ছিল সব নিয়ে চলে যায়। পরদিন প্রভাতে কৃষকটিকে নিয়ে আসা হয় মহাত্মার সম্মুখে। কী করা যায়?

গান্ধী বল্লেন এই ব্যাপারে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের তিনটি পন্থা আছে। এক হলো চলিত, 'চিরাচরিত পন্থায়' পুলিশে খবর দেওয়া। কিন্তু তাতে করে প্রায়ই পুলিশকে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করবার আরও বেশি সুযোগ দান করা হয় মাত্র; গৃহস্থের কোনরূপ সুবিধা বড়-একটা হয়ই না। দ্বিতীয় পন্থা, যা না কি অসহায় গ্রামবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবলম্বন করে থাকে, তা হচ্ছে এ বিষয়ে কিছুই না করে একেবারে চুপচাপ বসে থাকা। "বড়ই নিন্দনীয় এ পন্থা,"—বল্লেন তিনি, "এর

মূল হচ্ছে কাপুরুষতা, আর কাপুরুষতা যতদিন রয়েছে পৃথিবীতে অপরাধিও থাকবে ততদিন।”

গান্ধীর মতে চৌর্যবৃত্তি নিবারণের পন্থা হলো ‘সত্যাগ্রহ’, অহিংসা। সমবেত কৃষকদের বল্লেন তিনি, “তার জন্যে চোর এবং অন্যান্য অপরাধীদের প্রতিও তোমাদের করতে হবে ভাইবোনের মতো ব্যবহার, অপরাধিকে একটা ব্যাধি মনে করে অপরাধীকে সেই ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।”

গান্ধী উপদেশ দিলেন, অপরাধীকে কোনো-একটা বৃত্তি শিক্ষা দিয়ে যাতে করে সে তার জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন সাধন করতে পারে তার সুযোগ দান করা উচিত। মহাত্মা ঘোষণা করলেন, “এ কথা তোমাদের সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত যে, অপরাধীরা তোমাদের চেয়ে কিছু আলাদা জাতের জীব নয়। বস্তুতঃ তোমরা যদি তোমাদের অন্তরে একবার সন্ধানী আলোক সম্পাত করে অন্তরাত্মাকে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখ তবে দেখতে পাবে তোমাদের আর চোরের মধ্যে প্রভেদ শুধু এক মাত্রার।” আপন অন্তরে করো সন্ধানী আলোক পাত।

তারপর এই মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন গান্ধী, “অপরের শ্রমের বিনিময়ে অথবা অন্য কোনো সন্দেহজনক উপায়ে যে ধনী ব্যক্তি প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়ে উঠেছে সে পকেটমার কি সিঁধেল চোরের চেয়ে পরস্বাপহরণের অপরাধে কম অপরাধী

নয়। প্রভেদের মধ্যে শুধু এই যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠার আড়ালে দিব্য নিশ্চিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছে, আর তারই ফলে অতিক্রম করে গিয়েছে ন্যায়ের দণ্ডকে।"

"যথার্থ বলতে গেলে,"—মন্তব্য করলেন গান্ধী : "নিজের বৈধ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় মাত্রেই পরস্বাপহরণ। ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে সুব্যবস্থা এবং সমাজে ন্যায়ের পরিপূর্ণ মর্যাদা থাকলে চৌর্যবৃত্তিও থাকত না, চোরেরও অস্তিত্ব থাকত না।"

এই ভাবেই গান্ধীর অহিংসা তাঁকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রে।

১৯৪৭ সালের ১লা জুনের 'হরিজনে' লেখেন গান্ধী : "অর্থনৈতিক অসাম্য আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক সাম্য। বর্তমানের অন্যায় অসাম্যের মধ্যে, যেখানে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ঐশ্বর্যে হাবুডুবু খাচ্ছে আর জনগণ সামান্য উদরান্নেরও সংস্থান করতে পারছে না সেখানে, বিধির বিধানের প্রশ্নই ওঠে না। আমি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় ছিলাম তখনই গ্রহণ করি সমাজতন্ত্রবাদ"—সে আজ ত্রিশ বৎসরেরও আগেকার কথা।

অবশ্য আধুনিক সমাজতন্ত্রীদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর মতভেদ রয়েছে, কেন না শাসনযন্ত্র বস্তুটির প্রতি বিরাগ আছে তাঁর। "পুলিশে খবর দিয়ো না,"—উরুলির কৃষকদের উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি : "সংস্কারকের পক্ষে সাজে না সংবাদবাহক গুপ্তচর হওয়া।"

গান্ধী বল্লেন, "বাধ্যতার বশে যে ব্যক্তি থাকে সৎপথে তার পক্ষে মানসিক উৎকর্ষ লাভ সম্ভবপর নয়, বস্তুতঃ অধোগতিই হয়ে থাকে তার। যে মুহূর্তে উপরের চাপ যায় শিথিল হয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তরের তলদেশ হতে সঞ্চিত পাপরাশি বিপুলতর বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকে।" ডিক্টেটরতন্ত্রে হলো নিরবচ্ছিন্ন বাধ্যতার রাজত্ব। সকল প্রকারের দোষত্রুটি তাই ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করতে করতে একদিন হয়ে ওঠে একান্ত দুর্বার।

গান্ধী তাই চান মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারা মানবিক বিধিবিধানের উন্নতি সাধন করতে। ভারতের তথা জগতের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন তিনি ব্যক্তিচরিত্রের উন্নয়ন এবং পবিত্রীকরণের দ্বারা।

কোনো শাসনযন্ত্রের অধিকার লাভ না করেও, কেবলমাত্র উদাহরণ স্থাপন ও নিরলস প্রচারকার্যের দ্বারা গান্ধী আজ ভারতীয়দের মধ্যে এক অভিনব ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধের উন্মেষ সাধন ও সমষ্টিগত শক্তিসঞ্চারে সাফল্য লাভ করেছেন। ভারতের নারীজাতি লাভ করেছে রাজনৈতিক মুক্তি, সৃষ্টি হয়েছে এক ভারতীয় জাতীয় ভাষার, অস্পৃশ্যদের ঘটেছে অবস্থার উন্নতি, যুগযুগান্তের জড়তা কাটিয়ে উঠেছে সমগ্র জাতি; কেননা এমন একটি অহিংস অথচ অমোঘ শক্তিশালী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কৌশল সুসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলেছেন গান্ধী যে, তার মধ্যে অনায়াসে ঘটেছে বিপ্লবীর অধীরতা এবং আদর্শবাদীর ধর্মবুদ্ধির সমন্বয়।

জনৈক বন্ধু একদা গান্ধীকে প্রশ্ন করেছিলেন, সময়-বিশেষে "কার্যকারিতার খাতিরে আদর্শের সঙ্গে রফা করার প্রয়োজন হতে পারে কি না।" "না, কখনই নয়," উত্তর দিলেন গান্ধী, "আমি বিশ্বাস করিনে যে, উদ্দেশ্যই উপায়কে বৈধতা দান করে থাকে।" এইখানেই ডিক্টেটরবর্গ আর অধিকাংশ রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁর দুস্তর ব্যবধান।

গান্ধী বলেন, "ভারতের মুক্তির জন্যে আজীবন সাধনায় রত আছি আমি। কিন্তু লক্ষ্যসাধনের জন্যে যদি হিংসার পথ অবলম্বন করতে হতো আমায় তবে চাইতাম না সে মুক্তি।" পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত ফাসিস্ত কি কম্যুনিস্টরা।

উপায় বলতে সচরাচর বোঝায় মানুষকেই। গণতন্ত্রী তাই পুরোভাগে স্থাপন করেন ব্যষ্টিকে; আর ডিক্টেটর করেন ব্যষ্টিকে বলিদান। ব্যষ্টির মঙ্গলসাধনের অজুহাতেই ব্যষ্টিকে উৎসর্গ করে থাকেন ডিক্টেটর। মানবের মঙ্গল সাধনই তাঁর উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রচেষ্টায় মানুষের সত্তা সেখানে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় নিরঙ্কুশ নৈর্ব্যক্তিক রাষ্ট্রের পাশবিক জঠরে।

গান্ধী যন্ত্রশিল্পের বিস্তার সাধন এবং বৃহৎ ব্যাপারের বিরোধী। সরল পল্লীজীবনই প্রিয় তাঁর কাছে। তবে কতকটা রফা হিসাবেই লিখেছেন তিনি, "যে ব্যাপারে বহু লোক একত্র কাজ করে থাকে, আমি চাই রাষ্ট্রই হবে তার মালিক।" তারাই তাদের শ্রমজাত দ্রব্যের অধিকার লাভ করবে। রাষ্ট্রের পক্ষে

অবশ্য জবরদস্তির পথ অনুসরণ করা চলবে না। "বলপ্রয়োগে বিত্তশালীদের অধিকারচ্যুত করার পক্ষপাতী নই আমি," বলেছেন গান্ধী, "রাষ্ট্রের মালিকানা স্থাপনের ব্যাপারে আমি চাই তাঁদের সহযোগিতা করতে আমন্ত্রণ জানাতে। লক্ষপতিই হোন আর কপর্দকহীনই হোন, সমাজে 'পারিয়া' (অস্পৃশ্য, অশুচি) বলে অবজ্ঞাত হতে পারেন না কেউই। একই নিদান হতে উৎপন্ন এদু'টি বিস্ফোটক।"

মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গের অস্তিত্বে আস্থাবান গান্ধী ; তাই ধনিকবৃত্তি (Capitalism) ও চৌর্যবৃত্তি উভয় ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপায়ের উপর বিশ্বাস আছে তাঁর, বল-প্রয়োগের পক্ষপাতী নন তিনি। শাসনযন্ত্রের ন্যূনতম প্রয়োগই তাঁর কাম্য, তা-ও আবার শুধু সেইরূপ কোনো কার্য সাধনের জন্যে যাতে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় চায় লিপ্ত হতে। গান্ধী বলেন, "আমার বিশ্বাস জনগণ যদি আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে তবে রাজ-নীতিও আপনা থেকেই হয়ে উঠবে তাদের অনুকূল।"

এই দিক থেকে এবং প্রায় সর্বতোভাবেই গান্ধী হলেন মহাসেনাপতি স্টালিনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। স্টালিন কাকে বিবাহ করেছেন, এমন কি তিনি বাস্তবিকই বিবাহিত কি না, সে সংবাদ জানেন শুধু তাঁর মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ। মস্কৌ শহরে কোথায় তাঁর আবাস সে কথা সাধারণ লোকের কেউই জানে না, তাঁর পল্লীনিবাসও চেনে না কেউ, কিংবা কোথায় তিনি তাঁর অবসর যাপন করে থাকেন সে খবরও রাখে না তাদের কেউ।

যখন তিনি সফরে বার হন তখন গোপনে চলে তাঁর ট্রেন ; কেউ পায় না সে খবর ; কাউকে ঘেঁসতে দেওয়া হয় না সে পথের ধারে। ১৯৩২ সালের নবেম্বর মাসে তাঁর পূর্বতনী পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মস্কৌ শহরের পথ দিয়ে শব-যাত্রার অনুগমন করেছিলেন স্টালিন। কিন্তু গুপ্ত পুলিশ পূর্বাহ্ণেই পথঘাট সব পরিষ্কার করে রেখেছিল, সমগ্র পথের মাঝে মাঝে পথরক্ষীর দল ছিল পাহারায়, বাড়ীঘরের জানালা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল উৎসুক জনতাকে।

গান্ধীর জীবন যেন বইয়ের খোলা পাতা। স্টালিন বাস করেন পুরু পর্দার আড়ালে। কোনো ডিক্টেটরই আসেন না কখনও প্রকৃতিপুঞ্জের সান্নিধ্যে।

তস্করেরও চরিত্র সংশোধনের আশা পোষণ করেন মহাত্মা। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ক্রেম্‌লিন (Kremlin) থেকে বারো বৎসর এবং তার অধিক বয়সের শিশু-অপরাধীদের জন্যে প্রবর্তন করা হয় প্রাণদণ্ডের বিধান। গান্ধী তাঁর কৃষকদের নিষেধ করে-ছিলেন দুষ্কৃতকারীর বিষয়ে পুলিশে সংবাদ দিতে। বলশেভিক ব্যবস্থায় বালকবালিকারাও তাদের পিতামাতার বিষয়ে গোপনে সংবাদ দান করবে এরূপ বিধান রয়েছে।

ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করতে অক্ষম গান্ধী। ডিক্টেটরতন্ত্রের ভিত্তিই হলো বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুর অত্যাচার। বলশেভিক স্বৈরাচারের প্রাথমিক অবস্থায়, স্বৈরাচার যখন সুদৃঢ় হয়ে ওঠেনি তখন, গ্রেপ্তার হওয়ার দায় এড়াবার জন্যে মেনশেভিক দলের

নেতা মার্তোব (Martov) এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন রাজ-নৈতিক প্রতিপক্ষকে রুশিয়া ত্যাগ করবার পরামর্শ দান করে-ছিলেন লেনিন। আর বর্তমানে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সকল দুয়ার কঠিন ভাবে অবরুদ্ধ। ১৯২২ সাল থেকে একজনও সোভিয়েট-বিরোধী আশ্রয়প্রার্থীকে রুশিয়া ত্যাগ করতে দেওয়া হয় নি।

ককেসাস পর্বতমালার রুক্ষ, কঠিন, উন্মাদনাময় নৈসর্গিক শোভার মধ্যে জর্জিয়াতে স্টালিনের জন্ম। অল্প কিছুকাল পূর্বেও জর্জিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমিক বিরোধের (blood feud) রীতি, আর হত্যাকাণ্ড ছাড়া কখনও ঘটত না সে বিরোধের অবসান।

অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা অথবা বিশ্ববিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে মতবিরোধ ঘটবার বহুকাল পূর্বেই স্টালিন কলহ বাধিয়ে তুলেছিলেন ট্রট্স্কীর (Trotsky) সঙ্গে। ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল তখন তাঁরা দু'জন ছিলেন পরস্পরের প্রতিযোগী। বিপ্লবের আদিগুরু বলে লেনিনের নামের সঙ্গে ট্রট্স্কীর নামও ছিল জড়িত; সর্বদাই লোকে বলত "লেনিন ও ট্রট্স্কী।" ট্রট্স্কী ছিলেন শক্তিশালী বাগ্মী, অপূর্ব গদ্যের যাদুকর। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার পরিধিও ছিল বিস্তৃত; ছিল তাঁর দর্শন ও ইতিহাসে জ্ঞান। অনর্গল আলাপ করে যেতে পারতেন তিনি ফরাসী, জার্মান, আর ইংরেজী ভাষায়। বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল তাঁর, তাঁর কথাও জানা ছিল বহির্জগতের।

পক্ষান্তরে, যদিও ১৯১৭ সালের বিপ্লবে স্টালিন বিশেষ একটি গুরুতর ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হয়েছিলেন তবুও ট্রট্স্কীর চেয়ে হীন ছিল সে ভূমিকা, বহুগুণে অপ্রকটও ছিল বটে। বাগ্মী নন স্টালিন, লেখকও নন তিনি। কোনো বিদেশী ভাষায়ই নেই তাঁর অধিকার।

স্টালিনের সঙ্গে একবার পূরো সওয়া ছয় ঘণ্টা ব্যাপী আলাপের সুযোগ ঘটেছিল আমার। কঠিন তিনি, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন, কর্মক্ষম; তাঁর সে দৃঢ়তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি, পরিপূর্ণ আত্মসংযম এবং অটল স্থৈর্য। কিন্তু তাঁর মধ্যে নেই ট্রট্স্কীর সেই সম্মোহন, নেই সে অগ্নিশিখার বিচ্ছুরিত দ্যুতি। সম্মোহন কি ভাস্বরতার দ্বারা হৃদয় জয় করতে জানেন না তিনি। শক্তির শিখরে আরোহণ করেছেন তিনি শুদ্ধমাত্র তাঁর দলগত সমর্থনকে সুদৃঢ় ভিত্তির 'পরে স্থাপন করে, চক্রান্ত-জাল বিস্তার ও অপকৌশলের সাহায্যে, আর তাঁর শৃঙ্খলা স্থাপনের ক্ষমতার বলে। তাঁরই সহকর্মীদের দেহের উপর দিয়ে, বিশেষ করে লেওন ট্রট্স্কী (Leon Trotsky) যাঁর প্রতি চিরকাল তিনি পোষণ করে এসেছেন এক বিজাতীয় বিদ্বেষ, তাঁর দেহ মাড়িয়ে, গৌরবের উচ্চতম শিখরে গিয়ে অধিরূঢ় হয়েছেন তিনি।

লেনিনের জীবদ্দশায়ই ট্রট্স্কীর পদমর্যাদা লাঘব করতে আরম্ভ করেন স্টালিন; তারই ফলে ১৯২৪ সালে লেনিন যখন পরলোক গমন করেন তখন স্বাভাবিক নিয়মের বশেই সে আসনে

যাঁর অধিরূঢ় হবার কথা সেই ট্রট্স্কীকে বঞ্চিত হতে হয় চরম ক্ষমতার অধিকার থেকে। বস্তুতঃ, লেনিন তাঁর শেষ রাজনৈতিক নির্দেশনামায় "স্টালিনকে অপসরণ করবার পথ অনুসন্ধানের জন্যে সঙ্গীদের (comrades) কাছে" যে প্রস্তাব পেশ করে গিয়েছিলেন, স্টালিন ও তাঁর বন্ধুবর্গ মিলে তা' সম্পূর্ণ গোপন করে যান। লেনিনের পর তাঁর সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্টালিন, জিনোবিয়েব (Zinoviev), এবং কামেনেব (Kamenev) এই তিনজনের দ্বারা গঠিত এক ত্রয়ীশক্তি (triumvirate)। জিনোবিয়েব ও কামেনেবের সাহায্যে ট্রট্স্কীর সুনাম লাঘব করতে থাকেন স্টালিন। হীন বা নিন্দনীয় বলে কোনও পন্থাকেই বাদ দেননি তাঁরা। সোভিয়েট রুশিয়ায় লাল ফৌজ (Red Army) সম্বন্ধে পুস্তকাবলী প্রকাশিত হতে থাকে, সে সব বইয়ের কোথাও লাল ফৌজের গঠনকর্তা ও প্রথম সর্বাধিনায়ক (commissar) ট্রট্স্কীর নামোল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যেত না।

অবশেষে নেতৃত্ব হতে বিতাড়িত হলেন ট্রট্স্কী। এসে দাঁড়ালেন তিনি প্রকাশ্য বিরোধের পুরোভাগে। ১৯২৯ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সুদূর তুর্কিস্থানে দেওয়া হলো নির্বাসন।

মস্কো থেকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে, গুপ্তচরবেষ্টিত হয়েও স্টালিনকে বড় কম বিব্রত করে তোলেন নি ট্রট্স্কী। তখনও সৈন্যদলের চোখে, দেশের যে যুবশক্তির মধ্যে রণোন্মাদনা সঞ্চার করেছিলেন তিনি তাদের কাছে, এবং জনগণের দৃষ্টিতেও, ট্রট্স্কী ছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধার পাত্র। সোভিয়েট নেতৃবর্গের

প্রাণদণ্ডের পূর্ববর্তী যুগ সেটা। তাই ট্রট্স্কীকে নির্বাসিত করা হলো তুরস্কে। তাতেও সন্তুষ্টি লাভ করতে পারলেন না স্টালিন। ট্রট্স্কীর বহিষ্কারের জন্যে চাপ দিতে লাগলেন তিনি তুরস্কের 'পরে। ফ্রান্সে গেলেন ট্রট্স্কী। ফরাসী সরকারের 'পরে চাপ দিতে লাগলেন স্টালিন, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রান্স ত্যাগ করে ট্রট্স্কীকে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো নরোয়েতে। নরোয়েতে স্থানীয় কম্যুনিস্ট দল আর সোভিয়েটের ভাড়াটিয়ারা অতিষ্ঠ করে তুলল ট্রট্স্কীর জীবন। ট্রট্স্কী চলে গেলেন মেক্সিকোয়। সেখানে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন তিনি।

জিনোবিয়েব ও কামেনেবের সাহায্যে ট্রট্স্কীর নিপাত সাধন করে, জিনোবিয়েব ও কামেনেবের উচ্ছেদ সাধনের জন্যে স্টালিন এসে দল পাকালেন বুখারিন (Bukharin), রাইকোব (Rykov) আর টম্স্কীর (Tomsky) সঙ্গে। এক সময় স্টালিন ও কামেনেবের একটা ছবি তোলা হয়েছিল, তাতে একদিকে ছিলেন লেনিন আর স্টালিন, আর একদিকে কামেনেব। কামেনেবকে ছেঁটে বাদ দিলেন স্টালিন, তারপর লেনিনের সঙ্গে তাঁর সেই যে ছবি তা ছাপিয়ে বিলি করলেন লক্ষ লক্ষ। জিনোবিয়েব ও কামেনেব ছিলেন স্টালিনের তু'জন পরম অন্তরঙ্গ সহকর্মী, লেনিনেরও। স্টালিনের প্রথম চাল হলো এঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার বিলোপ সাধন, তারপর এমনই এক অবস্থার সৃষ্টি হলো যার ফলে অনায়াসে জিনোবিয়েব ও কামেনেবের প্রাণদণ্ড বিধান করতে পারলেন তিনি।

তারপর যে বুখারিন ও রাইকোব সাহায্য করেছিলেন স্টালিনকে জিনোবিয়েব ও কামেনেবের বিরুদ্ধাচরণ করতে, মস্কোয়ের একটি প্রসিদ্ধ মামলায় তাঁদেরও হলো প্রাণদণ্ড। সোভিয়েট ট্রেড-য়ুনিয়নের অধ্যক্ষ টম্‌স্কী গ্রেপ্তারের পূর্বেই বাঁচলেন আত্মহত্যা করে।

স্তম্ভশীর্ষে এসে আবির্ভূত হলেন স্টালিন, পাদপীঠে রইল যত ক্রীড়নকের দল।

সুরু হলো নিরবচ্ছিন্ন স্টালিন-প্রশস্তি—তাঁর গুণগরিমার সংবাদ জনচিত্তে এঁকে দেবার জন্যে চলতে লাগল রীতিমতো আন্দোলন। প্রত্যেকটি সুযোগে, লক্ষ লক্ষ ব্যাপার উপলক্ষ্য করে, স্টালিনের নাম আর লেনিনের সঙ্গে স্টালিনের ছবি একত্র হয়ে ফিরতে লাগল। ট্রট্‌স্কীর স্থান এসে অধিকার করে বসলেন স্টালিন।

সেই থেকে সোভিয়েট ব্যবস্থাকে রূপ দিয়ে আসছেন স্টালিন। তার বিধিনিষেধে, কর্মনীতিতে, সাহিত্যে, এবং যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে ফুটে উঠেছে তাঁর দশ আঙুলের ছাপ।

গান্ধীর পরিচয় তাঁর বাক্যে এবং কার্যে, তাঁর জীবনে।

স্টালিনের পরিচয় এই সব তাতে এবং রুশিয়ায়। নিজের রূপের অনুরূপে নূতন করে গড়ে তুলেছেন তিনি রুশিয়াকে।

স্টালিনের নেতৃত্বে বহু দুঃসাধ্য সাধন করেছে সোভিয়েট য়ুনিয়ন। সৃষ্টি হয়েছে বিস্তর নূতন নূতন মহানগরীর, বহু বিরাট আধুনিক শিল্পযন্ত্রের। একটি সুবৃহৎ শিল্পপ্রধান দেশে পরিণতি

লাভ করেছে রুশিয়া। অর্থনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় সে দেশ। কোনো দেশই নয়। তবুও অক্লান্তকর্মী সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় যে সব নূতন নূতন কলকারখানা তৈরি হয়েছে, এবং যে সব নূতন নূতন প্রাকৃতিক সম্পদের ঘটেছে আবিষ্কার, তাতে করে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি পূর্বের চেয়ে বহু বহু গুণে বেড়ে গেছে তার। দ্বিতীয় মহাসমরে আমেরিকার ঋণদান ও গচ্ছিত রাখার (Lend-Lease) নীতি রুশিয়াকে জয়লাভে সহায়তা করেছে বটে, কিন্তু স্টালিনের নির্দেশে স্বদেশে যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা' থেকে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার হাতে না পেলে, এবং অকাতরে জনশক্তির যে বিপুল অপচয় ঘটতে দিয়েছেন স্টালিন তাতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা ঘটলে, জার্মানীই হয়তো গ্রাস করে বসতো সোভিয়েট য়ুনিয়নকে।

এই জয়লাভের ফলে, এবং স্টালিনের প্রবল কূটনীতির চালে, আজ এক বহুবিস্তৃত ভূখণ্ড করায়ত্ত হয়েছে রুশিয়ার। রুশিয়াকে বৃহত্তর এবং অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছেন স্টালিন। 'তুরন্ত' ইবান (Ivan the Terrible), মহামতি পিটার (Peter the Great), মহীয়সী ক্যাথেরিন (Catherine the Great), এঁরা সব যেমন একে একে রুশীয় সাম্রাজ্যের সীমাবিস্তার করে চলেছিলেন, এবং তারই ফলে সোভিয়েট সাহিত্যে লাভ করে আসছেন উচ্চ প্রশংসা, তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন স্টালিন।

এ সব যুগান্তকারী কার্যকলাপের চেয়েও স্টালিন কর্তৃক সোভিয়েট কৃষিব্যবস্থার একত্রীকরণের (collectivization) ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশি। কার্যতঃ সোভিয়েটের যাবতীয় কৃষিক্ষেত্রই হচ্ছে রাষ্ট্রের অধিকারে ; এগুলো চাষ করা হয় এই দু'টি উপায়ের একটিতে : সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচালিত কৃষিক্ষেত্রগুলোতে কৃষকেরা কাজের অনুপাতে মজুরি পেয়ে থাকে, আর উৎপন্ন শস্য গিয়ে জমা হয় সরকারী খামারে ; অন্য উপায় হচ্ছে একত্রীকৃত ব্যবস্থা। সোভিয়েট য়ুনিয়নে আছে কয়েক লক্ষ 'সমষ্টি' বা 'সংস্থা' (collectives)। সোভিয়েট রাজ্যের প্রায় যাবতীয় কৃষিকার্যই নিষ্পন্ন হয় এই সকল সমষ্টি বা সংস্থায়। 'সমষ্টি' বা 'সংস্থা' হলো এমন একটি গ্রাম বা পল্লীসমাজ যেখানকার অধিবাসীরা সরকারী জমিতে সরকারী যন্ত্রপাতির সহায়ে কৃষিকার্য নির্বাহ করে থাকে, এবং উৎপন্ন শস্যের একটি প্রধান ভাগ সরকারেই দেয় জমা। অবশিষ্ট অংশ কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে নেয় ভাগাভাগি করে,—ভাগাভাগির মাপকাঠি হলো 'সমষ্টি' বা 'সংস্থা'র জমিতে কে কতটা কাজ করেছে তার হিসাব। এ ছাড়া প্রত্যেক কৃষক তার নিজের ব্যবহারের জন্যে পায় এক টুক্‌রো করে জমি, ক্বচিৎ কখনও তার আয়তন অবশ্য এক একরের (acre) বেশিও হয়ে থাকে ; তাতে সে শাকসব্‌জীর চাষ করতে পারে, অথবা মুরগী, শূকর প্রভৃতি জীবজন্তুও পালন করতে পারে। এ সব হলো পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে ; উদ্বৃত্ত কিছু থাকলে তা' বাজারে বিক্রয় করাও চলে। 'সমষ্টি'র কোন কৃষকই—তা'

সোভিয়েট কৃষিজীবীদের শতকরা ৯৫ জনই হচ্ছে কোন-না-কোন 'সমষ্টি'র অন্তর্ভুক্ত—ঘোড়া, ষাঁড়, লাঙ্গল, লাঙ্গলের গাড়ী, এ সব রাখতে পায় না। এ সব হচ্ছে মূলধন, আর মূলধনের একমাত্র মালিক হচ্ছে রাষ্ট্র।

ইয়োরোপে ভূমিদাসরা মুক্তিলাভ করবার পর, এই একত্রীকরণই হলো কৃষিব্যবস্থার প্রথম পরিবর্তন। ভূমিকর্ষণের এ-ই হচ্ছে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আদর্শের দিক দিয়ে এর মধ্যে আছে বিপুলাকার কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার সমন্বয়। একত্রীকরণের মূলে ছিল সেই উদ্দেশ্য। কিন্তু স্টালিনের হাতে সোভিয়েট বিধিব্যবস্থা যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে করে এই মূল উদ্দেশ্যে ঘটেছে বহু বিকৃতি। 'সমষ্টি'র অন্তর্ভুক্ত কৃষক প্রকৃত পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে ভূমিদাস, যে গবর্ণমেণ্ট তাকে সরবরাহ করছে জমি, যন্ত্রপাতি এবং বীজ, আর তার উৎপন্ন ফসলের বৃহত্তর অংশ বাজারে বিক্রয় করার ভারও গ্রহণ করেছে যে, সেই গবর্ণমেণ্টের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়েই থাকতে হয় তাকে।

একত্রীকৃত কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত শ্রেণীর সমাজতন্ত্রের একটি নিদর্শন বলে ভ্রম হয়ে থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান মাত্র, এর মধ্যে স্বাধীনতার কোনো অবসরই নেই। আকারটা সমাজতন্ত্রেরই অনুরূপ বটে, ভাবখানা কিন্তু স্টালিনের : সামরিক আদর্শে সমুদয় শক্তির একত্রীকরণ এবং উপর থেকে ও বাহির হতে তার 'পরে রয়েছে নিরঙ্কুশ

কর্তৃত্বের চাপ। প্রত্যেকটি পল্লীসংস্থায় মুষ্টিমেয় কম্যুনিস্ট হুকুম তামিল করে চলে ক্রেম্‌লিনের।

সোভিয়েটের এই কৃষিসংস্থাই বহন করছে স্টালিন কর্তৃক অনুসৃত কর্মপদ্ধতির গুরুতর ত্রুটির নিদর্শন। ভূস্বামী বলতে কেউই নেই। নেই কোনো গ্রাসেচ্ছু বণিক। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে কৃষকদের যথেষ্ট পরিশ্রম করাই উচিত; তারা কাজ করছে নিজেদের আর তাদেরই নিজেদের গবর্ণমেণ্টের জন্যে। কিন্তু তা হয় না। ক্রেম্‌লিনকে চুলচেরা হিসাব করে কাজ পিছু মজুরির হার বেঁধে দিতে হয়। কৃষিসংস্থার কৃষকরা, কলকারখানার শ্রমিকদের মতো, কাজের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে মজুরি পেয়ে থাকে মাত্র। তার ফলে কি যথেষ্ট উদ্যমশীলতার প্রসার ঘটে না তাদের মধ্যে? না, তা' ঘটে না। দেখা যায় যখনই এসেছে চাষের সময়, বাসন্তী বীজ বপনের কাল, শীতকালীন ফসল রোপণের এবং ফসল কাটার দিন, মস্কোয়ের সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তখনই অবতীর্ণ হয়েছেন দেশময় এক বিপুল আন্দোলন সৃষ্টির কাজে। কৃষকদের আবার ভূমিকর্ষণ আর বীজবপনের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেন? কৃষকের স্বাভাবিক সংস্কারই তো হলো ভূমিকর্ষণ আর ফসল সংগ্রহ করা। কিন্তু মস্কো, লেনিনগ্রাদ, এবং রুশিয়ার বহু জনবহুল শিল্পপ্রধান মহানগরীর যাবতীয় নামকরা সংবাদপত্রে মাসের পর মাস বড় বড় সম্পাদকীয় নিবন্ধে ভূমিকর্ষণে বিলম্ব, বীজরোপণে আলস্য, মাঠে মাঠে ফসল পড়ে পড়ে নষ্ট হওয়া, লাঙ্গলগাড়ী অকর্মণ্য

অবস্থায় পড়ে থাকা, এ সব ব্যাপার নিয়ে তারস্বরে চিৎকার আর গালিগালাজ শাপশাপান্তের বিরাম থাকে না। শহরগুলোর এ সব নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? কৃষকদের কর্তব্য কী সে বিষয়ে শহরবাসীদেরই বা বক্তৃতা শোনাবার প্রয়োজনটা কিসের?

মস্কৌতে 'সাহিত্য-সংবাদ' (The Literary Gezette) বলে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে; কাগজখানা হচ্ছে সোভিয়েট য়ুনিয়নের লেখকসঙ্ঘের পরিচালক-সমিতির (Directorate of the Union of Soviet Authors.)। (প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, পত্রিকাখানি লেখকসঙ্ঘের নয়—'পরিচালক-সঙ্ঘের।') ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চের সংখ্যায় পত্রিকাখানির চারটি পৃষ্ঠা ভর্তি—পৃষ্ঠাগুলো সব সংবাদপত্রের আকারেরই—মাত্র একটি বিষয়েরই আলোচনা হয়। প্রথম পৃষ্ঠার আগাগোড়াই সেই একটি বিষয়ের আলোচনায় ভর্তি, দ্বিতীয় পৃষ্ঠাটিও তাই, তৃতীয়টিও তাই, চতুর্থটিও তাই। আগাগোড়া কাগজখানিতে আর কিছুই নেই, আছে শুধু ঐ একই বিষয়ের অবতারণা। বিষয়টি হলো সোভিয়েট কম্যুনিস্ট দলের কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব; শুধু সেই প্রস্তাবটি—অবিকল; কোনো টীকাটিপ্পনী নেই। প্রস্তাবটির শিরোনামা হচ্ছে 'যুদ্ধোত্তর কালে কৃষির উন্নতি সাধনের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে।'

সর্বত্র আদেশ প্রচারিত হয়ে গেল যে, সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রত্যেকখানি পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত করতে হবে এই প্রস্তাবটি; তাই Literary Gazette তার জন্যে দিয়ে দিলে পুরো একটি সংখ্যা।

লেখকরা সবাই অবশ্য ইতিপূর্বেই নিজ নিজ দৈনিক সংবাদপত্রে পাঠ করেছিলেন প্রস্তাবটি। কিন্তু Literary Gazette সাহস করলে না প্রস্তাবটিকে বাদ দিতে, কি তার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করতে। পিরামিডের শীর্ষ থেকে যে উপদেশ বিতরিত হয়ে থাকে তাতে কোনরূপ হস্তাবলেপ করতে সাহস পায় না কেউই।

কৃষির উন্নতি সাধনের জন্যে এই যে প্রস্তাব, এ হলো কার্পাস, চিনির বীট, শণ, ঘাস, এই সব জিনিষের উৎপাদনক্ষেত্রের আয়তন-বৃদ্ধি, গৃহপালিত পশুকুলের বংশবৃদ্ধি, জলসেক-ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, ট্রাক্টর-বাহিনীর কার্যের উন্নতি বিধান ইত্যাদি ব্যাপারের জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশপত্র (ukase) মাত্র। তারপর সে প্রস্তাবে বিবৃত করা হয়েছে যে, "বৎসর কয়েক হলো" সমষ্টিগত ক্ষেত্রগুলিতে কাজকর্মের বড়ই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বাস্তব উদাহরণস্বরূপ তাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, "সমষ্টির জাতীয়কৃত জমি গিয়েছে বেদখল হয়ে, আর সমষ্টির যন্ত্রপাতি, গোমহিষ, টাকাকড়ি এবং অন্যান্য সম্পত্তিও হয়েছে অপহৃত।"

এই সব অপকর্ম নিবারণের জন্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে। তবে মনে হয় এ সব দোষের মূল হলো কম্যুনিস্ট দলের সদস্যদের দ্বারা গণতন্ত্রবিরোধী পন্থায় সমষ্টি-গুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন, আর ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত, যখন লক্ষ লক্ষ কৃষকদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর-জুলুম করে এনে সমষ্টিভুক্ত করা হয় তখনকার সেই জবরদস্তির

ফলে উদ্ভূত সমষ্টির গঠনতন্ত্র। তখনকার সেই আক্রোশের ফলে, সমষ্টিভুক্ত হবার পূর্বে কৃষকরা লক্ষ লক্ষ গোমহিষের প্রাণবধ করে ছিল। তাদের নিজ নিজ গোমহিষ তারা সমষ্টিকে অর্পণ করতে একেবারেই ছিল নারাজ। আর আজ সেই সমষ্টিভুক্ত কৃষকেরা করছে সমষ্টির ধনসম্পদ অপহরণ। কেন? স্পষ্টতঃই, যদিও কৃষকদের জোরজবরদস্তি করে সমষ্টিভুক্ত করা হয়েছে তবুও তারা 'তাদের,' সরকারের, আর 'আমার,' এই তিনের মধ্যে ভেদ দেখে আসছে। কৃষকেরা সমষ্টিভুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু সমষ্টিগত মনোভাবের একান্ত অভাব রয়েছে তাদের মধ্যে। প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের সমষ্টিগুলোর মধ্যে, যা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলেই প্রকৃত সমষ্টি, সর্বসাধারণের সম্পত্তি বা অর্থ অপহরণের কথা শুনতেই পাওয়া যায় না, ধারণাও করা যায় না, আর স্বভাবতঃই সেখানে নেইও মাথা পিছু কাজের ব্যবস্থা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে যথাশক্তি শ্রম করে থাকে এবং সে শ্রমের ফল সকলেই উপভোগ করে সমভাবে।

বড় বড় কাজেই হাত চলে স্বৈরতন্ত্রের—দশ কোটি কৃষককে তাড়িয়ে এনে সমষ্টির খোঁয়াড়ে পূরেছেন স্টালিন। কিন্তু হাত চলে না তার সূক্ষ্ম কাজে। কৃষকদের মনোভাবের কোনোই পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি তা। ভ্রান্ত তার কর্মপদ্ধতি।

যাবতীয় কর্তৃত্ব ও কর্মপ্রয়াসকে পিরামিডের শিখরশায়ী করে রেখেছেন স্টালিন। এ-ই হয়ে থাকে স্বৈরতন্ত্রে, তা না হলে তা আবার কিসের স্বৈরতন্ত্র? অথচ তারই ফলে, আপনা থেকে

কোনো কাজই হয় না সোভিয়েট রুশিয়ায়। সব কিছুই সেখানে হচ্ছে এক-একটা 'আন্দোলন।' গমের বীজবপন, সে-ও একটা আন্দোলন; গাছ কাটা, তা-ও এক আন্দোলন; আর এই সব আন্দোলনের দুর্বার শক্তির একমাত্র উৎস হচ্ছে 'ঐ কেন্দ্র'— মস্কৌ; যৎযাবতীয় ব্যাপারের উদ্ভব ও পরিচালনা হয় সেখান থেকেই।

কলকারখানা কি জোতজমির জাতীয়করণ সম্বন্ধে তার মনোভাব কী, শুধু তা দিয়েই যাচাই করা চলে না কোনো শাসনব্যবস্থার স্বরূপ। কেন না কোনো একটি শাসনব্যবস্থা এ সব ব্যাপারের আনুকূল্য করা সত্ত্বেও হতে পারে ফাসিস্ত। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাপকাঠি হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড-য়ুনিয়ন, আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সে শাসনব্যবস্থার যা সম্পর্ক তাই। যদি কোনো গবর্ণমেণ্টের মনে এ বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, যেহেতু তা এখন ক্ষমতা লাভ করেছে সে হেতু দেশে কোনো ট্রেড-য়ুনিয়ন, এবং নাগরিক ও গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার আর কোনো প্রয়োজন নেই, তবে তা হলো স্বেচ্ছাতন্ত্র—তা কল-কারখানা আর ক্ষেতখামারের জাতীয়করণ সম্বন্ধে যে বিধি-ব্যবস্থাই তা করে থাকুক না কেন।

অচেতন বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা করার দ্বারাই স্বরূপ নির্ণীত হয় না কোনো গবর্ণমেণ্টের, জীবন্ত প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি তার ব্যবহারের দ্বারাই তা নির্ণীত হয়ে থাকে। কোনো একটি বিশেষ সমাজবিধান ব্যক্তিগত অধিকার থেকে জোতজমি

ছাড়িয়ে এনে সেই সব 'মুক্তভূমি'কে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে ভূমিদাসদের দিয়ে; পুঁজিপতিদের কবল থেকে কলকারখানা ছিনিয়ে এনে সে সব কলকারখানায় বন্দী করে রাখতে পারে শ্রমিকদের।

মানুষের 'পরে তার ফলাফল কী হয়েছে তাই দেখেই যাচাই করতে হয় ভূমি-সংস্কার, জাতীয়করণ, এবং পরিকল্পনা-ব্যবস্থার গুণাগুণ।

স্টালিনের রুশিয়ার সব চেয়ে মর্মন্তুদ নিষ্ফলতা হচ্ছে রাজনৈতিক কাজে যথার্থভাবে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, নামমাত্র হস্তক্ষেপ থেকেও, ক্রমশঃ, এবং বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে, জনগণের বিরতি। সমষ্টিগুলোর মতো সমবায়-ভাণ্ডারগুলোও রাষ্ট্রকবলিত; সে-সব হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার। এইভাবে ১৯৩৫ সালেই সোভিয়েট ট্রেড য়ুনিয়নগুলোর দ্বারা সমষ্টিগত ভাবে মজুরিব হার সম্বন্ধে দরদস্তুর করার ব্যবস্থার ঘটেছে অবসান। সেই থেকে কারখানার ম্যানেজার আর আপিসের ডিরেক্টরই একতরফা লোক ভাড়া করে আসছেন, তাড়াচ্ছেন তাদের, মজুরিও ঠিক করে আসছেন শুধু তাঁরাই।

এ সবই হচ্ছে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বিলুপ্তি। এ হলো অর্থনৈতিক স্বৈরতন্ত্র।

সোভিয়েটগুলো, অর্থাৎ পল্লী ও নগরের শাসনসভাগুলো, অল্প কিছু কালের জন্যে ছিল সাধারণ লোকের মুখপাত্র, নগরসভার শাসনযন্ত্র। এখন সে সব হয়েছে বেতনভোগী কম্যুনিস্ট

কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। জনগণের কণ্ঠস্বর কানেও আসে না আর।

এই হলো রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিলুপ্তি। এ হচ্ছে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাতন্ত্র—এ তন্ত্রের একমাত্র কর্ণধার হলেন স্টালিন।

এইরূপে স্টালিনই হচ্ছেন পাঠশালার স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ বিশেষ উচ্চতর শিক্ষামন্দির অবধি সমগ্র সোভিয়েট শিক্ষাবিধানের দ্রুত ও ব্যাপক বিস্তারলাভের জন্যে দায়ী। সোভিয়েট য়ুনিয়নে যে চৌদ্দ বছর আমি একজন বিদেশী সাংবাদিক রূপে কাটিয়ে এসেছি তার মধ্যে আমি অনর্গল রুশিয়ান বলতে শিক্ষা করি এবং দেশের বহু ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করি। সর্বত্রই আমি দেখেছি শিক্ষা ও অগ্রগতির নবীন সম্ভাবনা সম্বন্ধে লোকের মনে পরম প্রত্যয়ের ভাব। দরিদ্র শ্রমজীবী, কৃষক, পর্বতনিবাসী, সবাই বোঝে যে জারের আমল থাকলে আজও তাদের বন্দী হয়ে থাকতে হতো নিরক্ষরতার অন্ধকূপে। অথচ বর্তমানে বহু মুঝিক্-জননীও সগর্বে ঘোষণা করে থাকেন, "আমার একটি ছেলে শিক্ষাব্রতী, আর একটি আছে লাল ফৌজে, আর মেয়েটি আমার এক কারখানার সর্দারণী (forewoman)। নিজেও আমি খবরের কাগজ পড়তে পারি।"

সোভিয়েট শিক্ষাবিধির উদ্দেশ্য হলো যান্ত্রিক দক্ষতা, রাষ্ট্রসেবা, এবং নির্বিচার নেতৃসমর্থন-প্রবৃত্তির প্রসার সাধন। লক্ষ লক্ষ লোক আজ লিখতে পড়তে শিখেছে। কিন্তু স্টালিন যা পছন্দ করেন না সে জিনিষ পড়তে পায় না তারা। বিদেশী সংবাদপত্র ও

অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ রুশিয়াতে। সোভিয়েট সংবাদপত্র ও বিবিধ পত্রিকা এবং সোভিয়েট বেতার ভয়াল সেন্সার-দলের সতর্ক প্রহরায় সুরক্ষিত। বিদেশী বইপত্রের মধ্যে যেগুলো সোভিয়েটতন্ত্রের গুণগ্রাহী কিংবা গণতন্ত্রী জাতিদের জীবনযাত্রাপ্রণালীর কোনো কোনো ব্যাপারের সমালোচনা করতে অভ্যস্ত, শুধু সেগুলোরই অনুবাদ হয়ে থাকে। সোভিয়েট লেখকদেরও নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়; নতুবা তাঁদের রচনা প্রকাশিত হবে না, অথবা নিরবচ্ছিন্ন বহিষ্কারের স্রোতে যাবে ভেসে। ট্রট্স্কী, বুখারিন, রাদেক (Radek) এবং অন্যান্য যে সব সোভিয়েট দিকপালকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে তাঁদের বিষয়ে সমুদয় সহৃদয় মন্তব্য কিংবা তাঁদের রচনাসমূহ সোভিয়েট বিশ্বকোষ, ইতিকথা ও পাঠ্যপুস্তক থেকে সযত্নে পরিহার করা হয়ে থাকে। দু'চারটে বিশেষ শ্রেণীর পুস্তকাগারে স্টালিনের বিরুদ্ধবাদীদের গ্রন্থাবলী রক্ষিত আছে বটে, কিন্তু উচ্চতম কর্মচারীদের অনুমতি ব্যতীত সে সব বই পড়তে দেওয়া হয় না।

(একেই অনেকে অভিহিত করে থাকেন 'গণতন্ত্র।')

সোভিয়েট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত, কারুশিল্প, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সর্ববিধ বিষয়েই প্রচুর আগ্রহ রয়েছে স্টালিনের। সোভিয়েট লেখক ও কলাবিদ্‌গণের প্রভূত অর্থ উপার্জনের সুব্যবস্থা করে দিতে যত্নের অবধি নেই তাঁর। বাস্তবিক সোভিয়েট য়ুনিয়নে এঁরাই বোধহয় সব চেয়ে বিত্তশালী ব্যক্তি।

এমন কি এঁদের আরামে বসবাসের জন্যে সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘরের কিংবা স্বাস্থ্যনিবাসে অবসর যাপনের সুব্যবস্থা করে দেবার জন্যে বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন স্টালিন।

এক রাত্রে স্টালিন গেলেন সোভিয়েটের প্রসিদ্ধতম গীতিকার শোস্তাকোবিচ (Shostakovitch) প্রণীত Lady Macbeth of Mtsensk নামক গীতিনাট্যের অভিনয় দর্শন করতে। জারের আমলের ইতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল সে গীতিনাটিকায়। তখন অবধি ছোটখাট দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং নাট্যপত্রিকার তো কথাই নাই, 'প্রাভ্দা' (Pravda) আর 'ইজ্ভেস্তিয়া'র (Izvestia) মতো বড় বড় সংবাদপত্রিকায়ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে আসছিল নাটিকাখানি। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ অন্যান্য দেশেও নাটকখানির অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে সাহায্য করেছিলেন, এবং সর্বত্রই তা প্রশংসা অর্জনও করেছিল। তারপর 'আন্তর্জাতিক নাট্যরসিক মহল' (International Theatre Festival) যখন মস্কো সফরে এলেন, সোভিয়েট ভ্রমণসঙ্ঘ (Soviet Touirst Bureau) তখন কালবিলম্ব না করে Lady Macbeth of Mtsensk-এর প্রতি বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বৎসর কয়েক যাবৎই মস্কো এবং অন্যান্য নগরীরে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়ে আসছিল নাটিকাখানি। স্টালিনের কিন্তু তা' পছন্দ হলো না। পরদিনই তলব করে পাঠালেন তিনি 'প্রাভ্দা'র ডেভিড ইয়াশ্লাব্স্কাইকে (David Zaslavsky); তাঁর কাছে শোস্তাকোবিচের

গীতিনাটিকাখানির নিন্দাবাদ করলেন তিনি তানলয়হীন ও মর্ম-পীড়াদায়ক বলে। এক প্রবন্ধে স্টালিনের এই অভিমত উদ্ধৃত করে দিলেন ইয়াল্লাবস্কাই। অন্যান্য যে সব কাগজ ইতিপূর্বে 'লেডী ম্যাকবেথ'-এর প্রশংসায় আকাশ ফাটিয়ে তোলার যোগাড় করেছিল, 'প্রাভ্দা'র সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও সুর গেল বদলে। সোভিয়েট রাজ্যময় বন্ধ করে করে দেওয়া হলো এ গীতিনাটিকাখানির অভিনয়। অপদার্থ সঙ্গীতকার বলে নিন্দিত হতে লাগলেন শোস্তাকোবিচ। এর পর অনেক মাসের মধ্যে তাঁর কোনও রচনাই আর মঞ্চস্থ হতে পারে নি। অবশেষে স্টালিনের নির্দেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে পর দুর্গতি ঘোচে তাঁর।

'লেডী ম্যাকবেথ' দেখার কয়েকদিন পরে জেরঝিন্স্কাই (**Dzerzhinsky**) নামে জনৈক তরুণ সঙ্গীতকারের রচিত এক গীতিনাট্য দেখতে যান স্টালিন। সুরলয় পছন্দ হয় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে জেরঝিন্স্কাই হয়ে দাঁড়ান নির্লজ্জ সাধুবাদের পাত্র।

স্টালিনের রুচিই সোভিয়েটের আইন। সঙ্গীতজ্ঞ তিনি নন, সঙ্গীতের সমঝদারির কোনো শিক্ষাও পাননি তিনি। কিন্তু তিনি হলেন ডিক্টেটর, কোনো ব্যাপারেই মাথা নীচু করা চলে না তাঁর। চিত্রকলা সম্বন্ধে হিটলারেরও ছিল ঠিক এই একই ব্যবহার।

ডিক্টেটর হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। তাঁকে হতে হবে শ্রেষ্ঠতম সমর-কুশলী, হতে হবে তীক্ষ্ণতম অর্থনীতিবিদ্, প্রধান কলাবিশেষজ্ঞ

এবং মুখ্য দেশপ্রেমিক। প্রত্যেকটি ব্যাপারে হাত থাকা চাই তাঁর।

বোরিস পিলনিয়াক্ একজন খ্যাতনামা সোভিয়েট ঔপন্যাসিক। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাঁর রচিত 'বহে ভল্‌গা কাস্পীয় সাগরে' (The Volga flows into the Caspian Sea) নামক উপন্যাসখানার কাট্‌তি ছিল খুব বেশি। তাঁর বেশির ভাগ বই সম্বন্ধেই সেই একই কথা। এক সময় তিনি বিদেশভ্রমণের জন্যে সোভিয়েট ছাড়পত্র চাইলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হলো। তাঁর খান-কয়েক বই বিদেশেও প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব বিদেশে ব্যয় করবার মতো অর্থের অভাব ছিল না তাঁর। সুতরাং অর্থাভাবের অজুহাতে তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হবার কথা নয়। ফের আবেদন পেশ করলেন তিনি ; ফের তা নামঞ্জুর হলো। তখন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত লিপি পাঠালেন স্টালিনের কাছে। স্টালিনের ব্যক্তিগত পত্র নিয়ে সেই দিনই দূত এল তাঁর কাছে, তাতে এ ব্যাপারে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করবেন বলে ভরসা দান করেন স্টালিন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বেরিয়ে এল ছাড়পত্র, তিনিও বেরিয়ে পড়লেন বিদেশ-ভ্রমণে।

জনকয়েক আমেরিকান সাংবাদিক উরাল ও সাইবেরিয়া অঞ্চল পরিভ্রমণের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলেন ; পররাষ্ট্র-সচিব মোলোটোব নামঞ্জুর করলেন তাঁদের সে-আবেদন। মোলোটোবকে ডিঙিয়ে তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করলেন স্টালিন।

এ-ই হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক কলাকৌশলের একটি অঙ্গ। 'প্রভু'

হবেন সর্বশক্তিমান, পরম দয়াল। ঠিক এম্নি ব্যাপারই ঘটতো নাৎসী জার্মানীতে। দিকে দিকে যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে ব্যাপক হিটলারী অত্যাচার, জার্মান জনসাধারণ তখন বলতো সে সব ব্যাপার নিশ্চয়ই অবগত নন হিটলার নিজে; অবগত হলে "কিছুতেই সইতেন না তিনি এ হেন অন্যায় অত্যাচার।" নিখুঁৎ করেই আঁকতে হয় ডিক্টেটরের ছবি—তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবার স্পর্ধা থাকতে পারে না অপর কারও।

শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রে। দরিদ্রের দেশ রুশিয়া; অপর্যাপ্ত সম্পদ নেই তার। তবুও তারই মধ্যে যা কিছু ভালো তার সবটুকুই ব্যয়িত হয় শিশুকল্যাণে। সোভিয়েট বালকবালিকাদের স্কাউটে ব্যবহৃত হয় একটি ধ্বনি-মন্ত্র, তার অর্থ: 'আমাদের আনন্দময় জীবনযাত্রার জন্যে ধন্যবাদ গ্রহণ করো কমরেড স্টালিন!'

কূটনীতির খাতিরে মেপে মেপে হিসাব করে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে স্টালিনের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি, তাঁর প্রতিটি উক্তি, এমন কি তাঁর মুখমণ্ডলের মৃদু হাসির আভাসটুকুও। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে রুশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব মোলোটোব ও জার্মানীর পররাষ্ট্রসচিব ফন রিবেনট্রপ এ দু'জনের রুশ-জার্মান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্টালিন। সমারোহে সংঘটিত সন্ধি ব্যাপারে ইতিপূর্বে আর কখনও সশরীরে উপস্থিত থাকেন নি তিনি। তাঁর তখনকার সেই মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত মুখাবয়বের একটা ফটো তোলা হয়।

এই ফটোটাই হলো সোভিয়েট তথা সমগ্র জগতের কাছে তাঁর সে চুক্তি অনুমোদনের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে 'প্রাভদা' কাগজে সাড়ম্বরে ঘোষিত হলো: "কমরেড স্টালিন তিফ্‌লিসে গিয়েছিলেন তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে ফিরে আসছেন তিনি···মস্কো।" স্টালিন-জননী, যাঁর অস্তিত্বের উল্লেখটুকু পর্যন্ত এতদিন ঘটে নি সোভিয়েট সাংবাদিক মহলে, তাঁর দর্শনা-কাঙ্ক্ষায় জমে গেল লোকের ভিড়। স্টালিনের মাতৃভক্তি সম্বন্ধে বড় বড় প্রবন্ধ বার হতে লাগল সংবাদপত্রে; প্রকাশ্য জনসভায় সেই সব তরুণ কমরেডদের উদ্দেশ্যে সুরু হয়ে গেল গালিগালাজ যারা তাদের বয়স্ক জনকজননীদের উপেক্ষা করেই এসেছে এতদিন। ১৯৩৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর 'প্রাভদা' ছেপে দিলে একজন উপেক্ষিতা জননীর করুণ কাহিনী।

অবশ্য অপর কোনো সোভিয়েট নেতার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এতটা মাতামাতি নিতান্তই বিরল। স্টালিন সম্ভবতঃ স্থির করেছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদের সঙ্গে তাদের জনকজননীদের সম্পর্ক যেরূপ তিক্ত হয়ে উঠেছে তার একটা বিহিত করার প্রয়োজন হয়েছে। প্রায় এই সময়ে এ-ও স্থির হয় যে, যানবাহনে চলাচলের সময় সোভিয়েট নাগরিকদের ভদ্রভাবে চলাফেরা করা উচিত। আর এই সময়েই কম্যুনিস্ট স্বামীরা তাদের পরিত্যক্তা পত্নীদের সঙ্গে যে সব ছেলেমেয়েরা থাকে তাদের অবহেলা করবার

অপরাধে কটূক্তি শুনতে আরম্ভ করেন। অবিলম্বেই মস্কৌর দলের সদস্যরা তাঁদের সব বহু কালের পরিত্যক্তা ও অনাদৃতা পত্নীদের কাছ থেকে টেলিফোনযোগে জানতে চান তাঁদের 'ছোট লেনোচ্‌কা' কি 'বাচ্চা ভাস্কাকে' দেখতে যেতে পারেন কি না তাঁরা। এই যে এত বড় একটা পরিবর্তন দেখা দিল, এর আগাগোড়াই হলো বাধ্যতার বশে।

আধুনিক স্বৈরতন্ত্র একদিকে এসে প্রবেশ করেছে বৈঠকখানায়, শয়নকক্ষে, শিল্পীর কলাভবনে, আর একদিকে গিয়ে ঢুকেছে কলকারখানায়, আপিসে, খামারবাড়ীতে। এই তো হালে আইন করা হয়েছে যে, সোভিয়েট নাগরিকরা বিদেশিনী-দের পাণিগ্রহণ করতে পারবে না। স্বৈরতন্ত্রমাত্রই চেষ্টা করে থাকে প্রত্যেক পরিবার পিছু সন্তানসন্ততির সংখ্যাবৃদ্ধি করতে। রুশীয় শাসনব্যবস্থায়ও দশ এবং তদূর্ধ্ব সংখ্যক সন্তানের জননীকে পুরস্কৃত করার ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রথার প্রবর্তক স্টালিন স্বয়ং। ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট জনস্বাস্থ্যবিভাগের অধ্যক্ষ কামিন্‌স্কাই-এর (Kaminski) সঙ্গে যখন আমার আলোচনা হয় ভ্রূণহত্যা-নিবারণী আইন সম্বন্ধে, যার দৌলতে রুশিয়ায় ভ্রূণহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, অথচ জন্মশাসনের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আয়োজনের রয়েছে একান্ত অভাব, তখন তিনি জবাব দেন: "কর্তা চান আরও ছেলেমেয়ে।"

সোভিয়েট রুশিয়ায় এই 'কর্তা' বা 'প্রভু' শব্দটাই হচ্ছে

সব যুক্তির সেরা যুক্তি। প্রভু অভ্রান্ত। কিন্তু গান্ধী বলেন, "আমি অভ্রান্ত এ বিশ্বাস কখনই পোষণ করিনে আমি।" নিজের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে অন্ধবিশ্বাস নেই বলেই ধৈর্য সহকারে সকলের কথা শুনতে এবং প্রয়োজন বোধে মত পরিবর্তন করতে প্রস্তুত তিনি। ডিক্টেটরের প্রয়োজন কঠোর, কর্কশ, ও অনমনীয় হওয়া।

বহুক্ষেত্রে নিজেকে দায়ী করে থাকেন গান্ধী। স্টালিন দায়ী করেন অপরকে। বিরোধিবর্গের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করে থাকেন গান্ধী, তাঁর প্রয়াস তাদের স্বমতে আনয়ন। স্টালিন করেন তাদের দমন।

স্টালিন লাভ করেন আনুগত্য।

গান্ধী লাভ করেন প্রেম ও বিশ্বাস।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে কি রুশিয়ায় ?

শাসনকর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ব্যতীতই জনগণ পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে কতখানি বিশ্বাস রক্ষা করে চলে তাই দিয়েই হয় গণতন্ত্রবিশেষের গুণাগুণের বিচার। স্বৈরতন্ত্রে কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেও রাজনীতিরই চরম প্রাধান্য, নীতিধর্মের স্থান নিতান্তই গৌণ। স্বৈরতন্ত্রের আওতায় অনবরত কাঁধ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে কর্তৃপক্ষের দিকে চাইতে চাইতে লোকের ঘাড়ের মাংস-পেশীগুলো শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে। কার্য্যতঃ সকল রকমের ব্যক্তিগত সম্পর্কই সেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা প্রভাবিত।

সোভিয়েটে এক-একবারের 'বহিষ্কারের' ফলে মানুষের প্রাণ আর স্বাধীনতার ঘটেছে নিদারুণ অপচয়। আর তার সব চেয়ে মারাত্মক ফল হয়েছে বন্ধুত্বের অবলোপ। অপরিসীম নির্ভরতা আর পরিপূর্ণ সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা হলো বন্ধুত্বের ভিত্তি। বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখে ভাবের আদানপ্রদান, পরস্পরের আলাপ। রুশিয়াতে কথা হয় প্রচুর, আলাপ হয় ক্বচিৎ।

রুশিয়ায় প্রাথমিক বিশ্বস্ততা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি। তোমার বন্ধু যদি তোমার কাছে এমন কোনো কথা ব্যক্ত করে ফেলে যে

তাতে করে প্রকাশ পায় চল্‌তি রাষ্ট্রবিধান সম্বন্ধে তার অন্তরের কোনো সংশয় অথবা নেতৃবর্গের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব তবে তোমার কর্তব্য হচ্ছে সে সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনয়ন করা। আর যদি কোনোদিন এ কথা প্রকাশ পায় যে, বন্ধুর মনোভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও সে সংবাদ চেপে গেছ তুমি তবে বিপদ ঘটবে তোমার। আর তোমার বন্ধু যদি গ্রেপ্তার হয়—তা' প্রায় সকলেই এ রকম অতি উৎসাহী গবর্ণমেণ্টের জন্যে কাজ করে থাকে বলে কে যে কখন গ্রেপ্তার হবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই—তবে তোমার কাজ হবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার বিষয়ে যা কিছু তোমার জানা আছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে আসা। এ হেন অবস্থার মধ্যে টিঁকতে পারে না বিশ্বাস ও সরলতা। তোমার অন্তরতম ভাবনার সাথী করে নিতে পারবে না তুমি তোমার সুহৃৎকে, কি তোমার সহধর্মিণীকে, কিংবা তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে।

ফাসিস্তদের মতো কম্যুনিস্টরাও মানবচরিত্রের সদ্‌গুণাবলীর করে থাকে অপব্যবহার। নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অর্থের বিকৃতি সাধনের দ্বারা অপব্যবহার করে থাকে তারা মানুষের বাক্যকে। একবার এক প্রকাশ্য জনসভায় কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে অনুরুদ্ধ হন গান্ধী। উত্তরে বলেন তিনি; "মনে হয় সৎ এবং অসতে, সত্য ও মিথ্যায়, প্রভেদ মানে না তারা।" "অবশ্য এ অভিযোগ তারা অস্বীকার করে থাকে," তাদের প্রতি সুবিচার করবার জন্যে বল্লেন তিনি,

"কিন্তু তাদের কার্যকলাপে যেন পাওয়া যায় এ অভিযোগেরই সমর্থন।"

মানুষের অপব্যবহার হচ্ছে মানবিক দাসত্ব। বাক্যের অপব্যবহার হলো মনীষার দাসত্ব। উভয়ত্রই ঘটে স্বাধীনতার অবলোপ। কোনো গণতন্ত্র যখন মানুষের, মনের, এবং বাক্যের স্বাধীনতার চারপাশে গণ্ডি টেনে দেয় তখন তা হয়ে দাঁড়ায় স্বৈরতন্ত্রেরই অনুরূপ, আর তারই ফলে স্বৈরতন্ত্রের বৈরিতা হতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা বহুলাংশে লোপ পায় তার।

গণতন্ত্র যে পরিমাণে হবে গান্ধীর ভাবে অনুপ্রাণিত সেই পরিমাণেই তা পারবে স্টালিন কি হিটলারের ভাবে জর্জরিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে।

সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কর্তব্য হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের লক্ষণসমূহ প্রস্তরফলকে খোদাই করে তার সঙ্গে এই কথাটি যোগ করে দেওয়া: "এ সকল দোষ হইতে মুক্ত থাকিবে।"

১। অভ্রান্ত নেতার উদ্দেশ্যে সরকারী প্রশস্তি (যথা— "স্বাগত হে হিটলার." "মহামতি স্টালিন." "দুচে, দুচে, দুচে," "ফ্রাঙ্কো, ফ্রাঙ্কো, ফ্রাঙ্কো," "টিটো, টিটো, টিটো।");

২। রাজনৈতিক বিরোধ সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা;

৩। শাস্তিদান ও ভীতিপ্রদর্শনের অভিপ্রায়ে প্রায়শঃ বলপ্রয়োগ;

৪। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টাকে নিরুদ্যম করা: সমভাব (uniformity);

৫। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততার অভাব ;

৬। রাষ্ট্রের প্রতি হীন অনুরক্তি দাবি ;

৭। অটল প্রত্যয় (অভ্রান্ত স্ববিধান, ভ্রান্ত পরমত) ;

৮। চল্‌তি রাষ্ট্রবিধানের খাতিরে প্রাণের মূল্য, সুখশান্তির অভাব, নৈতিক অধোগতি, সব কিছুর প্রতি উপেক্ষা ; উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে অধর্মাচরণ ;

৯। ছিদ্রান্বেষণ ;

১০। ইতিহাসের বিকৃতি সাধন ;

১১। স্বপন্থার গুণগানে দেশে ও বিদেশে অবিরাম অপপ্রচার ;

১২। পরদেশবাসী ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে অসংযত বিষোদ্গার ;

১৩। বৈদেশিক সমালোচনায় অন্তর্দাহ ;

১৪। অক্ষম ও পতিতের কঠোর সরকারী সমালোচনা অথচ শাসনকর্তৃপক্ষ, ডিক্টেটর, কিংবা তাঁর প্রাসাদরক্ষীদের মধ্যে যারা তাঁর প্রিয়পাত্র তাদের মধ্যে কেউ “বহিষ্কারের’ জন্যে নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাদের সামান্যতম সমালোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকা ;

১৫। গোপনতা ;

১৬। জনসাধারণের নাগালের বাইরে নেতৃবর্গের অবস্থান ;

১৭। বৃহৎ পরিবার সৃষ্টির জন্যে উৎসাহ দান ;

১৮। বিশাল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ;

১৯। রাজ্য জয় ও বিস্তারলাভের কামনা ;

২০। অপরের চোখে দুর্বল প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ;

২১। প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি দৃঢ়তর করবার জন্যে স্বদেশের প্রতি পররাষ্ট্রের বিদ্বেষভাবকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা ;

২২। চলতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন-প্রচেষ্টার বিরোধিতা ;

২৩। কর্মকর্তৃবর্গের ঘন ঘন রদবদল ;

২৪। ব্যক্তিস্বাধীনতার ক্রমসঙ্কোচন ;

২৫। ট্রেড-য়ুনিয়নগুলোকে রাষ্ট্রপরবশ করে তোলা ;

২৬। ডিক্টেটর ও গুপ্ত পুলিশ ছাড়া অপর সকলের রাজনৈতিক ক্ষমতা অপহরণ ; ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব ;

২৭। বিচারবিভাগ ও ব্যবস্থাপক বিভাগকে শাসনবিভাগের আয়ত্তে আনয়ন ;

২৮। রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র ও বিধিনিষেধের (আইন) প্রতি উপেক্ষা ;

২৯। জনগণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে দেশময় নানারূপ আমোদপ্রমোদ, কুচকাওয়াজ, উৎসব, অভিযান প্রভৃতির আয়োজন ;

৩০। ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপরবশ করে তোলা ;

৩১। বিবেকমূল্যের বিনিময়েও রাষ্ট্রের অনুগ্রহ লাভের জন্যে ব্যষ্টির ঐকান্তিক আগ্রহশীলতা ;

৩২। পরিণামে বিবেকের ক্ষয়।

এই সব হচ্ছে ডিক্টেটরতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। ফলে একদিকে শাসনব্যবস্থা ক্রমে হয়ে ওঠে শক্তিশালী, অপর দিকে ব্যক্তি হয়ে পড়ে একান্ত সহায়সম্বলহীন। গান্ধীর শিক্ষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের সহায়ে ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ সাধন ; রাষ্ট্র বড় হয়ে উঠে ব্যক্তিকে গ্রাস করে বসতে পারে তাই সেখানে রাষ্ট্রেরই পায়ে পদে পদে বেড়ি দিয়ে চলতে হয়।

গণতন্ত্রের কর্তব্য হচ্ছে শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কবল থেকে নির্বাচনাধিকার-প্রাপ্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে রক্ষা করা। তা' ছাড়া সংখ্যাগুরুর হাত থেকে সংখ্যালঘুদের, এবং সংখ্যালঘুদেরও পরস্পরকে পরস্পরের হাত থেকে রক্ষা করা তার কর্তব্য।

বাক্য, পূজা-অর্চনা, সম্মিলন এবং ভোটদানের অধিকারই হচ্ছে গণতন্ত্র। তা' ছাড়া কর্মপ্রাপ্তি, শিক্ষালাভ, সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা, বৃদ্ধবয়সের পেন্সন, এ সব জিনিষের উপর দাবিও গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত।

আইনের আশ্রয়ে অনপহরণীয় স্বাধিকারই গণতন্ত্র। রুশিয়াতে ব্যক্তিরা কতকগুলো সুখসুবিধা ভোগ করে ঠিকই, কিন্তু সে সবই হচ্ছে রাষ্ট্রের অনুগ্রহের দান মাত্র—যে কোনো মুহূর্তেই তা' কেড়ে নেওয়া যেতে পারে। ফলকথা এই যে, সোভিয়েটে

স্বাধিকার বলে কোনো জিনিষেরই অস্তিত্ব নেই। তখনই তাকে বলবো স্বাধিকার যা কখনও কেউ কেড়ে নিতে পারে না। সোভিয়েটে আইন বলতে কিছু নেই। যাবতীয় বিরুদ্ধ-শক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করে আইনকে অতিক্রম করে চলে গেছে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র—হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ। অথচ তাকেই বলবো আইন যা গবর্ণমেণ্ট তথা প্রজাসাধারণ সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। স্বৈরতন্ত্র তাই হচ্ছে এমন একটি বে-আইনী ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি হলো একান্ত অসহায়।

আদিম যুগের গুহামানব একখানা গদার জোরে প্রভুত্ব করত একজন বা দশজন লোকের 'পরে। একজন ডিক্টেটর রাষ্ট্রের সংবাদপত্র, ছাপাখানা, রেডিয়ো, চাকরী, শিক্ষাপদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এবং গুপ্তপুলিশের জোরে প্রভুত্ব করতে পারেন দশকোটি লোকের 'পরে। মধ্যযুগের শিল্পজীবীরা ভাড়া করত দু'একজন শিক্ষানবিশ, এখন একটি মোটার কারখানার মালিক ভাড়া করেন হাজার হাজার লোক। মধ্যযুগে একটি সমগ্র শাসনতন্ত্র যত লোকের 'পরে না প্রভাব বিস্তার করত, বর্তমানে তার চেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকেন এক-একজন পুঁজিপতি।

সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের বেড়েছে ব্যক্তিকে রক্ষা করার দায়। রাষ্ট্র-সহায়তা ও বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া আধুনিক যুগে ব্যক্তিরা অসহায়। আবার রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা যে কোনো সময় তাকে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় টেনে আনতে পারে। কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা যে কত বড় অন্যায় তার নিদর্শন হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র। এখানেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বর্তমানযুগের সবচেয়ে বড় অমীমাংসিত উভয়সঙ্কট।

অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত শাসনকর্তৃত্বের বিষময় ফলের নিদর্শন দেখতে পাই স্বৈরতন্ত্রে। গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সমগ্র শাসন-যন্ত্রটির অপরাধ সমালোচনা করার এবং সমস্ত শাসনযন্ত্র বা তার যে কোনো সভ্যকে অপসারণ করবার অধিকার। আজ পর্যন্ত এশিয়া বা ইউরোপের কোনো ডিক্টেটরকেই ভোটের জোরে স্থানচ্যুত করা যায়নি; সামগ্রিকতন্ত্রে অথবা একদলীয় শাসন-ব্যবস্থায় তা সম্ভবপর নয়। গণতন্ত্রে সময়ান্তে একদলকে সরিয়ে দিয়ে অন্য দলের প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ আছে—তা' উভয় দলের মধ্যে মত ও পথের বিশেষ গরমিল যদি না-ও থাকে তবুও এ ব্যবস্থা কল্যাণকর। কারণ বহুকাল যাবৎ একদলের হাতে ক্ষমতা থাকলে তাতে নানা গলদ এসে ঢোকে। কিন্তু সর্বশক্তিমান ডিক্টেটর হচ্ছেন চিরন্তন প্রভু; তিনি প্রশ্রয় দেন শুধু তাঁর চারপাশের হাঁ-পন্থী লোকদের। ফলে বেড়ে যায় কপটতা, চরিত্রের হয় অধোগতি, স্বাধীনতার ঘটে অপমৃত্যু।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্র আপন প্রকৃতিপুঞ্জের কাছে এবং বহির্জগতের চোখে নিজের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করবার জন্যে মাঝে মাঝে নির্বাচনের আয়োজন করে থাকে। কিন্তু নির্বাচনে সামান্য অর্থাৎ শতকরা দশ, বিশ কি ত্রিশ ভাগ বিরোধী ভোট হলেও প্রমাণ

হবে যে দেশে শাসনকর্তৃপক্ষের বিরোধী একটি দলের অস্তিত্ব আছে এবং একটি বিরুদ্ধ-দল স্থাপনার বাসনাও রয়েছে লোকের মনে। তাই নির্বাচন হওয়া চাই সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং হিটলারী জার্মানীতে কার্যতঃ সকলকেই ভোট দিতে হতো 'হাঁ'। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের মারফৎ সংবাদ পাওয়া যায় যে, শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি হয়েছে শাসনকর্তৃপক্ষীয় দলের ভোট। কিন্তু দশ কোটি লোক একমত হতে পারে না কোনো বিষয়েই। একমত হতে পারে না তারা টেলিফোনের কোনো প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে, স্নান করা স্বাস্থ্যকর কি না তা নিয়ে, অথবা রুটির উপকারিতা সম্বন্ধে। ভয়ের কোনো কারণ না থাকলে সবাই মিলে স্টালিনের পক্ষে ভোট দিত না নিশ্চয়ই।

স্বৈরতন্ত্রে চরম সত্য হলো ভীতি, এবং সোভিয়েট-ভীতির মাত্রা বেড়েই চলেছে বছরের পর বছর। সামগ্রিক-তন্ত্রের নিয়মই এই : ক্রমেই তা আরও সামগ্রিকতন্ত্রী হয়ে উঠতে থাকে।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব জেম্‌স্ সি. এড, (James C. Ede) একবার বলেছিলেন, "আমাদের এই গণতন্ত্র যেম্নি প্রাচীন তেম্নি রসিক।" কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি টেনে এনে হাল্কা হতে জানে না স্বৈরতন্ত্র; বেঁচে থাকে তা প্রাণপণ বলে—নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার খোরাকের 'পরে। স্বৈরতন্ত্রে সব সময়ই প্রয়োজন হয় শত্রুর, কারণ উত্তেজনা আর আতঙ্ক সৃষ্টির মস্ত বড় অজুহাত সেটা। শত্রু যদি না-ও থাকে তবে নিজেই তা সৃষ্টি করে নেয় শত্রুদল, কাঁপিয়ে তোলে তাদের।

মিসেস্ ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (Mrs. Franklin D. Roosevelt) হলেন আমেরিকার রাজনৈতিক নেতা ও নেত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় গান্ধীপন্থী। ১৯৪৬ সালে যুক্তজাতি-সঙ্ঘের এক অধিবেশনে সোভিয়েটের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব আঁদ্রেই বিশিন্স্কাইয়ের (Andrei Vishinsky) সঙ্গে মানুষের অধিকার নিয়ে এক তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "এক-একটা জাতি হিসাবে আমরা কি এতই দুর্বল যে মানুষকে তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে বাধা দেব?... আমার নিজের দেশের শাসনযন্ত্র বা আমার জাতি যে সর্বদাই অভ্রান্ত বা ন্যায়পথবর্তী এমন আমি মনে করি নে। তবে আমি আশা করি ক্রমেই তা সেরূপ হয়ে উঠবে এবং তাতে আমি যথা-সাধ্য সাহায্যও করব।" তাই যুক্তজাতিপুঞ্জকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন "বিবেচনা করে দেখতে কিসে মানুষ অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে; গবর্ণমেণ্ট নয়, মানুষ।"

মিসেস্ রুজভেল্টের প্রশ্নের উত্তরে বিশিন্স্কাই বলেন, "সহিষ্ণুতাকে স্বীকার করে নিতে চাই নে আমরা।" সামগ্রিক-তন্ত্রের মূল যুক্তিই ঐ। অসহিষ্ণুতাকে সর্বদাই সমর্থন করতে পারেন ডিক্টেটর; যতদূর অগ্রসর হয়েছে জনগণ তার জন্যে কত লোককে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে সে কাহিনীর পুনঃপুনঃ উল্লেখে অরুচি নেই তাঁর। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, সহনশীল হতে প্রস্তুত নন তিনি। সহনশীলতা সয় না স্বৈরতন্ত্রের।

সোভিয়েট রুশিয়ার উদয়াচলে গণতন্ত্র-অরুণিমার কোনো আভাস চোখে পড়ে কি? কম্যুনিস্ট দলে কি প্রাণখোলা আলোচনার অবকাশ আছে? অবশ্য প্রায় ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তা ছিল এবং সে সব আলোচনা মুদ্রিতও হতো সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলোয়। কিন্তু সে দিন আর নেই। এখন কি সোভিয়েট শাসনযন্ত্র, স্টালিন অথবা রুশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোনো খোলাখুলি সমালোচনা হয়? একবিন্দুও নয়। স্টালিন ত্রুটিহীন ব্যক্তি হতে পারেন, হয়তো কখনও ভুল করেন না তিনি; হয়তো সোভিয়েট শাসনযন্ত্র যাতে হাত দিয়ে থাকে তাতেই করে সফলতালাভ, প্রয়োজন হয় না কোনো অভিযোগের। কিন্তু তা নয়। স্টালিন এবং উচ্চতম নেতাদের দু'চারজনকে সময়-বিশেষে তাঁদের কর্মসূচীর পরিবর্তন সাধন করতে দেখা গিয়েছে, তাঁরা স্বীকার করেছেন যে কাজ ভালো চলছিল না (উদাহরণ, ১৯৩৩ সালের সমষ্টিভুক্তকরণ)। তবে তখন তাঁরা দোষারোপ করেছেন তাঁদের আজ্ঞাবাহী অধস্তন কর্মচারীকে; অথচ সে হয়তো নিজের বিবেকের বিরুদ্ধেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করেছে মাত্র। তবু তারই বিরুদ্ধে তখন দুর্বার হয়ে ওঠে সুতীব্র সমালোচনার প্রবাহ। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রভু স্বহস্তে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন সমালোচনার উৎসমুখ ততক্ষণ পর্যন্ত তা থাকে সম্পূর্ণ স্তব্ধীভূত। ট্রেড য়ুনিয়নের ক্ষমতা কি বেড়েছে রুশিয়ায়? ধর্মঘটে অবতীর্ণ হয় কি শ্রমিকরা, অথবা সম্মিলিত ভাবে সম্পাদন করে কোনো চুক্তি? কোনো চিহ্ন নেই

তার। বহির্জগতের সঙ্গে রুশিয়ার সংযোগ কি নিবিড়তর হয়েছে? বিদেশীদের সঙ্গে পত্রালাপ কি আরও সহজ হয়েছে? রুশিয়ায় হয় কি কোনো বৈদেশিক পত্রিকার অনায়াস প্রচলন? একেবারেই নয়। বরং তার বিপরীত, কমে গেছে এসব।

সোভিয়েটতন্ত্রের পক্ষসমর্থক রাষ্ট্রীয় বাধানিষেধের শিথিলতার একটা উদাহরণ দেখাতে পারেন: পুরোহিতসম্প্রদায়কে বিশেষ অত্যাচার ভোগ করতে হয় না; বর্তমানে চার্চকে ধর্মসমিতি স্থাপন ও সাহিত্য প্রকাশের অধিকার দান করা হয়েছে। নাস্তিক বলশেভিক শাসনব্যবস্থা আজ পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে অসংস্কৃত প্রাচীন গ্রীক চার্চের প্রতি। গণতন্ত্র? না, বরং ঠিক তার বিপরীত। এই বৎসর কয়েক আগেও শাসনরথচক্রে বাঁধা পড়ার আশঙ্কা থেকে বেঁচে গেছে রুশিয়ার চার্চ শুদ্ধমাত্র শাসন-কর্তৃপক্ষের বৈরূপ্যের বরে। আর সেই চার্চকে এখন ব্যবহার করছে ক্রেমলিন্ ঘরে বাইরে জাতীয় প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যে। ঠিক তাই করেছিলেন জার। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রপরবশ হয়ে গেছে রুশিয়ার চার্চ বা ধর্মসঙ্ঘ। দেশের শেষতম জন-প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে বসেছে সোভিয়েট শাসনযন্ত্র। শাসনযন্ত্র জীবনের 'পরে আধিপত্য বিস্তার করেছে পূর্ণ মাত্রায়।

মার্কস্ এবং লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে, দেশ থেকে যখন মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটবে এবং ক্ষমতা হবে শ্রমিকশ্রেণীর অধিগত তখন রাষ্ট্রেরও ঘটবে বিলয়। রুশিয়ায় কিন্তু রাষ্ট্র বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, দিনে দিনে তা শাখাপত্রপল্লব

বিস্তার করে ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। অধুনা বরং উদ্ভব হয়েছে এক নূতন উচ্চতর শ্রেণীর; তারাই করে থাকে রাষ্ট্র এবং উৎপাদনযন্ত্রের পরিচালনা, শোষণ করে শ্রমিক-সাধারণকে। পুঁজিপতিদের দেশে উচ্চতম ও নিম্নতম বেতনের ব্যক্তিদের মধ্যে জীবনযাত্রার যে প্রভেদ, রুশিয়াতে প্রভেদ তার চেয়ে ঢের বেশি। এক নবীন অভিজাত শ্রেণীকে পুষ্ট করে তুলেছেন স্টালিন। সেই নতুন আমলাতন্ত্রের হাতেই সব কিছু পরিচালনার ভার। জনসাধারণের শ্রমের মূল্যে আরামে থাকেন তাঁরা; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁরাও শক্তিহীন,—শক্তির মূলাধার স্টালিন, আর তার অংশভাক হচ্ছে গুপ্ত পুলিশ।

একটি আদর্শ স্বৈরতন্ত্র এই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

স্বাধীনতাকে ভালোবাসে যারা ভয় করে তারা সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রকে।

রাষ্ট্রই আদর্শ নয় তাদের কাছে। রাষ্ট্র একটা উপায় মাত্র। আদর্শের লক্ষীভূত হলো মানুষ।

অনেকের বিশ্বাস স্টালিনের মৃত্যুতে দেখা দেবে একটা পরিবর্তন, আর তাতে করে হয়তো রুশিয়ার অবস্থা হয়ে উঠবে গণতন্ত্রের অনুকূল। কিন্তু স্টালিন হলেন ডিক্টেটর, কেননা স্বৈরতন্ত্রে প্রয়োজন স্টালিনের মতো লোকেরই।

স্টালিনের সহকারী এবং সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের সবাই হচ্ছেন স্টালিনপন্থী। তা না হলে স্বৈরতন্ত্রের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হবার উপযুক্ত হতেন না কেউ। প্রত্যেক জন সম্ভাবিত

উত্তরাধিকারী এতদিনের মধ্যে বিসর্জন করে বসে আছেন গান্ধীভাবের শেষ বিন্দুটুকু। দৃঢ়মূল সোভিয়েট ব্যবস্থায় স্থান হতে পারে না গান্ধীবাদের।

জীবনযাত্রার মান উন্নততর হলে রুশিয়ার অবস্থা গণতন্ত্রের অধিকতর অনুকূল হতো না কি? জীবনযাত্রার উন্নতিশীল মান বর্তমান ব্যবস্থার একটা গুণ বলেই প্রতিভাত হতো নেতৃবর্গের চোখে এবং সেই কথাটাই শোনাতেন তাঁরা জনসাধারণকে।

ফরাসী বিপ্লব আর রুশীয় বিপ্লবের মধ্যে প্রায়ই একটা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে : "ফরাসী বিপ্লবের মূলেও ছিল আতঙ্ক অথচ পরিণামে এসেছিল দীর্ঘযুগব্যাপী স্বাধীনতা।"

কিন্তু ভ্রান্ত হতে পারে সাদৃশ্যানুমান (analogy)। ঐতিহাসিক সাদৃশ্যানুমানে (historic analogy) প্রায়ই কালস্রোতের টানে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে সে সব বিষয়ের বিবেচনা উহ্যই থেকে যায়। সাদৃশ্যাত্মক চিন্তাধারার চেয়ে ভালো নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দ্বান্দ্বিক প্রণালীর চিন্তাধারা (dialectic thinking)।

ফরাসী ও আমেরিকান বিপ্লবের ফলে উদ্ভব ঘটে মধ্যবিত্ত বণিককুলের (the bourgeoisie), নবীন যন্ত্রশিল্পী আর ব্যবসায়ী শ্রেণীর; তাদের মনস্কামনা ছিল সামন্ত প্রভুদের কবল হতে মুক্তিলাভ। এরা ছিল সব বিষয়ীর দল (propertied class), জনগণের অবশিষ্ট অংশ এবং শাসনকর্তৃপক্ষের

'পরে নিজেদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল তাদের। তারাই ছিল গবর্ণমেণ্ট।

কিন্তু বর্তমান যুগ হলো নাৎসী জার্মানী আর সোভিয়েট রুশিয়ার মতো অসম্ভব রকমের এককেন্দ্রিক, বিশ্বগ্রাসী, এমন সব মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রের যুগ যে সে সব রাষ্ট্র অনায়াসে বহু শ্রেণীকে ফেলতে পারে ধ্বংস করে, আর তারপরও যে সব শ্রেণী থাকে অবশিষ্ট তাদেরও 'পরে অবলীলায় করতে পারে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন।

ফরাসী বিপ্লবের ধ্বনিমন্ত্র ছিল: "স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব।"

রুশিয়ার অপ্রতিহত প্রতাপকেই সেখানকার নেতারা আখ্যা দিয়ে থাকেন 'স্বাধীনতা।' স্বাধীনতার সম্ভাবনা সেখানে তাই বড়ই ক্ষীণ। 'বুর্জোয়াদের কুসংস্কার' বলে সাম্যকে ব্যঙ্গ করে থাকেন ক্রেমলিনের মুখপাত্রেরা। আর তাঁদের চোখে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন হচ্ছে রুশিয়া আর ফিনল্যাণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্ক, স্টালিন এবং অন্তরীণাবাসের লক্ষ লক্ষ বন্দীর সম্বন্ধ, কনকসূত্র-শোভিত পরিচ্ছদে বিভূষিত সেনানী আর বল্কলসদৃশ উর্দি-পরিহিত সামান্য সৈনিকের সম্বন্ধ।

১৭০০ সাল আর ১৯৪০ সালের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করে তারই 'পরে নির্ভর করে বসে থাকার আশা হলো মনকে চোখ ঠারার ব্যবস্থা। এ হেন ভ্রান্ত ধারণার মূল হলো যে-কোনো দেশকে, এমন কি রুশিয়ার মতো সুবৃহৎ ভূখণ্ডকেও, দ্বীপের মতো জগতের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন বলে চিন্তা

করার প্রবৃত্তি। ইউরোপ ও এশিয়া আজ যদি তলিয়ে যায় স্বৈরতন্ত্রের অতলে তবে রুশিয়া থেকে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের সম্ভাবনা হয়ে আসবে ক্ষীণ। বিংশ শতকের বুকের 'পরে তা হলে চিরস্থায়ী ছাপ পড়ে যাবে 'স্বৈরতন্ত্রের যুগ' বলে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট পরিধির বহির্ভূত সমগ্র জগতে গণতন্ত্র আজ যদি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসতে পারে তবে ক্রমশঃ পরিবর্তনের ফলে বহু বৎসর পরে সোভিয়েট-জগতেরও অনেকটা গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

মৃত্যু বা বিদ্রোহের পথে ঘটবে সোভিয়েটতন্ত্রের অবসান, এ আশা পোষণের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে পরিণামে অপরে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে আমাদেরই ব্যবস্থা। আমাদের কাজ হচ্ছে এখন কেবল হাত-পা কোলে করে সাক্ষিগোপাল হয়ে বসে থাকা। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রও তো সম্পূর্ণ নির্দোষ নয়। এখনও এ ব্যবস্থা সবাইকে শান্তি, নিরাপত্তা, প্রাচুর্য অথবা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ভরসা দান করতে পারে না। এই সব ব্যাপার যদি হতো অধিকতর ফলপ্রসূ তবে এর অস্তিত্বের ভিত্তিও হতো দৃঢ়তর। তখনই দেখা দিত এ সব সদ্গুণের প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা। রুশিয়ায় গণতন্ত্র স্থাপনের সম্ভাবনা নির্ভর করছে রুশিয়ার বাইরে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের 'পরে।

"আমি হলে হিটলারকে আহ্বান করতাম আমায় গুলি করে মারতে, কি অন্ধকারায় অবরুদ্ধ করে রাখতে," প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন গান্ধী। "আমার সে অহিংস প্রতিরোধে আমার ইহুদী ভ্রাতৃবর্গের যোগদানের অপেক্ষা রাখতাম না আমি, তবুও এ বিশ্বাস থাকতো আমার যে পরিণামে অবশিষ্ট সবাইকেই করতে হবে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ।...উৎপীড়নকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলে এক আন্তরিক শক্তি ও আনন্দের সন্ধান লাভ করতে পারবেন তাঁরা।"

গান্ধীর এই অভিমতকে স্বীকার করতে পারেন নি ম্যাগ্‌নেস। তিনি লেখেন, "প্রতিরোধের ক্ষীণতম আভাসের ফল হচ্ছে হত্যাকাণ্ড, নয় অন্তরীণাবাস, অথবা অন্য কোনো প্রকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।" "সচরাচর যা ঘটে থাকে তা হচ্ছে নিশীথ রাত্রে তাদের বেমালুম উবিয়ে দেওয়া," স্মরণ থেকে উদ্ধৃত করেন ম্যাগনেস। "শুধু এক তাদের ভীতিবিহ্বল পরিজন-বর্গ ছাড়া আর কারোরই বুদ্ধির গোড়ায় বিন্দুমাত্র জল ঢোকে না তাতে। জার্মানদের জীবনযাত্রায় দেখা দেয় না সামান্যতম বীচি-বিক্ষোভ। পথঘাট সব যেমনটি আছে অবিকল তেমনটিই থাকে, প্রাত্যহিক কাজকর্ম যেমন চলে আসছে ঠিক তেমনই চলতে থাকে, সাধারণ পথচারীর চোখে পড়ে না কিছুই। এর সঙ্গে পার্থক্য কষে দেখুন আমেরিকান কি ইংলিশ বন্দিশালায় সামান্য একটি দিনের প্রয়োপবেশন আর তারই ফলে উদ্ভূত গণবিক্ষোভের।"

স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্যের প্রতি

অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখান ম্যাগ্‌নেস। তাঁর আশা ছিল ব্যাপারটা গান্ধীর কাছে উল্লেখ করবার সুযোগ হবে আমার।

তারপর পুণায় ডাঃ মেহ্‌তার প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ে প্রথম যেদিন গান্ধীর সাহচর্যে কাটাই আমি, সেদিনই উঠেছিল এ প্রসঙ্গ। আহ্‌মদাবাদে হিন্দুমুসলমানে তখন যে দাঙ্গা চলছিল সে কথার উল্লেখ করে বলতে লাগলেন তিনি, "মুস্কিল কী হয়েছে জান? এক পক্ষ প্রথম সুরু করে দেয় ছোরা মারা, খুনখারাপি; অপর পক্ষও তখন চুপ করে বসে থাকে না—তারাও ঠিক তাই করতে থাকে। তার বদলে এক পক্ষ যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে পারত তবে হাঙ্গামাও যেত শেষ হয়ে। কিন্তু কিছুতেই এদের আমি অহিংস থাকার দিকে মন ফেরাতে পারছি নে। প্যালেস্টাইনেও এই একই ব্যাপার। ইহুদীদের মামলা ন্যায্য। সিড্‌নী সিলভারম্যানকে (ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিকদলের সদস্য) আমি বলেছিলাম যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের যে মামলা তা খুবই ন্যায্য। আরবদের যদি প্যালেস্টাইনের 'পরে কোনো দাবি থেকে থাকে তবে ইহুদীদের দাবি তার চেয়ে অগ্রগণ্য। যীশু তো ইহুদীই ছিলেন—ইহুদী-ধর্মের (Judaism) প্রফুল্লতম প্রসূন। শিষ্যচতুষ্টয়ের কাছ থেকে যে কথাচতুষ্টক পেয়েছি আমরা তা থেকেই এ ব্যাপারের যাথার্থ্য অনুধাবন করতে পারবে। সংস্কারমুক্ত ছিল তাঁদের মন। যীশু সম্বন্ধে সত্য কথাই বিবৃত করে গেছেন তাঁরা।

কিন্তু পল (St. Paul) নিজে ইহুদী ছিলেন না, তিনি ছিলেন গ্রীক। তাঁর ছিল বাগ্মিসুলভ মানসিক গঠন, বিতর্কপ্রবণ মন ; যীশু-চরিত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাই করে গেছেন তিনি। যীশুর ছিল অনন্যসাধারণ শক্তি, প্রেমের শক্তি। কিন্তু কন্‌স্তান্‌তিনের সময় খৃষ্টধর্ম যখন হলো রাজধর্মে পরিণত তখনই বিকৃতি দেখা দিল তাতে। তারপর এলেন তপস্বী পিটার (Peter the Hermit), বেধে গেল ধর্মযুদ্ধ (Crusade), সারাসেনদের হত্যা করবার জন্যে খৃষ্টানদের প্ররোচনা দিতে লাগলেন পিটার। মুরদের তো বাস্তবিকই ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে একেবারে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হলো। বর্বরতায় পর্যবসিত হলো খৃষ্টধর্ম। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী এ-ই ছিল তার অবস্থা।”

“আর এখন ?” প্রশ্ন করলাম আমি।

“এখন,” উত্তরে বল্লেন তিনি, “আণবিক বোমার উদ্গীরিত মেঘমালার শীর্ষদেশে আসন পেতেছে খৃষ্টধর্ম। তা’ সে যাই হোক, খৃষ্টধর্মের তুলনায় ইহুদীধর্ম (Judaism) হচ্ছে উদ্ধত ও অমার্জিত প্রকৃতির। আচার্য হার্জের (Rabbi Hertz) বক্তৃতা শুনেছি আমি লণ্ডনে। খুব বড় বক্তা ছিলেন তিনি। কিন্তু ক্রমাগত তিনি ইহুদীদের দোষত্রুটি ক্ষালনেরই প্রয়াস পেতেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং অন্যত্রও আমি ইহুদীদের ধর্মসভার চেয়ে খৃষ্টানদের গীর্জায়ই যেতাম বেশি। খৃষ্টধর্ম বরং ভালো বুঝি আমি। সে যাই হোক, বলেইছি তো, প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মামলা খুবই ন্যায়সঙ্গত।”

"আচ্ছা, ১৯৩৮ কি ১৯৩৯ সালে জেরুজালেমের হিব্রু-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঃ জুডা মাগ্‌নেসের কাছ থেকে আপনি কি কোনো চিঠি পেয়েছিলেন ? আপনি যখন হিটলারী জার্মানীর ইহুদীদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন তখন সে চিঠিখানা লেখেন তিনি।"—আমি বল্লাম।

"চিঠিখানার কথা মনে পড়ছে না আমার," সোজাসুজি জবাব দিলেন গান্ধী, "তবে আমার স্বকীয় বিবৃতির কথা মনে আছে বটে। কিন্তু আমি তো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পক্ষে ওকালতি করিনি। ওটা ভ্রান্ত পরিভাষা। বহুকাল পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার এক জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলাম আমি, সভাপতি ছিলেন জোহানেসবার্গের জনৈক বিত্তশালী ইহুদী ভদ্রলোক, নাম তাঁর হেরমান কালেনবাখ (Herman Kallenbach)। বহু বার তাঁর বাড়ীতে বাস করে এসেছি আমি, তাঁর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতাও জন্মেছিল আমার। তিনি সেই সভায় আমার পরিচয় প্রদান করেন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পাণ্ডা বলে। তারপর বক্তৃতা দিতে উঠে আমি বল্লাম, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে আস্থা নেই আমার। সত্যাগ্রহ বস্তুটি হচ্ছে অত্যন্ত সক্রিয়, নিষ্ক্রিয়তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মসমর্পণ হচ্ছে নিষ্ক্রিয় ব্যাপার, আত্মসমর্পণের ঘোর বিরোধী আমি। হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভুল করেছে জার্মানীর ইহুদীরা।"

আমি বল্লাম, "কিন্তু ম্যাগ্‌নেস সে চিঠিতে এই কথাটাই

বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ইহুদীদের ও ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।"

উদাত্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন গান্ধী, "পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদীর হত্যাসাধন করেছেন হিটলার। এত বড় অপরাধ এ যুগে অনুষ্ঠিত হয়নি আর। তবুও ইহুদীদের কর্তব্য ছিল কসাইয়ের ছুরিকার সম্মুখে নিজেদের গলা বাড়িয়ে দেওয়া। পর্বতশিখর থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত তারা। হারা-কিরিতে আস্থা রাখি আমি। এর সামরিক তাৎপর্যে অবশ্য আস্থা নেই আমার, কিন্তু পন্থাটি বীরত্বব্যঞ্জক।"

"তা হলে আপনি মনে করেন একযোগে আত্মহত্যা করাই সঙ্গত ছিল ইহুদীদের পক্ষে?"

"নিশ্চয়! তাতে অন্ততঃ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যেত। তাদের এ কাজ সচেতন করে তুলত গোটা পৃথিবীটাকে তথা জার্মানীর জনসাধারণকে হিটলারের হিংসাত্মক কাজের কুফল সম্বন্ধে; বিশেষতঃ ১৯৩৮ সালে, যুদ্ধের পূর্বে। কিন্তু যা ঘটেছে তাতে করে লক্ষে লক্ষে প্রাণ তো দিতেই হয়েছে তাদের।"

যখন আমি ম্যাগনেস্‌কে জানালাম এসব কথা তিনি বললেন, "গান্ধী হয়তো ভাবছেন ঠিকই যে, অনর্থক ষাট লক্ষ প্রাণের বলিদানের চেয়ে ইহুদীরা যদি আত্মহত্যা করত তাহলে আরও সচকিত হয়ে উঠত সমগ্র জগৎ। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে এ কেউ পারে কি না আমি বুঝতে পারছি নে। মাসাদার দুর্গে কয়েক

শ’ লোক অবশ্য আত্মহত্যা করেছিল, কিন্তু তারা ছিল একত্র বন্দী হয়ে আর বিদ্রোহী হয়েছিল তারা একটা যুদ্ধরত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ ধরণে আত্মহত্যা করতে, ষাট লক্ষ কেন, দশ লক্ষ কিংবা এক লক্ষ লোকও পারে কি? আর যদিই বা তারা তা পারত তবে ষাট লক্ষ লোকের বিলুপ্তির চেয়ে সে ঘটনা কি গভীরতর হয়ে থাকত পৃথিবীর বুকে?”

মহাত্মা গান্ধী পুরোপুরি সমগ্রিকতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করেন কি কোনোদিন; তাঁর স্বভাবসুলভ দাক্ষিণ্য ও মানবতাবোধের ফলে একটা স্বৈরতন্ত্র যে কতদূর অমানুষিক হতে পারে তা তিনি ঠিক ধারণা করে উঠতে পারেন না। ভারতে ও প্যালেস্টাইনে এবং অন্যান্য স্থলে হিংসাত্মক অথবা সুগঠিত অহিংসাত্মক কাজ আসলে হচ্ছে গিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একটি উপায়মাত্র। আমেরিকাবাসী, ইংরেজ, ফরাসী, কি সুইডিস্‌রা যখন কোনো পন্থার পরিবর্তন কামনা করে তখন তারা আইনসভার সদস্যদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, তখন তারা তার পাঠায়, জোর লিখতে থাকে, ভোটের বন্দোবস্ত করে, শোভাযাত্রা করে পথে বার হয়, করে ধর্মঘট। আর ঔপনিবেশিক এশিয়ায় যে সব দেশের লোকেদের ভোটের জোরে চল্‌তি ব্যবস্থা বদলায় না তারা করে দাঙ্গা, লুঠ, খুনজখম। বিক্ষোভকারীদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন সাধন, আর তাতে তারা অনেক সময় সফলও হয়ে থাকে বটে। প্রাচ্যের সেই অশান্তির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় লণ্ডনে, পার্লামেণ্টে, সাংবাদিক মহলে, বিভিন্ন

রাজনৈতিক দলে এবং চার্চ বা ধর্ম্মসঙ্ঘে। শাসনকর্তৃপক্ষ তখন এমন একটা ভয়ানক চাপের মধ্যে পড়ে যান যে প্রকাশ্য ভাবে তখন তাঁদের দিতে হয় প্রত্যেকটি সমালোচনার কৈফিয়ৎ এবং সময়বিশেষে পরিবর্তন করতে হয় কর্মনীতির।

এ ভাবেই গান্ধীর অহিংসা এবং তার বিশ্রী বিপরীত জিয়নিস্ট সন্ত্রাসের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে ইংলণ্ডে (এবং আমেরিকাতে) একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্ব। ভারতের বিক্ষোভপ্রদর্শন-কারীরা এবং প্যালেস্টাইনের সন্ত্রাসবাদীরা বারবার আবেদন জানিয়েছে জনমতের এই ধর্মাধিকরণে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে গণতন্ত্র যদি না-ই থাকত?

একজন ব্রিটিশ মহামন্ত্রী ১০ লক্ষ লোককে বাড়ী থেকে টেনে এনে আর রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের চর্বি দিয়ে সাবান তৈরির জন্যে তাদের চুলোয় ফেলে দেবার হুকুম দিতে পারবেন না কিছুতেই। কিন্তু হিট্‌লার পারতেন— পেরেওছিলেন।

একজন বিখ্যাত বৈদেশিক সংবাদদাতা, জেনেৎ, লিখেছেন 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায় :

"নাৎসী যুদ্ধের আগে আম্‌স্টার্‌ডামে বাস করত এক লক্ষ ইহুদী, এখন আছে মাত্র পাঁচ হাজার। এখানে ইহুদীদের পাকড়াও করা ছিল ভারী সোজা। গেস্টাপো পুলিশ এসে প্রথমে ভেঙে দিত ইহুদী-পাড়ায় যাবার খালগুলোর সব সেতু, তারপর প্লাবন সৃষ্টি তারা করত তাদের সেই আঠারো শতকের

পুরোনো আমলের কায়দায় তৈরি বাড়ীগুলোতে। বাড়ীর লোকেরা তখন পালাতে পথ পেত না সেই সব হঠাৎ-দ্বীপ-হয়ে-যাওয়া বাড়ীগুলো থেকে। যারা পালাতে চেষ্টা করত তাদের মারত গুলি করে। তারপর অবশিষ্ট সকলকে, যারা সেখানে আটকা পড়ে যেত তাদের, ডেভিডের হলদে তারার তক্‌মা পরিয়ে গোরুর গাড়ী বোঝাই করে পিতৃভূমির অন্তরীণাবাসে দিত চালান করে। হল্যাণ্ডে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ইহুদীর মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার...।”

কেমন করে এমন দেশ-জোড়া বর্বরতার প্রতিরোধ করতে পারে অত্যাচারিতেরা? শুধু উপস্থিত ক্ষেত্রের দুর্ভাগা ভুক্তভোগীদেরই নয়, সমগ্র মানবজাতিকে আজ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ অভ্যাস করতে হবে, কারণ আমরা সবাই যে ভুক্তভোগী। স্বৈরতন্ত্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ যদি না-ও থাকে আমাদের ’পরে, রয়েছে তার প্রবৃত্তির স্পর্শযোগ।

স্বৈরতন্ত্রে রক্ষা পাবে না গান্ধীর গণতন্ত্রসম্মত মতামত, রক্ষা পাবেন না গান্ধী নিজেও। সোজাসুজি তাঁকে গুম করে ফেলবার আদেশ দান করবেন ডিক্টেটর—মুছে দেবেন লোকের স্মৃতিপট থেকে। কেউ জানতে পাবে না তাঁর কথা। তাঁর প্রতি আনুগত্যের বশে পাঁচ লক্ষ লোকও যদি অগ্রাহ্য করতে যায় স্বৈরতন্ত্রকে, তাদেরও দেওয়া হবে নিশ্চিহ্ন করে। যদি ত্রিশ লক্ষ লোক অগ্রাহ্য করে স্বৈরতন্ত্রকে, তাদেরও থাকবে না কোনো চিহ্ন। যদি দুই কোটি ভারতীয় স্বৈরতন্ত্রকে অগ্রাহ্য

করে? দুই কোটি গান্ধীপন্থী ধর্মযোদ্ধা থাকতে কোনো দেশে আদৌ হতে পারে না স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যে সব জাতি খাঁটি থাকতে পারবে গান্ধীবাদের মূলতত্ত্বে, শুধু তারাই এড়িয়ে যেতে পারবে স্বৈরতন্ত্রের উৎপীড়ন। হিটলারবাদ কি স্টালিন-বাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকতে পারে না গান্ধীবাদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ডুসেল্‌ডর্ফে রবিবারের প্রভাত

আমাদের যুগের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যে-সব দেশ বা জাতি একবার এসে ধরা দিয়েছে সামগ্রিকতন্ত্রের মোহ-পাশে এবং হয়েছে তার পদানত, মুক্তিলাভের পরও কি তারা করবে না তার প্রতিরোধ? ফের তার কাছে কি আত্মসমর্পণ করবে তারা? ডিক্টেটর-প্রীতির ব্যাধির কবল থেকে কি চিরতরে মুক্তিলাভ করেছে জার্মান, ইতালিয়ান আর জাপানীরা? অথবা যে সব প্রবৃত্তি, বিশ্বাস ও অবস্থার বশে একদিন ভালোবেসে-ছিল তারা স্বৈরতন্ত্রকে, তার কাছে করেছিল আত্মদান, সে সব কি আবার একদিন তাদের প্ররোচিত করবে নতুন কোনো এক স্বৈরতন্ত্রের কাছে আত্মনিবেদন করতে?

জার্মানীর ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে ডুসেল্‌ডর্ফ (Dusseldorf) নগরীর ধ্বংসাবশিষ্ট গৃহের 'পরে 'উদ্ধত বাজের' মতো উদয় হয়েছে সূর্য। পার্ক হোটেলে আমার কামরার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ মেলে চাই আমি। দিগ্বলয়ে সারি সারি অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ—বোমার আঘাতে প্রায় সবগুলোই পরিণত হয়েছে মৃত্তিকাস্তূপে; তারই ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে ভগ্ন অসমান

গৃহপ্রাচীর আর প্রাচীরের গায়ে গায়ে চৌকাঠহীন গবাক্ষ-কোটর।

নীচের তলায় আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। শোফার হচ্ছে স্টেটিনের একজন জার্মান, কঠিন পরিশ্রমী, হতবাক—কিছু জিজ্ঞাসা না করলে কথা ফোটে না তার মুখে। কিছু খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে সঙ্গে আছে তার কয়েক টুকরো মোটা মোটা লাল রঙের রুটি। হল্যাণ্ডের রাইখ্‌স্‌উয়েহ্‌রে যুদ্ধ করে এসেছে সে, যুদ্ধ করে এসেছে ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, ক্রিমিয়ায়, আর ককেসাসে, গ্রীসে, আর জার্মানীর পশ্চিম রণাঙ্গনে। সে বলে রুশিয়া এখনও রয়েছে আদিম অবস্থায়; ইউরোপের সমকক্ষ হতে এখনও লাগবে তার পঞ্চাশ বৎসর। সব চেয়ে পছন্দ তার ডাচ্‌দের; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোক তারা। রুশরা যখন স্টটিনে এসে পৌছয় তখন তারা চেষ্টা করেছিল তার আঠারো বছরের বোনটির 'পরে বলাৎকার করতে। আত্মহত্যা করে মারা যায় মেয়েটি। তারপর তার জননীকেও করতে হয় সেই পন্থারই অনুসরণ। সহজ সাধারণ ঘটনা বিবৃত করার মতোই বল্লে সে এ সব কথা—ঠিক সেই সুরে যে সুরে একটি ইহুদী মেয়ে বলেছিল আমায় লণ্ডনে: "আমার বাপ-মা? তা' তাঁদের দু'জনকে তো অস্‌উইচে জ্বলন্ত চুলোয় ফেলে দেওয়া হয়েছে।" বহু দুর্ভোগ সইতে হয়েছে ইউরোপকে, পাথর হয়ে গেছে তার প্রাণ; চোখের জল শুকিয়ে গেছে লোকের। নগরীর ধ্বংসস্তূপে বসে শোকার্ত হওয়া সাজে না তোমার।

গাড়ী হাঁকিয়ে সেণ্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে গেলাম আমি।

বারকয়েক বোমার আঘাত খেতে হয়েছে এটিকেও। আসল অপেক্ষাগারের (waiting room) স্থায়ী ভেতরছাদটিও (ceiling) পেয়েছে বোমার আঘাত; তার তলায় কাঠ দিয়ে বাঁধানো হয়েছে নতুন এক ভেতরছাদ। অপেক্ষাগারের বামপ্রান্তে একটি বীয়ার-কোষ (a beer keller)। আমি ঢুকতে গেলে ওভারকোট আর ফেল্টের টুপি পরা একটা লোক এসে আমার পথ আটকে দাঁড়াল। আমায় কিনতে হলো একখানা টিকিট। সেখানে তখন চলছিল কম্যুনিস্ট দলের নির্বাচন-অভিযানের একটা সভা। এক-একখানা টিকিটের দাম এক-এক মার্ক। আমার কাছে ছিল শুধু পঞ্চাশ মার্কের একখানা বিল (bill)। লোকটির কাছে খুচরো পয়সা ছিল না। দামের বদলে আমি তখন তাকে দিতে চাইলাম একটা চেস্টারফীল্ড। সে বল্লে, "চমৎকার! এতে করে পাঁচ মার্ক লাভ হবে আমার।" চোরা বাজারে এক-একটা আমেরিকান সিগারেটের দাম হচ্ছে ছয় থেকে নয় মার্ক।

বীয়ার-কোষটা লম্বায় প্রায় ষাট গজ, চওড়ায় কুড়ি। অর্ধেকটা তার মেজে-প্রমাণ উঁচু, বাকি অর্ধেকটা তার নীচে। আবছা অন্ধকারে টিম্ টিম্ করে জ্বলছে চারটে বিজলী বাতি। গোল গোল টেবিলগুলো ঘিরে বসেছেন আন্দাজ তুই শ' পুরুষ আর দশজন স্ত্রীলোক। তাঁদের প্রায় সবাই মাঝবয়সী; কাউকেই চল্লিশের নীচে মনে হচ্ছিল না। টাক মাথা, পাকাচুল, রোগাপটকা, সাদা জ্যাকেট গায়ে একজন,

পরিচারক দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিতে দিতে এ টেবিল সে টেবিল করতে করতে এসে বীয়ার পরিবেষণ করে চলেছিল।

বক্তা ছিলেন একজন ডাক্তার, বেশ ছিমছাম পোষাক পরনে তাঁর। তিনি বলছিলেন, "জার্মান ডাক্তারদের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জনই গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন নাৎসী দলে।" যে ভাঁজ-করা কাগজখানাতে সব বিবরণ টুকে নিচ্ছিলাম আমি, তার পাতা উল্টে দেখলাম, আজকের এই সভার বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে 'ডুসেল্‌ডর্ফের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সভা' বলে। প্রবেশ-পথের গোড়ায়ই একজন এসে হাতে গুঁজে দিয়েছিল আমার একখানি পাতলা নির্বাচনী পুস্তিকা, তার শিরোনামা ছিল: 'ক্ষুদে নাৎসী, তারপর?' তাতে লেখা ছিল, "জার্মানীর নাৎসী দলের সদস্যসংখ্যা ছিল এক কোটি কুড়ি লক্ষ। তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষ ও কিশোরকে মানের দায়ে বাধ্য করে কিংবা চাকরী খোয়াবার ভয় দেখিয়ে জোর করে নাৎসী দলে এসে ভিড়তে বাধ্য করা হয়েছিল···এখন কি সেই এক কোটি কুড়ি লক্ষ সদস্যের সবাইকেই ফেলতে হবে সেই একই কোঠায়?" পুস্তিকাখানিতে 'ক্ষুদে নাৎসীদের' সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে কম্যুনিস্ট দলে গিয়ে যোগদান করবার জন্যে।

বলে যেতে লাগলেন ডাক্তার, "স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, মার্ক্‌স্‌বাদের শিক্ষা গ্রহণ না করলে আমাদের সর্বনাশ অনিবার্য। এই অল্প কিছুদিন আগেকার এক বক্তৃতায় আমেরিকান রাষ্ট্রনীতিক ব্যয়র্নেস (Byrnes) বলেছেন যে, ১৯১৯ সালের

পর যে দুর্ভাগ্য এসে গ্রাস করে বসেছিল জার্মানীকে, কার্ল লাইব্‌নেখ্‌ট্‌-এর (Karl Liebknecht) উপদেশ গ্রহণ করলে নিষ্কৃতি লাভ করা যেত তার দায় থেকে ; অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এ উক্তি।"

মুহূর্তকাল পরেই বলতে লাগলেন তিনি, "কম্যুনিস্টরা চায় সুপরিকল্পিত বিজ্ঞান। তারই নাম সমাজতন্ত্র (socialism)। নাৎসীদেরও ছিল বটে পরিকল্পনা, তাদেরও ছিল তা কার্যে পরিণত করার উপযোগী বিধিব্যবস্থা, যেমন—বৈমানিক বিজ্ঞানে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে। তবে সমাজতন্ত্রবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? নাৎসীদের পরিণাম হলো ধ্বংস ও পতন। পক্ষান্তরে রুশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদের দৌলতে চলেছে ইতিহাস, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও অন্যান্য যাবতীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে অপূর্ব গবেষণা। পরমাণু সম্বন্ধে এই কিছুদিন হলো একখানি আমেরিকান পুস্তক পাঠ করেছি আমি। লেখকগণ তাতে বেসামরিক প্রয়োজনে আণবিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। আমেরিকা আণবিক শক্তির আরাধনা করতে চায় শুধু সামরিক প্রয়োজনে আর কূটনীতির ক্ষেত্রে ভয় দেখিয়ে বাজিমাৎ করার মতলবে। যুক্তরাষ্ট্রে আণবিক শক্তির অর্থ হলো অধোগতি, অবস্থিতি, অবদমন। সোভিয়েটে তার অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞানের উন্নতি, মানব-কল্যাণ।"

তারপর জার্মানীর যুবশক্তি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পড়লেন তিনি। বলে যেতে লাগলেন সাবধানবাণী উচ্চারণের ভঙ্গিতে,

"গণতান্ত্রিক প্রণালীতে পুনর্গঠিত করে তুলতে হবে জার্মানীর চিকিৎসক-মণ্ডলীকে, অন্যথা পুনরায় দেখা দেবে প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধিজীবীদের এসে দাঁড়াতে হবে শ্রমজীবীদের পাশে; কেন না শ্রমজীবিশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি না ঘটলে চিকিৎসকদের উন্নতি হবে কী করে? জার্মানীর বহু বুদ্ধিজীবী নেতা,যেমন—শার্ণহোর্স্ট (Scharnhorst), ক্লস্উইজ (Clausewitz), ফিক্টে (Fichte), এবং অন্যান্য আরও অনেকে করেছিলেন ইউঙ্কের (Junker) শ্রেণীর বিরোধিতা। ১৮৪৮ সালে বহু বুদ্ধিজীবী সমর্থন করেছিলেন বিপ্লবকে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় প্রগতির পক্ষে এসে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন ৪৮ সালের আট লক্ষাধিক বিপ্লবী, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাঁইত্রিশ জন সেনানী (general)।

"সমাজতন্ত্র (socialism) চায় শান্তি। যে সমস্ত মেয়েরা এখন মেডিক্যাল স্কুলে প্রবেশ করতে গিয়ে নানা অসুবিধা ভোগ করে থাকেন, সমাজতন্ত্রের অধীনে তাঁদের কোনো অসুবিধাই ভোগ করতে হবে না।

"এবার এখানেই আমার বক্তব্য সমাধা করি। হয় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে প্রগতির পথে, নয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে আণবিক বোমার আঘাতে!"

সঘন করতালির মধ্যে দ্রুতপদে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন বক্তা। তাঁর পিছু পিছু দৌড়ে গিয়ে তাঁকে স্টেশনের অপেক্ষাগারে পাকড়াও করলাম আমি। জিজ্ঞেস করে তাঁর নামটি জেনে নিলাম: 'ডাঃ কার্ল হাজডর্ন' (Dr. Karl Hagedorn)।

আমি বল্লাম আমি আমেরিকার একজন সাংবাদিক, জার্মানদের 'পরে নাৎসীবাদের ফলাফল কী হয়েছে সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। "আপনি রাষ্ট্রসচিব ব্যয়র্নসের কথা উদ্ধার করে বলেছেন যে, ব্যয়র্নসের মতে লাইব্‌নেখ্‌টের পন্থা অনুসরণ করলে ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেতে পারত জার্মানরা," বল্লাম তাঁকে আমি, "কিন্তু ব্যয়র্নস জীবনে কখনও কার্ল লাইব্‌নেখ্‌টের নাম শুনেছেন জানতে পেলে বাস্তবিকই বিস্মিত হব আমি। আর যদিই বা তা শুনে থাকেন তিনি তবুও জার্মানদের তিনি কোনো কম্যুনিস্ট নেতার উপদেশ গ্রহণ করতে বলার কথা চিন্তায়ও স্থান দিতে পারেন না। ব্যয়র্নস হচ্ছেন একজন রক্ষণশীল।"

"হাঃ," দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন ডাক্তার, "তা হলে কে হবেন? আমি যে কাগজে পড়েছি এ কথা!"

"'এই হালে ব্যয়র্নস জার্মানীর বিষয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েছেন, স্টাটগার্টে'", মনে পড়াতে বল্লাম আমি, "কিন্তু তাতে পাবেন না এ কথার কোনো উল্লেখ। যে কথাটা আপনি চালিয়ে দিয়ে এলেন তাঁর নামে তেমন কিছু কখনও তিনি বলেছেন বলে স্মরণ হয় না আমার। দ্বিতীয়তঃ,আপনি বল্লেন আমেরিকা আণবিক শক্তির ব্যবহার করতে ইচ্ছুক নয় শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু রুশিয়া সে বিষয়ে বড়ই উৎসুক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আপনার ধারণা। আমেরিকানরা যদি শিল্পক্ষেত্রে আণবিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা না করে তবে তারা আমেরিকানই নয়। আসল

ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে এই যে, এ দিকে কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। আর রুশিয়ার কথা, সে আপনি জানলেন কী করে ? ব্যাপারটা হচ্ছে সোভিয়েটের একটি অতি গোপন তথ্য, রুশিয়াতে আণবিক শক্তি নিয়ে কী হচ্ছে না হচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না আপনি। বাইরের কেউই তা জানে না।"

ভদ্রলোক নীরব। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন আমার সামনে।

বলতে লাগলাম আমি, "বারো বছর ধরে গোয়েবল্স্-এর মিথ্যার বেসাতি নির্বিচারে সয়ে এসেছে জার্মানী। লোকে ভাবে ঢের হয়েছে, আর না। অথচ আপনি আবার অবিকল সেই গোয়েবল্স্-এর মতোই কাজ করে যাচ্ছেন !"

ভদ্রলোক তবুও নীরব। নীরবে অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলেন তিনি। আমি ফিরে চলে এলাম সেই সভাস্থলে।

পরে গিয়ে বার হয়ে পড়লাম রাস্তায়। ভগ্ন প্রাচীরগাত্রে সেঁটে দেওয়া হয়েছে যত সব রাজনৈতিক প্রাচীরপত্র। জার্মানদের নানা দল জাহির করেছে তাদের যত সব অভিমত। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক য়ুনিয়নের (C.D.U.) একখানা প্রাচীরপত্রে লেখা রয়েছে: 'খৃষ্টানরা ভোট দেবেন CDU-কে।' প্রত্যেকখানা CDU প্রাচীরপত্রের ঠিক গায়ে গায়েই আঁটা রয়েছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (S.D.P.) প্রতিযোগী লিপিকা: 'সমাজতন্ত্রীই যথার্থ খৃষ্টান। ভোট দিন SDP-কে।'

জার্মান যুবশক্তির চরিত্রবলের বিকাশ সাধনে সহায়তা করবার জন্যে জার্মানীর নারীজাতির কাছে আবেদন জানিয়েছে

সমাজতন্ত্রীরা। তারস্বরে চিৎকার করছে CDU ঃ 'আর নহে সংগ্রাম!' শুধু কম্যুনিস্টরাই দিয়ে চলেছে যত রকমের সব প্রতিশ্রুতি ঃ 'চাই আরও কয়লা ? তবে ভোট দিন কম্যুনিস্টদের।' কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কয়লা উৎপাদন ও কয়লা বণ্টনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপেই বিজয়ী বিদেশী শক্তিবর্গের করায়ত্ত,—কোনো জার্মান দলেরই, তা তারা সমাজতন্ত্রী কি কম্যুনিস্ট কি আর যাই কিছু হোক না কেন, জার্মান ভোটদাতাদের বেশি কয়লা দেবার কোনো ক্ষমতাই নেই। 'মূল্যহ্রাস চান ? ভোট দিন কম্যুনিস্টদের।' কিন্তু বস্তুমূল্য ও মজুরির হার নির্ধারিত করে রেখেছেন বিজয়ী বাহিনীদল; যখন তাঁরা এসে প্রথম জার্মানীতে প্রবেশ করেন, নাৎসীদের দ্বারা নির্ধারিত তখনকার সেই যুদ্ধকালীন হারই বজায় রেখেছেন তাঁরা। বর্তমানে এ সব ব্যাপারে কোনোরূপ হ্রাসবৃদ্ধি করারই ক্ষমতা নেই জার্মানদের।

হাতুড়ে বৈদ্যরা যেমন হাতুড়ে রাজনীতিকরাও তেম্নি দুঃখ-দুর্দশার সময় মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাসপ্রবণতার 'পরে চালিয়ে থাকে তাদের ব্যবসা। নির্বোধরা না পায় দেখতে, না পায় শুনতে, তারা পারে শুধু নির্বিচারে গলাধঃকরণ করতে। জ্যোতিষী, গণৎকার, পরিত্রাতা, খৃষ্টের ভণ্ড অবতার, অভিচারীর দল, হাতুড়ে, আর কম্যুনিস্ট এবং ফাসিস্তরাও বটে, সবাই এরা গজিয়ে ওঠে দুর্যোগ, অনিশ্চয়তা এবং দুঃখদুর্দশার আবহাওয়ার মধ্যে।

ডিক্টেটরের মারণাস্ত্র হলো আতঙ্ক। আতঙ্ক থেকে উপজাত হয় মহাভয়, আর তারই ফলে জনচিত্তে জাগে নিরাপত্তা সম্বন্ধে

অধীর আগ্রহ আর চরিত্রবলের বিনিময়ে তার মূল্যদান করবার প্রবৃত্তি। স্বৈরতন্ত্রের দেবতারা চান নরবলি, আর সব বলির সেরা বলি হলো চরিত্রবলের বিলোপ সাধন। আতঙ্কের বশে কপটাচরণে সিদ্ধ হয়ে ওঠে মানুষ, মিথ্যার বেসাতি করে সে, করে হীনতা-স্বীকার, শুধু বৈষয়িক লাভের লোভে আর প্রাণে বেঁচে থাকার আশায় মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দ্বিধা জাগে না তার চিত্তে। আতঙ্ক থেকে জন্ম নেয় যত সব পরভৃত, পদলেহী, ছিদ্রান্বেষী, নির্লজ্জ চাটুকারের দল।

সহস্র বৎসরের প্রাচীন মহাভয়ঙ্কর অখণ্ড পাষাণরূপী এক ভীমকায় দানবের মূর্তিতে নিজেকে গড়ে তোলে স্বৈরতন্ত্র। ব্যষ্টির সাধ্যের অতীত তার সঙ্গে সংগ্রাম। তবে আর বৃথা চেষ্টা কেন? সর্বময় গুপ্তচর ও অভ্রভেদী আতঙ্কের মধ্যে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। আসে তাই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, নিষ্ক্রিয়তা, আর যা-হবার-তাই-হবে এই মনোভাব। রণক্ষেত্রে স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত যে বীরপুঙ্গব, প্রাত্যহিক জীবনে সে-ই হলো গিয়ে এক ভীরু কাপুরুষ। জানে সে সফলতা লাভের বিন্দুমাত্র আশা নেই তার, বরং সামগ্রিকতন্ত্রের দুর্গপ্রাকারে আঘাত হানতে গেলে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাবে সে নিজেকে, নিজের পরিজনবর্গকে এবং বন্ধুবান্ধবকে ; বিনিময়ে কোনো ফল লাভ হবে না তার, শুধু উগ্রতর করে তুলবে সে সামগ্রিকতন্ত্রের দমনস্পৃহাকে।

ইচ্ছাশক্তিকে খর্ব করে থাকে স্বৈরতন্ত্র। চিন্তাশক্তিকে করে

তোলে জড়ীভূত ঃ চিন্তা মারাত্মক। রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসকে করে রাখে পঙ্গু; যাবতীয় জ্ঞান ও কর্তৃত্ব বিচ্ছুরিত হতে থাকে শুধু এক ঐ ডিক্টেটরের ললাটদেশ থেকে। এ হেন পরিমণ্ডলের মধ্যে ধূসর বর্ণের ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করে চলে ব্যক্তি, মিশে যেতে চেষ্টা করে সে জনতার মাঝে। উদগ্র উচ্চাশা হলো যমদূতের পরোয়ানা। জনপ্রিয় সেনানী ডেকে নিয়ে আসে নিজের বিপদ। মতভেদ ঘটলে পড়তে হয় বিপদে। লাভ আছে শুধু পোষ মানায়, সমর্থন জ্ঞাপনে, আত্মাবলেপে, আনুগত্য স্বীকারে। নিরাপত্তার ছাড়পত্র এই সব।

দেখতে দেখতে তরুণরাও আত্মসাৎ করে ফেলে এ শিক্ষা। পাঠশালায়, আর কান-ঝালাপালা-করা অবিরাম প্রচারকার্যের মারফৎ, জাতীয় জীবনের বিকাশ, বিপ্লবের জয়, আর উত্তরপুরুষদের সুখসমৃদ্ধির নামে একে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে অপরিহার্য এবং গৌরবজনক রাষ্ট্রসেবা বলে। কর্কশকণ্ঠ কঠিন পরিশ্রমী স্বদেশ-ভূমিকে মুখরিত করে তোলা হয় উচ্চপ্রশংসায়; ধ্বংসোন্মুখ, গতাসু গণতন্ত্রগুলোর সঙ্গে তুলনায় প্রতিনিয়ত করা হয় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রত্যক্ষ সংশ্রবে আসার পথ বিধিনিষেধের বেড়াজালে থাকে অবরুদ্ধপ্রায়, পাছে এই সরকারী মিথ্যাভাষণের স্ফীতকায় বেলুনটি অকস্মাৎ যায় ফেটে সেই ভয়ে।

বাইরের চাপে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের স্বৈরতন্ত্র যখন ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল, দেশের মাটি তখন সমাচ্ছন্ন হয়ে

উঠেছিল ব্যষ্টিচরিত্রের পঙ্গুতার ভগ্নস্তূপে। চরিত্রশক্তিবর্জিত যত সব বামন-অবতারের দল শুধু শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত সে ধ্বংসস্তূপের মাঝে। নতুন প্রভুরা পেলেন না কোনো বাধা। ডিক্টেটররাই ধূলিসাৎ করে দিয়ে গিয়েছিলেন প্রতিরোধের শক্তিকে। শুধু মুষ্টিমেয় উগ্র ভক্তের দল ছিল ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অবস্থায়।

হয়তো এ সব দেশ বরাবরই ছিল আজ্ঞাবহ এবং সুশৃঙ্খল, আর তারই জন্যে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিল ডিক্টেটরদের কাছে; কিন্তু দেশবাসীদের আরও আজ্ঞাবহ ও শৃঙ্খলার ভক্ত করে তুলেছিলেন তাঁরা। যে মুহূর্তেই ডিক্টেটরতন্ত্র যায় ধূলিসাৎ হয়ে তখনই ঠিক সামগ্রিকতন্ত্রের সঙ্কেতে চালিত দেশের সেই গড্ডালিকা প্রবাহকে, অন্ততঃ তার একাংশকে, অবহেলে চালনা করে নিয়ে যাওয়া যায় নতুন এক সামগ্রিকতন্ত্রের খোঁয়াড়ে। জার্মানী, ইতালী, হাঙ্গেরী, এবং আরও অনেক ইউরোপীয় দেশে বিস্তর ফাসিস্ত গিয়ে ভিঁড়েছে কম্যুনিস্ট-দলে।

সামগ্রিকতন্ত্রের বিলোপসাধনের জন্যে সর্বাগ্রে চাই চরিত্রবলের পুনর্বিকাশ এবং মানবিক মর্যাদাবোধের পুনঃসঞ্চার। এ হচ্ছে গিয়ে গান্ধীবাদ অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি, মানুষের সম্বন্ধে উচ্চতর মর্যাদাবোধ, আর সরকারী বিধানের পরিবর্তে ব্যষ্টির কর্মপ্রবণতা, এই সব বিষয়ে শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপার। নাৎসী ও ফাসিস্তদের পরিহার করে চলার যে নেতিবাচক সূত্র তারও প্রয়োজন অনেক সময় হয়ে থাকে বটে। কিন্তু

সেরূপ ক্ষেত্রে তারা গিয়ে অপর এক সামগ্রিকতন্ত্রের কণ্ঠলগ্ন হয়ে পড়তে পারে। অনেকে হয়েওছে। সে যাই হোক, নাৎসীদের পরিহার করে চলার ফল বর্তায় শুধু তাদেরই 'পরে নাৎসী বলে চেনা যাদের খুবই সহজ। কিন্তু যাদের অন্তরে নাৎসীবাদ, ফাসিস্তবাদ, অথবা বলশেভিকবাদ প্রবেশ করেছে শুধু সামান্য পরিমাণে তাদের বিষয়ে কী করা যেতে পারে? এর প্রতিকার গান্ধীবাদ। "গান্ধীবাদের দ্বারা নাৎসীবাদের বিলোপসাধন" এ চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র বলে বিবেচিত হতে পারে।

ব্যক্তিত্বের ছিন্ন সূত্ররাশিকে একত্র সেলাই করা চলে না সঙ্গীনের ডগা দিয়ে; 'চোখের বদলে চোখ' এ মনোভাব নিয়ে গণতন্ত্র স্থাপন করা অসম্ভব, কারণ তাহলে শেষ পর্যন্ত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বলতে কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না।

সামগ্রিকতন্ত্রের প্রতিরোধ অথবা গণতন্ত্র স্থাপন করতে হলে জোর দিতে হবে ব্যক্তিত্বের পুনরুন্মেষ সাধনের চেষ্টার 'পরে। স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা হচ্ছে এর সহায়। কঠোর কর্তৃত্ব তার প্রতিবন্ধক।

তীব্র শারীরিক যাতনাও উপায় সম্বন্ধে গণতান্ত্রিক শ্রদ্ধাকে লাঘব করে থাকে। জার্মানীতে আমেরিকার সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল লুকাস ডি. ক্লে (Lucas D. Clay) বলেছেন, জার্মানরা কম্যুনিস্ট দলে গিয়ে যোগ দেবে বলে তিনি মনে করেন না বটে, তবে তাদের দৈনিক খাদ্যবরাদ্দ যদি ১,৫৫০

ক্যালোরী থেকে ১,২৫০ ক্যালোরীতে নেবে আসে তবে এ বিষয়ে কোনরূপ নিশ্চয়তা দান করতে পারেন না তিনি। মনে হয় ইউরোপে বর্তমানে একজন গণতন্ত্রী আর একজন কম্যুনিস্টের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দৈনিক আধখানা পাঁউরুটির, নয় তো মাসে এক হন্দর কয়লার !

আধ্যাত্মিকতার পুনরুন্মেষ—যা ছাড়া গণতন্ত্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—ক্ষুধা, গদা, বেড়ি, অথবা সামগ্রিক রাষ্ট্র তার অনুকূল নয়।

জনচিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করে থাকে স্বৈরতন্ত্র। তবুও লক্ষ লক্ষ লোক অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাতে। বর্ষের পর বর্ষ চলে যায়, লোকেরা ভুলে যায় স্বাধীনতা কাকে বলে। কোনো দিন স্বাধীনতা ভোগ করেনি রুশিয়ার যুবশক্তি, অতএব স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাদের মতামতের কোনো মূল্যই নেই।

পূর্বতন ডিক্টেটরতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ হলো ভবিষ্যতের এক নূতন ফাসিস্ততন্ত্র অথবা কম্যুনিস্টতন্ত্রের জন্যে মালমশলা সংগ্রহের অনুকূল ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে, সামগ্রিকতন্ত্র তার বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে তীব্র বিরাগ, আর বন্ধনমুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতি, আপন মনে চলার প্রতি, পরম আগ্রহ সৃষ্টি না করে পারে না। অতএব ডিক্টেটরতন্ত্রের পতনই হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুবর্ণসুযোগ। অপরাধী আর অপকারীদের শাস্তিদান করা আর তাদের 'পরে চোখ রাখা প্রয়োজনীয় বটে। কিন্তু তার চেয়েও অশেষ গুণে প্রয়োজন পূর্বতন ক্রীতদাসদের স্বাধীন মানুষ হবার

পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রত্যেকটি সম্ভবপর পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা।

জেনারেল লুসিয়াস ডি. ক্লে'র বিশ্বাস জার্মানীতে আমেরিকার শাসনব্যবস্থা বে-সামরিক হওয়া একান্ত আবশ্যক। সামরিক শাসনব্যবস্থা তার স্বাভাবিক নিয়মের বশেই বহিঃশক্তির সঙ্গে বাধ্যবাধকতার কথা অনবরত স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকে। লোকে তখন তার প্রতি ব্যবহার করে অবিকল সেই ভাবে যে ভাবে তারা ব্যবহার করে এসেছে ডিক্টেটরতন্ত্রের সঙ্গে। গণতন্ত্রের অনুকূল নয় এরূপ মনোভাব।

গণতন্ত্রের বীজ রোপণ করা যেতে পারে শুধু গণতান্ত্রিক উপায়ে গণতান্ত্রিকদেরই চেষ্টায়। আমি হলে পূর্বতন শত্রুপক্ষ এবং গণতন্ত্রবিরোধীদের বরং পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি মনে করে ব্যবহার করতাম তাদের সঙ্গে ; তাদের অপরাধী মনে করে তদনুযায়ী কাজ করে যেতাম না। অবশ্য অপরাধী তাদের অনেকেই। কিন্তু অপরাধ করেছে তারা পীড়ার বশে। বিদ্বেষ ও শক্তির প্রয়োগ কতই তো হলো এ পৃথিবীতে। এখন একবার দয়াদাক্ষিণ্য প্রয়োগ করে দেখতে পারি আমরা, দেখতে পারি গণতন্ত্র প্রয়োগের চেষ্টা করে।

১৯৪৭ সালের ২০শে জুন জার্মানীর শাসনভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড পোকেনহ্যামের (Lord Pokenham) সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি বলেছিলেন, "জার্মানদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করে দেখেছি আমি তাদের

কাছ থেকেও পাওয়া যায় তার যথোপযুক্ত প্রতিদান।"
এরূপ ব্যবহারের ভিত্তি হলো একটি চমৎকার শিক্ষাবিধি আর খৃষ্ট এবং গান্ধীর চিন্তাধারা।

আমাদের এ পৃথিবীর সমূহ আশঙ্কা রয়েছে বটে সামগ্রিকতন্ত্রের খপ্পরে গিয়ে পড়বার, কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদের কথা হলো পূর্বতন শত্রুদের দেশে, উপনিবেশগুলোতে আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সৎসাহসের সঙ্গে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্যমের পরিবর্তে দাসত্বকেই চিরন্তন করে তোলার প্রবণতা। এতে সাফল্য অর্জন করতে হলে চাই এ উদ্যমে যাঁরা ব্রতী হবেন তাঁদের সকলের মনেপ্রাণে স্বাধীন হয়ে আত্মমর্যাদা ও চরিত্রবলে মহীয়ান হয়ে ওঠা।

সপ্তম অধ্যায়

হিটলার ও স্টালিন

জনমন হরণের উদ্দেশ্যে বাগাড়ম্বর করে মুসোলিনি তাঁর শাসনব্যবস্থাকে অভিহিত করতেন 'সর্বহারার রাজত্ব।' সরকারী ভাষ্যে সোভিয়েট বিধানের অভিধা হলো 'সর্বহারার স্বৈরতন্ত্র।' এর মুখপাত্রেরা পরিভাষার অদলবদল করে একে বলে থাকেন 'বলশেভিক,' 'কম্যুনিস্ট,' এবং 'সমাজতান্ত্রিক।' হিটলারী স্বৈরতন্ত্র ছিল 'জাতীয় সমাজতন্ত্র,' অথবা সংক্ষিপ্ত জার্মান পরিভাষায় 'নাৎসী।' কিন্তু কয়েকটি প্রকাশ্য বিবৃতিতেই স্টালিন বলেছেন যে, 'হিটলারপন্থীরা' (Hitlerites)—এই নামটাই ব্যবহার করতে ভালোবাসেন তিনি—জাতীয়তাবাদী ছিল না মোটেই, তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী, সমাজতান্ত্রিকও ছিল না তারা, ছিল প্রতিক্রিয়াপন্থী। যুদ্ধের মধ্যে লণ্ডনের সোভিয়েট দূতাবাস থেকে বি. বি. সি'কে (B. B. C.) 'নাৎসী' শব্দটির ব্যবহার থেকে বিরত করবার চেষ্টাও হয়েছিল, এবং ১৯৪৭ সালে সোভিয়েট কূটনীতিকরা আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক' (National Socialist) কথাটাতে ; কারণ

স্টালিন ঘোষণা করেছিলেন যে, সোভিয়েট সংস্কৃতি "আকৃতিতে হচ্ছে জাতীয়, আর প্রকৃতিতে সমাজতান্ত্রিক।" এ দাবিও স্টালিন করে থাকেন যে, "একটি দেশে সমাজতন্ত্র," অর্থাৎ জাতীয় সমাজতন্ত্র, প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।

শুধু নামেতেই পর্যবসিত নয় এ সাদৃশ্য। স্বৈরতন্ত্রে স্বৈরতন্ত্রে সাদৃশ্য রয়েছে নির্মম পদ্ধতিতে, ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে, এবং মানবজীবনের প্রতি উপেক্ষার ভাবে। শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করবার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হিটলার 'ক্রীড়াকন্দুক হবে মুণ্ডমালা।' বাস্তবিক হয়েওছিল বটে তাই। রুশিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি সমগ্র দেশের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিব্যাপ্ত করে রক্তলেখা এঁকে দিয়েছে ক্রেম্‌লিন। বিদেশের কম্যুনিস্টরাও নিজেদের মধ্যে পরম উৎসাহভরে আলোচনা করে থাকে, শাসনক্ষমতা হস্তগত হলে কাদের কাদের গুলি করে মারবে তারা ঃ এ সব আলোচনায় অবশ্যই ঘটে থাকে তাদের কোনো অন্তরতম দুষ্প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন।

যখন দোসরা নম্বরের বলশেভিক ছিলেন ট্রট্‌স্কী তখন আতঙ্ক-সৃষ্টির সমর্থনে একখানা বই লিখেছিলেন তিনি ; তাঁর সে বইয়ের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা আত্মসাৎ করেছেন স্টালিন। সংখ্যাগুরুদের স্বমতে আনয়নে অক্ষম যে সংখ্যালঘুদল তাদের একমাত্র অস্ত্রই হলো হিংসা। ভাবাদর্শের প্রতি নেই যাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ, নীতিধর্ম বলতে নেই কিছু, নেই মানুষের প্রতি মমতা, তাদেরই ধর্মের অঙ্গ হলো ঘাতকের কুঠার, আততায়ীর রিভলভার,

হত্যাকারীর ক্যাস্টর অয়েল—যদিও তারাই আবার বড় গলায় প্রচার করে বেড়ায় মানব-কল্যাণ।

প্রথমে উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটা উপায় হিসাবে সূত্রপাত হয়ে থাকে হিংসার, কিন্তু তারপর তা এসে গ্রাস করে বসে মৌলিক উদ্দেশ্যকে, হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতারক্ষার অদ্বিতীয় পাশবিক পদ্ধতি।

বলশেভিক বিপ্লবের গোড়ার দিকে গুপ্তপুলিশ ছিল সে ব্যবস্থার শত্রুদের নিপাত সাধনের একটি অস্ত্র। তারপর পুঁজিপতি, কুলাক (kulaks) এবং প্রতিবিপ্লবীরা (counter-revolutionists) যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, গুপ্ত-পুলিশ তখন ফিরে দাঁড়াল তাঁদেরই বিরুদ্ধে যাঁরা সফল করে তুলেছিলেন সে বিপ্লবকে, এবং তখনও ছিলেন তার প্রতি অনুরক্ত। সেই ঐকান্তিক অনুরক্তিই হয়ে দাঁড়াল তাঁদের অমার্জনীয় অপরাধ।

গোড়া পত্তনের সময় বলশেভিকবাদ ছিল ফাসিস্তবাদ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। প্রথম দিককার সেই পুরাতন বলশেভিকরা ছিলেন সব লেনিন, ট্রট্স্কী ও স্টালিনের মতো মনস্বী, কর্মী, অথবা বিপ্লবধর্মী; শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্গে অভিন্নাত্মা ছিলেন তাঁরা। নাৎসীদের প্রায় সকলেই ছিলেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্যান্বেষীর দল; শ্রমিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁরা গিয়ে যোগদান করেন শিল্পপতি আর জমিদার-শ্রেণীর (Junkers) সঙ্গে।

ফরাসী বিপ্লবের আর পশ্চিম ইউরোপের উদার মতাবলম্বী

দার্শনিকদের মনীষা থেকে উৎসারিত ভাবধারা আকণ্ঠ পান করে-ছিলেন বলশেভিকরা। জারতন্ত্রী স্বেচ্ছাচার ব্যভিচারী ছিল তাঁদের চোখে। চার্চ বা ধর্মসঙ্ঘও ছিল তাই, কেন না এই নিরঙ্কুশ রাজন্য-বর্গের সেবা করাই ছিল তার ব্রত। গণতন্ত্র ও মুক্তি তাই নিছক মিথ্যা আদর্শ ছিল না লেনিন আর ট্রট্স্কীর কাছে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একদিন আপনা থেকেই ঘট্বে রাষ্ট্রের বিলোপ, জনগণ লাভ করবে মুক্তি। এ হেন মনোহর স্বপ্ন কোনো ফাসিস্তই দেখেনি কোনোদিন। ফাসিস্ত স্বৈরতন্ত্রের বরং চিরন্তন হয়েই থাকবার কথা ছিল; হিটলার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "সহস্র বৎসরের" জন্যে স্থায়ী হয়ে রইবে তাঁর স্বৈরতন্ত্র।

অধিকন্তু বলশেভিকরা ছিলেন বিশ্বমানবতায় আস্থাবান (internationalists)। একদিকে বিশ্বমানবতা (internationalism) এবং অপরদিকে স্বাজাত্যবোধ (nationalism), পরজাতির 'পরে আধিপত্য স্থাপনের লিপ্সা (imperialism) এবং বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের (racism) ঘোর বিরোধিতা, এই যুগলসূত্রে গাঁথা হয়েছিল লেনিন-প্রচারিত কম্যুনিস্ম্। কম্যুনিস্মের কামনা ছিল "জগৎময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে শ্রমিকের দল," তবে কী করে প্রভেদ দেখতে পারে তা মানুষে মানুষে শুধু তাদের মধ্যে বংশ-মর্যাদা, জন্মভূমি, দেহবর্ণ, কিংবা জনকজননীর ধর্মবিশ্বাসে পার্থক্য রয়েছে বলে? এর কাছে মানুষকে বিচার করার মাপকাঠি ছিল তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আর তার সামাজিক উদ্ভব।

পক্ষান্তরে নাৎসীরা এনে উপস্থাপিত করলে প্রবংশগত

(racial) ও জাতিগত (national) শ্রেষ্ঠত্বের বাণী : "স্বর্গাদপি পিতৃভূমি," "আর্য-মহিমা," "এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক মহাপ্রভু," যাবতীয় জার্মানকে এনে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে হবে এক এবং অদ্বিতীয় জাতীয় স্বৈরতন্ত্রের পাদপীঠ তলে। সে-ই উপ্ত হলো দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের বীজ।

মুসোলিনি তাঁর কর্মজীবন স্থরু করেছিলেন সমাজতন্ত্রী রূপে, একজন উগ্রপন্থী সমাজতন্ত্রী (left-wing socialist) হিসাবে। তারপর দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি জাতীয়তাবাদে, এবং গড়ে তোলেন এক স্বৈরতন্ত্র। তারই ফলে পরিণতি লাভ করেন তিনি ফাসিস্ত রূপে।

যাবতীয় মূলধনের 'পরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, তার সঙ্গে যোগ করো গুপ্ত-পুলিশের স্বেচ্ছাচার, তার সঙ্গে যোগ করো জাতীয়তাবাদ, ফল হবে জাতীয় সমাজতন্ত্র—তা' সর্বহারাদের নাম নিয়ে যতই কেন না শপথ কাটতে থাকুন তোমার নেতারা। কতই না রকমফের আছে এই সমাজতন্ত্র জিনিষটির ! ইহুদীবৈরিতার নাম দিয়েছিলেন কার্ল মার্কস "অবোধের সমাজতন্ত্র।" জাতীয় সমাজতন্ত্র হলো স্বভাবদুর্বৃত্তদের সমাজতন্ত্র।

যত সব সেই পুরাতন পরিভাষা আজও অক্ষয় হয়ে আছে রুশিয়ায়ঃ বলশেভিস্‌ম্‌, কম্যুনিস্‌ম্‌, সোশ্যালিস্‌ম্‌। কিন্তু গণতান্ত্রিক আদর্শসমূহের পরিবর্জন, তিলে তিলে স্বৈরতন্ত্রের দৃঢ়তালাভ আর জাতীয়তাবোধের প্রবর্তন, স্টালিনকে করে তুলেছে হিটলার ও মুসোলিনির সগোত্র, সধর্মা।

দৃশ্যতঃ রুশিয়ার এ আদর্শচ্যুতি ঘটে ১৯৩৪ আর ১৯৩৫ সালে। স্টালিন জানতেন যে সোভিয়েটের অর্থনীতি তখনও সফল করে তুলতে পারেনি তার প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি, পারবেও না বেশ কিছু কালের মধ্যে। নিষ্ঠা ও বিশ্বাসকে তীব্র করে তুলতে হলে তার সঙ্গে একটা কিছু যোগ করে না দিলে নয়। পারতেন তিনি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের বনিয়াদের 'পরে গড়া অর্থনীতির সঙ্গে গণ-তন্ত্রের যোগে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করতে। অথবা যোগ করতে পারতেন তিনি জাতীয়তাবাদ। তাঁর স্বভাবধর্ম অনুসারে যুগপৎ দু'টিই নিয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন তিনি! নতুন এক গঠনতন্ত্রে (constitution) কাগজে কলমে হলো গণতন্ত্রের প্রবর্তন। সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল জাতীয়তাবাদ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা।

প্রাণ ধরে কর্তৃত্ব ত্যাগ করতে পারে না স্বৈরতন্ত্র। স্টালিনও পারলেন না ব্যক্তি-স্বাধীনতার চারপাশ থেকে নাগপাশকে শিথিল করে দিতে, পাছে বাস্তব অবস্থার প্রতি জনমনের বিরাগ আত্ম-প্রকাশ করে বসে এই আশঙ্কায়। বরং প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি সে নাগপাশকে দৃঢ়তর করে তোলবার, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন শাসনব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির দায়ে দোষী করবার মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের খুঁজে বার করবার। এঁরাই সব ছিলেন মস্কৌএর বিচারগুলোয় অভিযুক্ত ব্যক্তির দল। ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭ আর ১৯৩৮ সালের নানা বিচার আর বহিষ্কারের ফলে গঠনতন্ত্র গেল নাকচ হয়ে; কম্যুনিস্ট দল, ট্রেড

য়ুনিয়ন আর সমগ্র দেশ থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল গণতন্ত্রের শেষচিহ্নটুকু। আজ যা অবশিষ্ট আছে রুশিয়ায় তা হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র যা হলো দেশের যাবতীয় মূলধনের একমাত্র মালিক ও বিনিয়োগের কর্তা, দেশশাসনে যা সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ, যার শিক্ষা ও সাধনা হচ্ছে জাতীয়তাবোধের বিকাশ সাধন। এ এক ত্রহস্পর্শযোগ।

বহু জাতির বাসভূমি এই সোভিয়েট য়ুনিয়ন। গ্রেট রুশিয়ানরা হলো সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ। উক্রাইনিয়ানদের সংখ্যা হচ্ছে আন্দাজ চার কোটি। তারপর আছে আর্মেনিয়ান, জর্জিয়ান, কাল্‌মুক, উজবেক, তাজিক, ইহুদী, বুরিয়াৎ, ওসেৎ, কাবার্দিয়ান, শ্বেত রুশিয়ান, আজের্‌বাইজনী, জার্মান, মোল্‌দাবিয়ান্‌, তাতার, আৎজারী, আব্‌খাশ, সিরকাসিয়ান, কত কী—সব সুদ্ধ মিলে একশ কুড়ির উপরে।

জারের গবর্ণমেণ্ট ছিল কটাচুল, নীলচক্ষু গ্রেট রুশিয়ানদের গবর্ণমেণ্ট ; যারা খাঁটি রুশিয়ান নয়, তাদের তারা দেখত হীন চক্ষে। কথাবার্তায় পোষাক-পরিচ্ছদে আচার-ব্যবহারে আর ধর্মমতে তাদের সবাইকে 'রুশীয়' করে তুলতে চাইত সে গবর্ণমেণ্ট। ১৯১৭ সাল অবধি রুশিয়া ছিল সংখ্যালঘু জাতিদের এক পিঁজরাপোল। বলশেভিক বিপ্লবের প্রয়াস হলো দেশকে স্বাধীন সমকক্ষ জাতিদের মিলনভূমিতে পরিণত করা। সোভিয়েট থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু জাতিকে নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চা করতে উৎসাহ দান করা হতে লাগল ; যে সব ভাষার কোনো লিখিত

ব্যাকরণ কিংবা বর্ণমালা ছিল না, সে সব ভাষার ব্যাকরণ আর বর্ণমালা প্রণয়নের জন্যে মস্কো থেকে প্রেরিত হলেন ভাষা-বিজ্ঞানীর দল। যে সব স্থান ছিল সংখ্যালঘুদের বাসভূমি সে সব স্থানে সেই সব সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকেই কর্মচারী নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হলো পৃথক পৃথক গণতন্ত্র অথবা উপগণতন্ত্র। সে ছিল প্রাদেশিক বা স্থানীয় স্বয়ংতন্ত্রেরই সামিল।

বিপ্লবের পূর্বে, এবং তার পরেও, কম্যুনিস্টদের অনেকে এ পন্থার প্রতিকূলাচরণ করে এসেছেন। একে তাঁরা অভিহিত করেছেন জাতীয়তাবৃত্তির অনুশীলন বলে। তাঁদের মতে এতে করে পরিস্ফুট হয়ে থাকে প্রবংশগত (racial) পার্থক্য, আর প্রতিরুদ্ধ হয়ে যায় সেই নব-মানবের আবির্ভাব যে হবে বিপ্লবের সমুদ্রমন্থন থেকে সঞ্জাত, যে রুশিয়ানও নয় আর্মেনিয়ানও নয়, শুধু শ্রেণী-সচেতন অনন্যমনা সোভিয়েট পৌরজন, যে বিশ্বমানব (inter-nationalist)।

কিন্তু ক্রেমলিন থেকে সিদ্ধান্ত হলো, জারের আমলের সেই যে 'রুশিয়ানরাই অগ্রগণ্য' (Russians First) সে নীতিকে দিতে হবে বেমালুম উল্টে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের যে অর্ধাংশ রুশিয়ান ছিল না কোনোদিন, তাদের অন্তরে এ বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে যে, এ দেশেরই অধিবাসী তারা, এর শাসনকর্তৃত্বে রয়েছে তাদেরও হাত। স্টালিন আর ওর্দ্‌ঝোনিকিৎজের (Ordzhonikidze) মতো জর্জিয়ান ; মিকোয়ান (Mikoyan) ও কারাখানের (Karakhan) মতো আর্মেনিয়ান ; জিনোবিয়েব,

কামেনেব, লিৎবিনোব, আর কাগোনোবিচের (Kagonovich) মতো ইহুদী, এঁরা সবাই গিয়ে চড়ে বসলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রমঞ্চের শীর্ষদেশে ; আর সেখানে তাঁদের সবার সেই উপস্থিতিই হলো অ-রুশীয়দের এতদিন যে ভেদজ্ঞান করে আসা হচ্ছিল তার বিলোপসাধনের বাস্তব প্রমাণ। যে ইহুদীরা এককালে ছিল দলবদ্ধ ভাবে অমানুষিক হত্যালীলার এবং অন্যান্য বহুবিধ ইহুদীদলন-ব্যবস্থার পাত্র, অন্যান্য সকল শ্রেণীর মতো তারাও এসে পড়ল রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের আওতায়।

বলশেভিকদের সকলেই, এমন কি সোভিয়েট-বিরোধী বৈদেশিক দর্শকদেরও প্রায় সকলে, বলতে লাগলেন যে, জাতীয় জীবনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে কম্যুনিস্ট বিপ্লব। প্রবংশগত ভেদাভেদের অভাব সর্বত্র অভিনন্দিত হতে লাগল সোভিয়েট-ব্যবস্থার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে।

তারপর রুশিয়ার আকাশ থেকে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের ধূম্রজাল —এবং প্রচারণা—অপসৃত হলে পর প্রকট হয়ে উঠল বিবিধ প্রবংশের পারস্পরিক প্রেমে গড়া সোভিয়েট-সৌধে বড় বড় ফাটলের দাগ। ক্রেমলিন থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে সব কাগজপত্র এবং তথ্য প্রকাশ পেয়ে গেছে তা' থেকেই দেখা যায় যে, যুদ্ধ-কালের মধ্যে স্টালিন তাঁর ১৯৩৬ সালের স্টালিন-গঠনতন্ত্র উপেক্ষা করে স্টালিনগ্রাদ ও আস্ত্রাখানের মধ্যবর্তী ভল্‌গা-তীরের কাল্‌মুকদের, ক্রিমিয়া অঞ্চলের তাতারদের, এবং উত্তর-ককেসাস

অঞ্চলের চেচেন (Chechen) ও ইঙ্গুসিদের (Ingushi) স্বয়ংক্রিয় গণতন্ত্রসমূহের অবদমন সাধন. করেছেন। এরা সবাই হলো মুসলমান। নাৎসী সৈন্যদল এসে আক্রমণ করেছিল এদের দেশ; আপাতদৃষ্টিতে এরা সব হয়ে উঠেছিল সোভিয়েট-বিরাগী এবং সহযোগিতা করেছিল হিটলারের সঙ্গে। এ কথাও জানা গেছে যে তাদের অনেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিল জার্মানীর পক্ষে; তাদের কেউ কেউ বন্দীও হয়েছিল আমেরিকান সৈন্যদের হাতে। জার্মানীর আমেরিকান ও ব্রিটিশ পরিমণ্ডলে এখনও রয়েছে বহু সহস্র কাল্‌মুক ও অন্যান্য স্বপক্ষত্যাগীর দল। পরিশেষে তাদের নিয়ে গিয়ে হয়তো বসাতে হবে নিকট-প্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে।

সোভিয়েট রুশিয়ার এই প্রবংশগত সংঘর্ষের মূল কোথায় তার আঁচ করতে পারা যায় 'সোভিয়েট য়ুনিয়নের কম্যুনিস্ট দলের মতবাদ ও রাজনৈতিক পন্থা সংক্রান্ত' সরকারী পত্রিকা 'বলশেভিক' থেকে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় তাতে বেরিয়েছিল কম্যুনিস্ট দলের রাজনৈতিক শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার জে. আলেকজান্দ্রোবের একটি প্রবন্ধ। আলেকজান্দ্রোব তাতে এই বলে খেদ করেছেন যে:

আমাদের ঐতিহাসিকরা সোভিয়েট য়ুনিয়নের অন্তর্ভূক্ত বিবিধ জাতির আভ্যন্তরীণ ইতিহাস যথোপযুক্ত ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে অভ্যস্ত নন। ফলে জাতিবিশেষের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রামের ব্যাপারটিকে অযথা এড়িয়ে যাওয়াই হয়ে থাকে, এবং কয়েকজন বিশিষ্ট সামন্ত নেতা (feudal leaders)

ও রাজন্যবর্গ (princes) জাতীয় বীর রূপে মর্যাদা লাভ করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাজান (Kazan) প্রদেশে 'এয়াদেগায়' (Eadegay) নামক মহাকাব্য প্রকাশের কথায় উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে তাতার পত্রিকা 'সোভিয়েট এদেবিয়াতি'তে (Soviet Edebiati) তাতার লেখক এন. ইসানবেৎ (N. Isanbet) প্রণীত 'এয়াদেগায়'-এর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রকাশিত হয়। 'এয়াদেগায়'-এর নায়ক তাতার জাতির একজন মহাবীর বলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আরম্ভ করেন।

এয়াদেগায় ছিলেন গোল্ডেন হোর্ডের (Golden Horde) একজন প্রধান সামন্ত, খ্যাতনামা সেনানী ও নেতা, তখ্‌তামিশ ও তৈমুরলঙ্গের অনুবর্তী, এবং অবশেষে হয়েছিলেন গোল্ডেন হোর্ডের আমীর। তাঁর আক্রমণে বিস্তর রুশিয়ান গ্রাম ও নগরী গিয়েছিল বিধ্বস্ত হয়ে। এ-ও জানতে পারা যায় যে, ১৪০৮ সালে এয়াদেগায়ের নেতৃত্বে তাতার ও মোঙ্গোলদের একটি সম্মিলিত বাহিনী মস্কো শহর আক্রমণ করে দলবদ্ধ ভাবে অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল, সে আক্রমণে নিঝ্‌নি-নোব্‌গোরোদ, পেরেয়াশ্লাব্‌ল্, রোস্তোব, সেৎপুখোব, এবং মস্কৌ-এর সন্নিকটবর্তী বিস্তর নগর-নগরী অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করে ফেলা হয়; তারপর মস্কৌ-এর উপর কর ধার্য করে প্রত্যাবর্তনের পথে রায়াজান শহর লুণ্ঠন করেন তিনি, এবং সহস্র সহস্র রুশিয়ানকে ক্রীতদাসরূপে দেন চালান করে।

ভাষান্তরে, এয়াদেগায়ের কার্যকলাপ ছিল মস্কৌ অঞ্চলের গ্রেট রুশিয়ানদের আক্রমণকারী পঞ্চদশ শতকের একজন তাতার খাঁয়েরই কার্যকলাপের অনুরূপ। কোনো দেশেরই শান্তিপ্রিয় নাগরিক বা প্রজাদের আদর্শস্থানীয় বলে কোনো মতেই গ্রহণ করা যেতে পারে না তাঁকে। তা' বলে ত্রয়োদশ শতকের রুশিয়ান নাইট আলেকজান্দার নেব্‌স্কাইকেও (Alexander Nevsky) আদর্শস্থানীয় বিবেচনা করা চলে না, চলে না 'দুরন্ত ইবানকে,' কি 'মহামতি পিটারকে' কিংবা 'মহীয়সী কাথেরিনকে,' অথবা

জেনারেল স্ত্বারোবকে ; গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়ে এঁরা সবাই করে ফিরেছেন যুদ্ধবিগ্রহ আর ইউরোপময় বিপ্লব দমন। তবু ১৯৩৬ সাল থেকে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপ ঘেঁটে এই সব অত্যাচারী লুণ্ঠনকারীদেরই, প্রথম দিককার বলশেভিকরা উচিতমতোই যাদের দিয়েছিল সেই আবর্জনাস্তূপে বিসর্জন, তাদের একে একে বেছে নিলে ক্রেম্‌লিন, তারপর সযত্নে ঝাড়ফুঁক করে আর পুরু করে সোভিয়েটী রঙ মাখিয়ে সোভিয়েট য়ুনিয়নের এক-একজন বীরপুঙ্গব বলে উপস্থাপিত করলে তাঁদের জনগণের সম্মুখে।

"তবে আমরাই বা কেন এই ১৯৪০ সালে আমাদের জাতীয় বীরপুরুষদের বেলায় তা করতে পাব না ?"—জিজ্ঞেস করলে তাতাররা।

"না, সে হতে পারে না।"—জবাব দিলে মস্কৌ, "এয়াদেগায় পরাস্ত করেছিল রুশদের।"

'এয়াদেগায়'-এর 'পরে জারি হলো নিষেধাজ্ঞা।

এইভাবে রুশীয় জাত্যভিমান থেকে জন্ম নিল তাতারীয় জাত্যভিমান, আর রুশদের মধ্যে দেখা দিল তাতারদের পরজাতি বলে ভেদজ্ঞান করার প্রবৃত্তি।

এর চেয়েও এক শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল উক্রাইনে (Ukraine)। উক্রাইনের কম্যুনিস্ট অ-কম্যুনিস্ট সবারই মধ্যে চিরকাল রয়েছে এক স্বাজাত্যবোধ, এমন কি স্বাতন্ত্র্যের বাসনা পর্যন্ত। ১৯২০ আর ১৯৩০ সালের দিকে, যারা ছিল সোভিয়েট

য়ুনিয়ন থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার পক্ষপাতী তাদের বিরুদ্ধে বারকয়েক ক্রেম্‌লিন থেকে ঘোষণা করা হয় 'বহিষ্কার' ও শাস্তির আদেশ। মস্কৌ থেকে রুশীয় জাতীয়তার প্রসার সাধনের ফলে তীব্রতর হয়ে ওঠে উক্রাইনবাসীদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ। নাৎসীরা যখন এসে অধিকার করে বসলে উক্রাইন তখন উক্রাইনবাসীদের মধ্যে মস্কৌর কর্তৃত্বমুক্ত স্বাধীন উক্রাইন স্থাপনের আশাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেষ্টার ক্রুটি করেনি তারা।

উক্রাইনবাসীদের মন পাবার জন্যে সাড়ম্বরে প্রচার করেছে মস্কৌ যে, উক্রাইনীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া আর রুমানিয়ার সমগ্র অংশ উক্রাইনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে "উক্রাইনীয়দের সহস্র বৎসরের এক স্বপ্নকে" তা আজ তুলেছে সার্থক করে। ইউরোপের সমগ্র উক্রাইনীয়-অধ্যুষিত অঞ্চলকে সোভিয়েট-পতাকাতলে আনয়ন করেছেন স্টালিন; তবে সোভিয়েট য়ুনিয়ন থেকে স্বতন্ত্র হতে চায় কেন উক্রাইনবাসীরা?

উক্রাইন আর মস্কৌর মধ্যে যোগসূত্র দৃঢ়তর করে তোলবার অভিপ্রায়ে, বৎসর কয়েক হলো, বোগ্‌দান খমেল্‌নিৎস্কাই (Bogdan Khmelnitski) নামে জনৈক উক্রাইনীয় সেনানী ও জাতীয় বীরপুরুষকে আকাশে ঠেলে তুলতে আরম্ভ করেছে সোভিয়েট শাসনযন্ত্র। যুদ্ধকালের মধ্যে বোগ্‌দান খমেল্‌নিৎস্কাইয়ের নামে প্রবর্তন করা হয় এক সামরিক সম্মানচিহ্ন, আর পেরেয়াশ্লাব (Pereyaslav) শহরটির নতুন নামকরণ হয় পেরেয়াশ্লাব-খমেল্‌নিৎস্কাই।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ১৬৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে খমেল্‌নিৎস্কাই করেছিলেন উক্রাইনের সঙ্গে রুশিয়ার যোগসাধন; আর সেই ব্যাপারটাকেই আজ বড় করে দেখাতে চায় মস্কৌ। কিন্তু জারের আমলে বাস করে এসেছে এমন কোনো ইহুদীর সামনে গিয়ে একবার শুধু উচ্চারণ করে দেখো 'খমেল্‌নিৎস্কাই' নামটি : তৎক্ষণাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়বে 'উৎসাদন' (pogroms)। বোগ্‌দান খমেল্‌নিৎস্কাই নাম রেখে গেছেন ইহুদী-উৎসাদনের জন্যে।

উক্রাইনীয় স্বাজাত্যবোধ এমনই প্রবল হয়ে উঠেছে আজ যে তাকে আর দাবিয়ে রাখা চলে না; এ স্বাজাত্যবোধের একটি চিরন্তন লক্ষণ হলো ইহুদীবৈরিতা (antisemitism)।

অধিকন্তু, ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর এই প্রথম সরকারী ব্যাপারে ইহুদীবৈরিতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; এর উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে সোভিয়েট পররাষ্ট্র-দপ্তরের কাজ থেকে ইহুদীদের দ্রুত অপসারণ আর কোনো কোনো বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, বিশেষতঃ মস্কৌয়ের কূটনীতিকদের পাঠশালায়, ইহুদীদের সংখ্যাহ্রাস করার ব্যাপারটিকে। মস্কৌয়ের সোভিয়েট পররাষ্ট্র-দপ্তরে কাজ করত শত শত ইহুদী। এখন সেখানে তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় মাত্র। সরকারের অন্যান্য বিভাগেও দেখতে পাই সেই একই অবস্থা। বিশ্বস্তসূত্রে এ সংবাদও অবগত হওয়া যায় যে, কম্যুনিস্ট দলের ইহুদী সদস্যদের বৃহত্তম অংশই এখন দল ছেড়ে চলে গেছেন।

এ সব পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তখনই যখন ক্রেম্লিন থেকে গ্রেট রুশিয়ানদের মধ্যে প্রবর্তন করা হয় স্বাজাত্যবোধ, যখন ১৯৪৫ সালের ২৪শে মে'র এক ভোজসভায় স্টালিন এ কথা ঘোষণা করতে পারলেন যে, রুশিয়ানরাই হচ্ছে "সোভিয়েট য়ুনিয়নে পুরোবর্তী জাতি।" এ হচ্ছে সেই পুরাতন 'রুশরাই অগ্রগণ্য' এই নীতি, প্রবংশবিশেষের শ্রেষ্ঠত্বের নীতি; এর অনুসিদ্ধান্ত হলো অপরাপর প্রবংশদের হীনচক্ষে দেখা।

প্যান-শ্লাব, প্যান-জার্মান, প্যান-নিপ্পন, এ সব মতবাদই হলো পরস্পরের দোসর। এসবের মধ্যে নিহিত রয়েছে স্বদেশে ভেদবিভেদের আর বিদেশে রাজ্যবিস্তারের বাসনা।

রুশিয়ায় এই যে জাতিতে জাতিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এ হচ্ছে হাল আমলের ঘটনা, বিদেশীদের অনেকের চোখেই এখনও তা ধরা পড়েনি। তবুও যুদ্ধকালে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের মধ্যে, বিশেষ করে মুসলমান আর উক্রাইনবাসীদের কয়েকটি শ্রেণীর ভিতরে, গ্রেট রুশিয়ানদের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছিল প্রতিক্রিয়া।

১৯৩৫ সালের পর থেকে জর্জিয়ার সন্তান স্টালিন রুশীয় জাতীয়তার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে যে সযত্ন প্রয়াস করে আসছেন তারই ফলে রুশ ও শ্লাব জাতির বহির্ভূত শতাধিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে মস্কৌয়ের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চিরকাল যে অসন্তোষের খোরাক জুগিয়ে এসেছে তা হয়ে উঠেছে আরও দুঃর্বিসহ। সাংস্কৃতিক ব্যাপারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো উপভোগ করত

অপরিসীম আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রেম্‌লিনের কেন্দ্রীভূত বজ্রমুষ্টির তলে তাদের কাগজ-কলমের সে আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাটুকুও গেছে নাকচ হয়ে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের চেয়ে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সমগ্র দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ভার প্রত্যক্ষ ভাবে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের তথাকথিত স্বয়ংক্রিয় গণপ্রতিষ্ঠানগুলো শুধু পালন করে চলে মস্কোর নির্দেশ। এ ব্যবস্থার অবশ্য কয়েকটি সুবিধা রয়েছে ; এতে করে জাতীয় পরিকল্পনা এবং কর্মপ্রচেষ্টার একত্র সমাবেশ ঘটে থাকে। কিন্তু এর ফলে স্থানীয় কর্মপ্রয়াস এবং স্বাধীনতার ঘটে অপমৃত্যু। এক সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা নিতান্তই এক পুতুলখেলায় পর্যবসিত করে তুলেছে সোভিয়েট যুক্ততন্ত্রকে (federalism)।

ভবিষ্যতের ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রে অথবা যুক্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষে কিংবা ঐক্যবদ্ধ এশিয়ায় একদিন একদিকে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র এবং আর-একদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্র, প্রদেশ ও জাতীয় সংস্থার মধ্যে একটা রফা করার প্রয়োজন অবশ্যই হবে। কিন্তু হিটলারী অথবা স্টালিনী যে ধরণেরই হোক না কেন, কোনো স্বৈরতন্ত্রেই থাকতে পারে না এ রকম কোনো রফার অবকাশ। প্রত্যন্তভাগের প্রাণ-শক্তি হরণ করে কেন্দ্রকেই যাবতীয় শক্তির একমাত্র মূলাধাররূপে গড়ে তোলে স্বৈরতন্ত্র।

স্বৈরতন্ত্র ও জাতীয়তার সংমিশ্রণে সোভিয়েটের আভ্যন্তরীণ-

ও-পররাষ্ট্রনীতি থেকে লোপ পেয়ে গেছে প্রথমদিককার সেই বিশ্বমানবতার (internationalism) আদর্শ। যুক্তজাতিসঙ্ঘে এবং অন্যান্য বৈঠকেও সোভিয়েটের প্রতিনিধিরা এখন জোর দিয়ে থাকেন 'জাতীয় সার্বভৌমত্বের' (national sovereignty) 'পরে। আণবিক বোমার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে কর্মসূচীর প্রস্তাব উত্থাপন করেছে আমেরিকা, তাতে তাঁদের আপত্তির মূলও এইখানে, এইখানেই আপত্তি তাঁদের ইউরোপের অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে যাবতীয় জাতির পারস্পরিক সহ-যোগিতায়। আর এরই জন্যে যুক্তজাতির সনদ থেকে 'ভেটো' (veto) করার অধিকার তুলে দিতে এত আপত্তি মস্কো-এর ; 'ভেটো' হচ্ছে জাতীয় সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রকাশ। আর তাই সমগ্র জগতে এক ঐক্যবদ্ধ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তনে এ হেন আপত্তি সোভিয়েটের ; তাদের সাংবাদিক মহলে এ প্রস্তাবকে অভিহিত করা হয় 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে।

জাতীয়তাবাদ প্রবল করে তোলে স্বৈরতন্ত্রকে, স্বৈরতন্ত্র উগ্রতর করে তোলে জাতীয়তাবাদকে।

তবে জাতীয়তাবাদ, সাধারণতঃ এর চেয়ে কম পীড়াদায়ক ও কম বিস্ফোরক পদার্থ হলেও, রয়েছে সব কয়টি গণতন্ত্রেই। এটা তাদের দুর্বলতারই একটা লক্ষণ বটে। সমগ্র গণতান্ত্রিক জগতেরই দুর্বলতার একটা কারণ এটা, কেন না এতে করেই সৃষ্ট হয় বিভেদ ও বিদ্বেষ।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ থেকে উদ্ভব লাভ

করে সাম্রাজ্যবাদ ও সংগ্রাম। তার ফলে সৃষ্ট হয় বর্ণভেদ ও প্রবংশগত বৈষম্য। এ সবই হলো খ্রীষ্টীয় আদর্শের পরিপন্থী, গণতন্ত্রবিরোধী এবং দুর্নীতিমূলক। জাতীয়তাবাদ হলো বর্তমান জগতের অভিশাপ। "জাতীয়তাবাদই ইউরোপের ধ্বংসের কারণ," বলেছেন অধ্যাপক আল্‌বের্ট আইনস্টাইন।

জাতীয়তাবাদ যদি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে তবে সামগ্রিক-তন্ত্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়তে পারে মানব-সভ্যতা। প্রবল হয়ে উঠছেও তা দিনকে দিন। সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার গ্লানি ও দুঃখ-দুর্দশা বিস্তর ভারতবাসীকে আজ করে তুলেছে ভারতকেন্দ্রিক, এবং তাদের স্বাধীনতালাভের সম্পূর্ণ ন্যায্য বাসনার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে এক দুর্দমনীয় স্বাজাত্যবোধ। প্যালেস্টাইনের তরুণ জিয়োনিস্ট সন্ত্রাসবাদীরা হচ্ছে গিয়ে যত সব মাতৃগর্ভশায়ী নাৎসীর দল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনেটের একজন রক্ষণশীল সদস্য, রাজনীতির ক্ষেত্রে যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন এক দুর্নীতিপরায়ণ শোষণ-ব্যবস্থার এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যা কিছু ধ্বংসোন্মুখ ও অনুদার যিনি হচ্ছেন তারই এক জীবন্ত প্রতীকস্বরূপ, তাঁর উপস্থিতিই প্রকাশ্যে ঘোষণা করে থাকে যে, একজন সম্মানিত আমেরিকান রাজকর্মচারী শুধু তাঁর জনকজননী আজ হয়তো তিন কুড়ি দশ বছর আগে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে ঠিক খাঁটি আমেরিকান নন। দক্ষিণাঞ্চলের রাজনীতিকরা প্রকাশ্যেই প্রচার করে থাকেন 'শ্বেতজাতির শ্রেষ্ঠত্ব;' ক্যাথলিক, নিগ্রো আর ইহুদীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই দল পাকিয়ে থাকেন

তাঁরা। প্রবেশ ও নির্গমের পথে বিদেশীদের কে কোন্ ধর্মাবলম্বী তা যাতে ঘোষণা করে তারা তার জন্যে জবরদস্তি রয়েছে মিশরদেশে। মুসলমানে আর হিন্দুতে করে লড়াই; হিন্দুরা অসদ্ব্যবহার করে থাকে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে: ইহুদী আর আরবদের মধ্যে চলেছে রেষারেষি; পরস্পর ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে না খৃষ্টানে আর ইহুদীতে। চেকোশ্লোভাকিয়া, মধ্য-ইউরোপে এককালে যা ছিল সব চেয়ে সুসভ্য গণতন্ত্র, কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার আওতায় এসে তা' আজ নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে হাঙ্গেরীয়ান আর জার্মানদের বিরুদ্ধে; এতে করে তারা সম্ভবত 'জাতে উঠতে' চায় (অর্থ তার যাই হোক না কেন), হয়ে উঠতে চায় পূরোপূরি শ্লাব।

এম্নি করেই মরণ ঘটে গণতন্ত্রের। এ ভাবেই জাতীয়তা-ব্যাধির বীজ দেহযন্ত্রের কোষে কোষে, পরতে পরতে, বিস্তার লাভের ফলে সুস্থসবল গণতন্ত্রকে পরিণত করে তোলে দুশ্চিকিস্য সামগ্রিকতন্ত্রে। অন্যান্য নানা কারণে ইতিপূর্বেই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যুদ্ধোত্তর কালের জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রাবল্য তাকে এসে সবলে করেছে আক্রমণ; ফল তার বড়ই বিষময়।

'মানুষমাত্রেই জন্মেছে পরস্পরের সমকক্ষ হয়ে' এ-ই হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু এ ভিত্তি সেখানেই যায় নড়ে যেখানে তার নাসিকার গঠন, জন্মভূমি, দেহবর্ণ, ধর্মের প্রকৃতি, কথা বলার ভঙ্গি, নামের 'বিদেশী' উচ্চারণ, কিংবা তার আত্মীয়স্বজনদের

সংস্কার ও কার্যকলাপের জন্যে কোনো লোক সমকক্ষ বলে স্বীকৃত হতে পারে না। শুধু তাদেরই রয়েছে অপরের 'পরে অত্যাচার করার অধিকার যারা পারে নিজেদের জনকজননীকে বেছে নিতে।

নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিজের জীবনকে যাঁরা মূল্যবান জ্ঞান করে থাকেন, ফাসিস্তনীতি ও কম্যুনিস্টনীতির সঙ্গে সংগ্রামে তাঁদের সবাইকে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে হবে জাতীয়তাবাদ, বর্ণাভিমান, এবং শ্রেণী ও জাতি সম্বন্ধীয় হীন অহমিকার প্রত্যেকটি প্রকাশের বিরুদ্ধে। বিশ্বময় রয়েছে শুধু একটিমাত্র আভিজাত্যের ক্ষেত্র; জনহিতকারী, নির্মলচরিত্র, নৈতিকবুদ্ধিসম্পন্ন যে-কোনো লোকেরই রয়েছে তার মধ্যে এসে প্রবেশ করবার অবাধ অধিকার। রাজনীতিক ও কূটনীতিকদের জন্যেও মোটেই স্থানাভাব নেই সেখানে। কিন্তু ক'জন চায় এর সদস্যদলভুক্ত হতে ?

অষ্টম অধ্যায়

কঃ পন্থা ?

পূর্বতন সহ-রাষ্ট্রপাল (Vice-President) হেনরী এ. ওয়ালেস (Henry A. Wallace) বলেছেন, "ফাসিস্‌ম্‌ আর কম্যুনিস্‌ম্‌-এর মধ্যে ধরতে হলে কম্যুনিস্‌ম্‌ই বেশি পছন্দ আমার।" স্বাধীনতার পক্ষে তুই-ই কিন্তু সমান মারাত্মক। পৃথিবীকে আজ যদি বাস্তবিকই বেছে নিতে হতো শুধু ফাসিস্‌ম্‌ আর কম্যুনিস্‌ম্‌-এর মধ্যে যে কোনো একটিকে তবে গণতন্ত্রের দশম দশা ঠেকাতে পারতেন না কেউ।

এই নির্বাচনের ব্যাপারটিকে নাৎসীবাদ ও বলশেভিকবাদ এই তু'টির মধ্যে আরও সঙ্কীর্ণ করে এনেছিলেন হিটলার এবং গোয়েবল্‌স্‌; তাঁদের চোখে নাৎসীবিরোধী মাত্রেই ছিল কম্যুনিস্ট। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাওয়ার অপরাধে রাষ্ট্রপাল বেনেসকে (President Benes) 'বলশেভিক' অপবাদ দিয়েছিলেন হিটলার।

ফ্রাঙ্কো বলেছিলেন, "স্পেনে হয়েছে ফাসিস্‌ম্‌ আর কম্যুনিস্‌ম্‌ এ তু'টির মধ্যে একটির নির্বাচন।" ১৯৩৬-৩৯ সালের স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সময় ফাসিস্‌ম্‌-এর সমর্থনে বিস্তর প্রতিক্রিয়াপন্থী এ যুক্তিরই অবতারণা করেছিল।

প্রতিক্রিয়াত্মক কার্যকলাপের ভয়ে কেউ কেউ গিয়ে যোগ দেয় কম্যুনিস্টদলে। কম্যুনিস্‌ম্‌-এর ভয়ে কেউ কেউ এসে ঢোকে দক্ষিণপন্থীদের মহলে। এ তু'টি মেরুপ্রান্ত হলো পরস্পরের দল ভারী করবার জায়গা। মাঝখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গণতন্ত্র।

এর এক প্রচণ্ড উদাহরণস্থল হচ্ছে গ্রীস।

বিশেষ কোনো কারণ না থাকলেও, গ্রীকরাজকে এথেন্সে ফিরে গিয়ে সিংহাসন পুনরধিকার করতে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণপন্থী রাজভক্তের দল এসে ভিঁড় জমালো তাঁর চারপাশে। কম্যুনিস্টরা, সততই সর্বাগ্রে রয়েছে তারা, সততই তীব্রতম তাদের কণ্ঠস্বর, আর্তনাদ জাগিয়ে তুলে মধ্যপন্থীদের ডেকে নিয়ে এল নিজেদের রাজদ্রোহী ধ্বজদণ্ডতলে। আর যেহেতু যথার্থই ছিল প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা সেহেতু বহু লোক এসে বাস্তবিকই জুটে গেল তাদের দলে। রাজবান্ধবের দল তখন কম্যুনিস্টদের দলবৃদ্ধির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেশের অধিকতর রক্ষণশীল মধ্যপন্থীদের কাছে পেশ করলে রাজসমর্থনের আবেদন। কেউ কেউ সাড়াও দিলে সে আবেদনে। এতে করে নিজেদের দলবৃদ্ধি করার স্বপক্ষে নতুন একটি যুক্তি খুঁজে পেল কম্যুনিস্টরা, আর সে যুক্তির প্রয়োগও করলে তারা সুচারুরূপে। কম্যুনিস্টদের এই সাফল্য ফের ক্ষেপিয়ে তুললো রাজভক্তদের, মধ্যপন্থীদের আর একটি অংশকে একেবারে উৎকট দক্ষিণপন্থিদলে টেনে নিয়ে এল তারা।

দীর্ঘকাল ধরে এ ভাবে চললে পর সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায় মধ্যপন্থীরা, থাকে শুধু দু'টি চরমপন্থীর দল। তাদের মধ্যে তখন থাকে না কোনো রফার অবকাশ, থাকে না কোনো মিলনসেতু। পরস্পর লড়াই করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তাদের।

ফ্রান্স, ইতালী, চীন, এবং অন্যান্য বহু দেশে, এমন কি খুব সামান্য পরিমাণে হলেও, যুক্তরাষ্ট্রেও সমাজের মধ্যে রয়েছে এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ দু'টি মেরুপ্রান্তে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বার আশঙ্কা। গণতান্ত্রিক জগতে শান্তিরক্ষার পক্ষে সব চেয়ে মারাত্মক রাজনৈতিক বিপত্তি এটা। বিভিন্ন দেশ নিয়ে গঠিত এক-একটা পরিমণ্ডলের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ মেরুক্ষেত্রের মধ্যে এক বিশ্বব্যাপী মহাগৃহযুদ্ধ বেধে যাবার রয়েছে আশঙ্কা, হয়তো সে-ই হবে তৃতীয় কুরুক্ষেত্র।

যুদ্ধনিবারণ এবং গণতন্ত্রের মুক্তিসাধন নির্ভর করছে এই মধ্যপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধির 'পরে, আর প্রতিক্রিয়াশীল এবং কম্যুনিস্ট এই দু'টি মেরুপ্রান্তের শক্তি অপহরণে।

উভয় প্রান্তেরই চরমপন্থীদের প্রয়াস হলো কর্মক্ষেত্র থেকে মধ্যপন্থীদের বিতাড়িত করা। আমেরিকার মতো দেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিশ্বাস এই যে, একবার যদি তারা লোকের মনে এ প্রতীতি জাগিয়ে তুলতে পারে যে, কম্যুনিস্‌ম্ হচ্ছে এমন একটা ভয়ের জিনিষ যা একমাত্র তারাই বিদূরিত করতে পারে তবে দেশশাসনের গদীতে অচল হয়ে বসতে পাবে তারা।

ফ্রান্সের মতো দেশে কম্যুনিস্টরা এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে, প্রতিক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাদের নিজেদের জয় অবধারিত। ফরাসী কম্যুনিস্টরা তাই ঘোষণা করেছে যে, লড়াই শুধু এক ঐ প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সঙ্গে, আর কারও সঙ্গে নয়, আর তাই যারাই হলো গিয়ে প্রতিক্রিয়ার বিরোধী তাদেরই কর্তব্য হচ্ছে কম্যুনিস্টদলে এসে যোগদান করা। উভয় দলেরই চরমপন্থীরা জয়লাভ করতে চায় মধ্যপন্থীদের বিলোপ সাধন আর নিজেদের এবং নিজেদের বিপরীত দলের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার জন্যে সবাইকে বাধ্য করে।

কখনো কখনো, যেমন চীনদেশে, দেখতে পাওয়া যায় কম্যুনিস্টরা নিজেদেরই জাহির করছে মধ্যপন্থী আর গণতান্ত্রিক বলে। তাদের বিদেশী বন্ধুরা সরলমতি জগদ্বাসীর কাছে তাদের পরিচয় দিয়ে থাকে 'ভূমি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার সংস্কারকামী' (agrarian reformers) নামে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যাও নয়, তা' ছাড়া চীনদেশে ভূমি সম্বন্ধীয় বিধি-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন একান্ত আবশ্যকও বটে; কিন্তু চৈনিক কম্যুনিস্টরা একদলীয় শাসনব্যবস্থারও পক্ষপাতী, আর সদা-সর্বদাই স্বেচ্ছায় সমর্থন করতে ছুটে যায় তারা মস্কোএর কর্ম-বিধিকে। চৈনিক কম্যুনিস্টদের যদি গণ্য করা হয় মধ্যপন্থী বলে, যথার্থ মধ্যপন্থীদের কোনো আশাই থাকবে না তবে আর।

হিটলারের অভ্যুদয়ের পূর্বে জার্মানীতে কম্যুনিস্টরা সাধারণতন্ত্রকে দুর্বল করে ফেলবার জন্যে প্রায়ই নাৎসীদের নানা

প্রস্তাব সমর্থন করে চলতো। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতো, যদি সাধারণতন্ত্রের পতন হয় তবে নাৎসীদের হাতে আসবে শাসনভার, তখন তারা তা চালাতে পারবে না এবং পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে কম্যুনিস্টদের। ক্ষমতার শিখরে উঠতে চায় চরমপন্থীরা শান্তিপ্রিয় মধ্যপন্থীদের মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করে।

প্রাক্-হিটলারী যুগে স্বভাবতঃই সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ছিল কম্যুনিস্ট-শরসন্ধানের লক্ষীভূত। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট-দের আস্থা রয়েছে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে স্বাধীনতার সহযোগের 'পরে; কম্যুনিস্টরা ওকালতি করে থাকে সমাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের সংযোগের পক্ষে। ডেমোক্র্যাট্ অর্থাৎ গণতন্ত্রবাদী হিসাবে জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ছিল নাৎসীবিরোধী, আর ঠিক সেই একই কারণে তারা ছিল কম্যুনিস্টবিরোধীও বটে। কম্যুনিস্টরা তাই তাদের বলতো 'সমাজতন্ত্রী ফাসিস্ত'; অন্যায় অপবাদ দিতে জুড়ি নেই কম্যুনিস্টদের। কম্যুনিস্ট দল আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এই পারস্পরিক তিক্ততাই শক্তির শিখরে উঠতে সহায়তা করলে হিটলারকে।

এই শোচনীয় শিক্ষা আর ইউরোপময় ফাসিস্‌ম্-এর বিস্তার লাভের ভয় সাধারণতন্ত্রী স্পেন, ফ্রান্স, এবং অন্যান্য দেশে সৃষ্টি করলে এক ঐক্যবদ্ধ পুরোভাগের (united front) অর্থাৎ জনগণের পুরোবর্তী একটি দলের (popular front)। উদারপন্থী, সমাজতন্ত্রী এবং কম্যুনিস্টরা এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে

দাঁড়ালো ফাসিস্তদের বিপক্ষে। এ সহযোগের মূল উদ্যোক্তা ছিল মস্কো।

এ রকমের যাবতীয় মিলনে কম্যুনিস্টরাই খাটলে সব চেয়ে বেশি, ত্যাগস্বীকারও করলে সবার বাড়া। কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যাপারে তারা চাইত সে ঐক্যবদ্ধ জনভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে, এবং প্রায়ই তারা এ বিষয়ে এমন সাফল্য অর্জন করতে সুরু করে দিলে যে, যারা কম্যুনিস্ট ছিল না শেষ অবধি 'আর কখনও নয়' বলে কৃতসঙ্কল্প হয়ে হাল ছেড়ে দিলে তারা।

যারা কম্যুনিস্ট ছিল না তারা দেখলে, কর্তৃত্বের প্রতি উদগ্র আসক্তি রয়েছে কম্যুনিস্টদের, শক্তি করায়ত্ত করতে কেনো কিছুতেই পেছ-পা নয় তারা, মিথ্যায় কুণ্ঠিত নয় এতটুকু, আর নির্বিচারে হুকুম তামিল করে চলে তারা ক্রেম্‌লিনের।

ত্রিংশৎ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে গণসংযোগের এই অভিজ্ঞতা ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে স্টালিন-হিটলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ অপঘাতে পড়ল মারা। স্টালিনই যখন এসে পড়েছেন হিটলারের নিকট-সাহচর্যে, স্টালিনের অনুবর্তীদের সঙ্গে কী করে তখন আর একত্রে কাজ করতে পারে নাৎসীবিরোধীরা? ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় কম্যুনিস্টরা যখন হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-প্রচেষ্টায় গোপনে যত রকমে পারে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে, অবশ্য যে পর্যন্ত না হিটলার এসে একেবারে রুশিয়াকেই আক্রমণ করে বসেন সে পর্য্যন্ত কী করে কম্যুনিস্টরা তখন এ বলে দাবি করতে পারে যে

তারা সব হলো গিয়ে নাৎসীবিরোধী ? দেখা গেল, কম্যুনিস্টদের 'ফাসিজ্‌ম্‌-বৈরিতা'র অর্থ হচ্ছে রুশিয়ার সঙ্গে ঐক্য—এমন কি তার ফলে যদি ফাসিস্তদের সহায়তাও করা হয় এবং গণতন্ত্র-সমূহকে করে ফেলা হয় দুর্বল তবুও।

সেই থেকে স্বৈরতান্ত্রিক কর্মকৌশল ও রণনীতি সম্বন্ধে গভীরতর বোধশক্তি অর্জন করেছে সমগ্র জগৎ। স্বৈরতান্ত্রিকরা, তা সে লাল কি বাদামি কি কালো যাই হোক না কেন তারা, হচ্ছে গিয়ে গণতন্ত্রের শত্রু। তাদের সঙ্গে রণবিরতি-চুক্তির অর্থ হলো অযথা কালক্ষেপ আর মর্যাদাহানি ; স্বৈরতন্ত্রের বৈরীদের কেউই আস্থা স্থাপন করতে পারে না স্বৈরতান্ত্রিকদের 'পরে, কাজও করতে পারে না তারা তাদের সঙ্গে মিলে মিশে। সঙ্কটক্ষেত্রে কম্যুনিস্টদের উপস্থিতিই হচ্ছে ট্রেড-য়ুনিয়ন আর শ্রমিক-শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলার পথে এক প্রবল প্রতিবন্ধক, দেশ-বিশেষে কিংবা সমগ্র জগতে উদার ফাসিস্তবিরোধী আন্দোলনের পথেও এক চরম বিপত্তি, কেন না গণতন্ত্রের বৈরীদের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখতে একান্ত নারাজ হয়ে উঠেছে আজ লক্ষ লক্ষ গণতন্ত্রী।

কোনো কোনো ভদ্রমনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি হয়তো সময়-বিশেষে একজন চমৎকার পদপ্রার্থীকে নির্বাচন করার জন্যে, কিংবা সাম্রাজ্যবাদ ও প্রবংশগত ভেদাভেদের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রয়োজনে, অথবা দরিদ্রদের জন্যে অধিকতর আবাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে, কম্যুনিস্টদের সহায়তা প্রত্যাখ্যান করতে ইতস্তত করতে

পারেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে কম্যুনিস্টরা হবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটি উপায়বিশেষ মাত্র, এবং প্রকৃত গণতন্ত্রীকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে সুসঙ্গত উপায়ই নিতে হবে বেছে। অন্যথা সে কাজ হবে অন্যায় ও অসঙ্গত।

সামগ্রিকতন্ত্রের চেলাচামুণ্ডাদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করার ফল এমনই সুদূরপ্রসারী যে, তাতে করে সামান্য যেটুকু সৎকাজ হওয়া সম্ভবপর, শেষ অবধি তাও হয়ে যায় বানচাল!

সমাজতন্ত্রী বা উদারপন্থীদের মধ্যে যাঁরা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে থাকেন, কম্যুনিস্টদের দোষ ধরতে গেলে অসঙ্গতির দায়ে দায়ী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তাঁদের। সমাজতন্ত্রী, ট্রেড য়ুনিয়নপন্থী এবং উদারনীতিকদের সহযোগিতা কামনা করে থাকে কম্যুনিস্টরা, কিন্তু এর একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো তাদের এই সব স্বাভাবিক বৈরী ও প্রতিযোগীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু যতক্ষণ অবধি না এদের কেউ, যেমন সমাজতন্ত্রীরা, সামগ্রিকতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলে কমুনিস্টদের সমালোচনা করছে, কিংবা দিচ্ছে তাদের মুখোস খুলে, ততক্ষণ অবধি জনসাধারণের বোধগম্যই হয় না গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রীতে আর কম্যুনিস্টে পার্থক্যটা বাস্তবিক কোন্‌খানে। সেরূপ অবস্থায় কম্যুনিস্টদের অধিকতর সুযোগসুবিধা, শক্তিশালী প্রচারব্যবস্থা এবং সঙ্ঘবদ্ধ নিয়মানুবর্তিতার ফলে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত সাফল্যলাভ করে যেতে থাকে তারা।

যারা কম্যুনিস্ট নয় কম্যুনিস্টরা তাদের জন্যে ব্যবস্থা করে

দিতে পারে বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর, করে দিতে পারে বেতার-স্থচী আর প্রচারকার্যের সুব্যবস্থা ; কিন্তু তার জন্যে উচ্চমূল্য দান করতে হয় তাদের। ১৯৪৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর মিঃ হেন্‌রী এ. ওয়ালেস (Henry A. Wallace) নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে তাঁর সেই সুবিখ্যাত বক্তৃতায় করেছিলেন রুশীয় নীতির যৎসামান্য সমালোচনা। সভাগৃহ ছিল কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিপূর্ণ, তারা সবাই তখন একযোগে জুড়ে দিল হিস্‌ হিস্‌ শব্দে ধিক্কারধ্বনি। ফলে বক্তৃতার অবশিষ্ট অংশে তাঁর লিখিত ভাষণ থেকে রুশিয়ার প্রতি কটাক্ষপাতসূচক মন্তব্যগুলো বেমালুম বাদ দিয়ে যেতে হয় তাঁকে। অন্যান্য যে সব বক্তারা কম্যুনিস্ট-সহযোগিতার প্রতি একান্ত আসক্ত, প্রায়ই তাঁরা গ্রীসে ব্রিটিশ ও আমেরিকান কর্মপদ্ধতি, প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশের ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি ব্যাপারের বিরুদ্ধে চালিয়ে থাকেন আক্রমণ। কিন্তু রুশিয়ানরা আর কম্যুনিস্টদল সোভিয়েটের প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে ব্যক্তি এবং গণতন্ত্রের প্রতি ক্রমাগত যে সব অমানুষিক অত্যাচার করে চলেছে তা সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করে চলেন তাঁরা। এতে করেই বোঝা যায় উপায়ের 'পরে এতখানি গুরুত্ব কেন আরোপ করে থাকেন মহাত্মা গান্ধী। এ হলো সত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার একটি অঙ্গ। উপায় সম্বন্ধে নীতিবোধ বিসর্জন দিলে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে তোমার।

যিনি কম্যুনিস্ট নন অথচ কম্যুনিস্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ

করতে প্রস্তুত, এ অবস্থার সম্মুখীন হতেই হবে তাঁকে : মনে করো কম্যুনিস্টদলের বহির্ভূত সাগ্‌রেদদের নিয়ে কম্যুনিস্টরা গড়ে তুললে কোনো-এক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট। কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে দেখাও দিয়েছে এ সম্ভাবনা। কম্যুনিস্ট মন্ত্রীরা তখন অনন্যোপায় হয়েই মশ্‌নদকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে তা' আঁকড়ে বসে থাকতে আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আক্রমণ করতে বাধ্য হবেন। তার ফলে হবে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, নয়তো স্বৈরতন্ত্রের বিরোধীর দল যদি ভারী হয়ে ওঠে তবে বেধে যাবে গৃহযুদ্ধ। নীতির দিক দিয়ে কম্যুনিস্টদের গণতান্ত্রিক সহযোগী হলেই থাকতে হবে স্বৈরতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে প্রস্তুত।

অধিকন্তু, কম্যুনিস্টরা সর্বদাই মস্কোএর কার্যকলাপ সমর্থন করে থাকে। সোভিয়েট-নাৎসী চুক্তি সমর্থন করেছিল তারা। এরূপ ক্ষেত্রে যারা কম্যুনিস্ট নয়, তাদের কর্তব্য কী? যেমন চলছে তেমনই চলবে সব, না কি মাসকয়েকের জন্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে বসে থাকবে তারা? বরুচ-পরিকল্পনায় (Baruch Plan) আণবিক বোমাকে অবৈধ ঘোষণা করবার যে প্রস্তাব হয়েছিল, বিশ্বমানবতা (internationalism) আর বিশ্বব্যাপী একরাষ্ট্র স্থাপনের পথে তা ছিল বহুদূর অগ্রগতির পরিচায়ক। কিন্তু নিজেদের জাতীয়তা সম্পর্কিত নানা কারণে মস্কৌ প্রত্যাখ্যান করলে বরুচ-পরিকল্পনাকে। সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্টরাও বল্লে তথাস্তু। আর্জেন্তিনার ডিক্টেটর পেরোঁর (Peron) সঙ্গে মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করলে সোভিয়েট সরকার। অবিলম্বে আর্জেন্তিনার

কম্যুনিস্টরা সমর্থন করতে লেগে গেল পেরোঁকে। রুশিয়ার সঙ্গে অভিন্নাত্মা হয়ে উঠলে চরমপন্থী (radicals) আর উদার-নীতিকদের পরিণতি ঘটে প্রতিক্রিয়াপন্থীতে। যারা কম্যুনিস্ট নয়, কী করে তবে হাত মেলাতে পারে তারা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ? এ কাজ করার অর্থই হচ্ছে ন্যায়নীতির চেয়ে কার্যসিদ্ধিকে ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া, ক্ষমতাকে আদর্শের উপরে তুলে ধরা। এই ছিদ্র দিয়েই প্রবেশ করে স্বৈরতন্ত্রের কলি। এইভাবে স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে স্বৈরতন্ত্রবিরোধীরাও হয়ে উঠতে থাকে স্বৈর-তান্ত্রিক।

কম্যুনিস্ট হলে তিনি যে শুধু রুশিয়ার বন্ধুই হবেন তাই নয়। নিষ্ঠা থাকবে তাঁর স্বৈরতন্ত্রের 'পরে। আস্থা থাকবে আতঙ্কসৃষ্টিতে। বিশ্বাস থাকবে সামগ্রিকতন্ত্রের কলাকৌশলে, প্রয়োগও করবেন তিনি সে কলাকৌশল। সাধু নিয়মনিষ্ঠ কম্যুনিস্টকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, তার কামনা হলো রুশিয়াই এসে শাসন করুক তার স্বদেশভূমিকে (পোলিশ, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরীয়ান আর অন্যান্য কম্যুনিস্টরা বাস্তবিকই রুশীয় শাসনের অস্ত্রস্বরূপ কাজ করে থাকে), নয়তো শাসন করুক রুশিয়ারই মতো এবং রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ অপর কোন এক সামগ্রিকতন্ত্র। এ হেন অস্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি যাদের কোনরূপ সহানুভূতি নেই তাদের সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত, যুক্তরাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় একঘরে বালখিল্য কম্যুনিস্ট দল দিনের পর দিন তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের

একান্ত পঙ্গুত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়ে থাকে। তবুও যারা কম্যুনিস্ট নয় অথচ তাদেরই সহযোগী তাদের সঙ্গে যোগসাজসে কম্যুনিস্টরা শ্রমিক ও উদারনীতিকদের নানা আন্দোলনে ভাঙন ধরাতে পারে, ধরিয়েও থাকে ; আর তারই ফলে শক্তিবৃদ্ধি করে থাকে তারা দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলদের। প্রতিক্রিয়াশীলদের শ্রেষ্ঠ আয়ুধ হচ্ছে কম্যুনিস্টরা, কম্যুনিস্টদের পক্ষেও প্রতিক্রিয়াশীলরা হলো তাই। যতই শক্তিশালী হয়ে উঠবে কম্যুনিস্ট দল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াপন্থীরাও হয়ে উঠবে তদনুপাতে শক্তিশালী, আবার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধির অনুপাতে কম্যুনিস্টদেরও হবে বলাধান।

পক্ষান্তরে, উভয় দিককার চরমপন্থীদেরই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে শক্তিশালী বামাবর্তী মধ্যপন্থীর দল। উদাহরণ-স্বরূপ, ইংলণ্ডের শাসনকর্তৃত্ব শ্রমিকদলের করায়ত্ত হবার আঠারো মাস পরেই ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যসংখ্যা, তাদের নিজেদের সভ্যসূচী অনুযায়ীই, তেতাল্লিশ হাজার থেকে নেমে এসেছে তেত্রিশ হাজারের কোঠায়। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট এক বামাবর্তী গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের ফলে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট দল হয়ে দাঁড়িয়েছে নিতান্তই নগণ্য, আর তার ফলে টোরীদল এমনই মর্মাহত হয়ে পড়েছে যে, ১৯৪৬ সালে ব্ল্যাকপুলে তাদের বাৎসরিক সমাবর্তনে সভায় উইনস্টন চার্চিল তাঁর দলের হয়ে স্বয়ং ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে গান্ধী-নেহরু-পরিচালিত কংগ্রেসী দল দীর্ঘকাল যাবৎ একনিষ্ঠ ভাবে স্বাধীনতার জন্যে কাজ করে এসেছে; বর্ধিষ্ণু সমাজতন্ত্রী দল চাইছে সামাজিক অন্যায় অবিচার উচ্ছেদ করতে। কাজে কাজেই দেশের ও দশের একমাত্র মুক্তিদাতা বলে নিজেদের জাহির করার উপায় নেই কম্যুনিস্টদের। তাদের জনপ্রিয়তাও তদনুপাতে খর্ব। এইরূপ, ১৯৪৭ সালে জাপানের নির্বাচনে, জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াপন্থী ও সংগ্রাম-কামীদের বহিষ্কারের পর, বিপুল জয়গৌরবের অধিকারী হয়েছে সমাজতন্ত্রীরা, আর কম্যুনিস্টদের ঘটেছে পরম পরাভব।

মধ্যপন্থীদের প্রতি একই রকমের আক্রোশের বশে এবং তাদের কাছ থেকে রেহাই পাবার সেই একই বাসনায় উভয় দিক-কার চরমপন্থীরা একই ভাবে করে থাকে একই রকমের অস্ত্রের প্রয়োগ। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বলে, "মধ্যপন্থী বলে কেউই নেই। প্রত্যেকটি যুযুৎসু গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, যুদ্ধরত ট্রেড-য়ুনিয়নপন্থী এবং 'নববিধানের ধ্বজাধারী' (New Dealer) হচ্ছে এক-একটি কম্যুনিস্ট।" আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে তারা, বলে: "ঐ যে বিছানার নীচেয় লাল জু জু!" আতঙ্ক, উত্তেজনা, ডাইনীর সন্ধান আর হিংসার আবহাওয়ার মধ্যে পুষ্টিলাভ করে থাকে যত সব চরমপন্থীর দল।

কম্যুনিস্টদের বেলায়ও তাই। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের তারা আক্রমণ করে থাকে বটে, কিন্তু যে সব উদারনীতিক ও সমাজতন্ত্রী তাদের সঙ্গে একমত নয়, তাদেরই প্রতি

অন্তরে অন্তরে পোষণ করে থাকে তারা জঘন্যতম বিদ্বেষ। কোন গণতন্ত্রী যদি গণতন্ত্রী হিসাবে রুশিয়াকে আর কম্যুনিস্ট-দের সমালোচনা করে ফেলে তবে কম্যুনিস্টদের কাছে সে হয়ে দাঁড়ায় একজন "প্রতিক্রিয়াপন্থী," কিংবা "ফাসিস্ত।" আর নয়তো, যা হচ্ছে সব চেয়ে ভয়ানক কথা তাই—"ট্রটস্কীর সাগ্‌রেদ।" অবিরাম আবৃত্তির ফলে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার ও নাসিকাকুঞ্চনের বলে "ট্রটস্কীপন্থী" বা "ট্রট্‌স্কীর সাগরেদ" কথাটা, যাদের ট্রট্‌স্কীর ক্রিয়াকলাপ ও রচনাবলীর সঙ্গে কোনরূপ সাক্ষাৎ পরিচয় নেই সেই সব স্টালিনপন্থীদের অভিধায়, হয়ে দাঁড়িয়েছে জঘন্যতম অশ্লীল শব্দ।

উদারনীতিকদের মধ্যে যাঁরা দুর্বলচেতা, প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত কর্দমপুঞ্জকে ভয় করে চলাই যাঁদের স্বভাব, ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে রফা করে চলেন তাঁরা, ধনতান্ত্রিকতার দোষত্রুটির বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর নম্র হয়ে আসে তাঁদের। উদার-নীতিকদের মধ্যে বোধশক্তির দৃঢ়তা নেই যাঁদের মধ্যে তাঁরাই সব ঠিক এইভাবে কম্যুনিস্টদের মনীষার সম্মুখে সন্ত্রস্ত বোধ করে থাকেন। আর বাস্তবিক এই-ই চায় চরমপন্থীর দল।

উদারনীতিক, সমাজতন্ত্রী, প্রগতিশীল, মৌলিক (radicals), এবং আর আর যাঁরা সব কাজ করছেন গণতান্ত্রিক জগতের জন্যে, উগ্রপন্থীদের ভয়ে চুপ করে যাওয়া কিংবা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া কখনই উচিত নয় তাঁদের। একদিককার উগ্রপন্থীদের আহ্বানে অপর-দিকের উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামে রত হওয়া অনুচিত তাঁদের

পক্ষে। গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রাম হলো যুগপৎ দু'টি বিভিন্ন রণ-সীমান্তের সংগ্রাম—তার একদিকে রয়েছে যত সব দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলের দল, অপরদিকে কম্যুনিস্টরা। গণতন্ত্রবৈরীদের সঙ্গে মৈত্রী অনুকূল হতে পারে না গণতন্ত্রের পক্ষে।

একদিকে প্রতিক্রিয়া এবং অপরদিকে কম্যুনিজ্‌ম্ শুধু এই দু'টির মধ্যেই একটিকে বেছে নেবার দায় নয় গণতন্ত্রীদের। নয় তা' শুধু ফ্যাসিজ্‌ম্ ও কম্যুনিজ্‌ম্-এর মধ্যে একটির নির্বাচন। তা' যদি হতো তবে তাকে নির্বাচনই বলা চলত না। এ নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে, যে আকুল অভিব্যক্তি এগিয়ে নিয়ে যাবে মুক্তির পথে আর যে ক্ষতিকর বিপ্লব চালনা করে নিয়ে যাবে সামগ্রিকতন্ত্রের গহ্বরে এই দু'টির মধ্যে, মহাত্মা গান্ধীর নীতিধর্ম আর মহাসেনাপতি স্টালিনের একক শক্তিসংহরণের মধ্যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনপহরণীয় স্বাধিকার আর গুপ্তপুলিশের কৃপার ফলে শুধু সময়বিশেষেই বাক্যস্ফূর্তি করবার সুযোগের মধ্যে, ব্যষ্টির একক প্রচেষ্টায় যা সম্ভবপর নয় একমাত্র সেই সব কার্য-সাধনের মধ্যে শাসনব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা আর সর্বময় শাসনব্যবস্থা যার কাজই হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তি আর প্রকৃতিপুঞ্জের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অবিরত হস্তক্ষেপ করা এ দুয়ের মধ্যে, মানুষের মর্যাদা স্বীকার করা আর মানুষকে রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি সামান্য কব্জা অথবা অনুরূপ ভাবেই মানবিকতার লেশশূন্য ব্যক্তিগত কারবারের একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র বলে মনে করার মধ্যে, নিজের ক্রিয়া-কলাপ ও জীবনযাত্রার অবস্থা নির্দেশের ব্যাপারে মানুষকে সম্পূর্ণ

সক্রিয় অংশভাক বলে স্বীকার করা আর এক চুপ্‌ড়ি পেঁয়াজ বিক্রি করার মতো তাকে তার নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয়ের অধিকার দান করার মধ্যে।

এই সব হলো নির্বাচনের বস্তু।

নিজেদের আর কম্যুনিস্টদের মধ্যে এবং নিজেদের আর দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে পরিষ্কার গণ্ডি টেনে দিয়ে (ফাসিস্ত আর প্রতিক্রিয়াশীলরা কিন্তু সাধারণ অবস্থায় বামকেন্দ্রিক দলগুলোর মধ্যে এসে গলে পড়ে না), উদারনীতিক গণতন্ত্রীরা এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করতে পারেন তাঁদের নৈতিক ও চিন্তাপ্রণালীগত আদর্শকে এবং সেই আদর্শ উপলব্ধির পথে অগ্রসরও হতে পারেন তাঁরা।

নবম অধ্যায়

নূতনত্ব কোথায় ?

'যা আছে তাই থাক' এ মতের সমর্থকরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে-কোনো পরিবর্তনকেই দেখে থাকেন ভয়ের চোখে। সমাজতন্ত্রের সামান্যতম প্রবর্তনেই ধনতন্ত্রের (capitalism) সর্বনাশ কল্পনা করেন তাঁরা। তাঁরা বলেন আমাদের সম্মুখে রয়েছে দু'টি মাত্র পথ—ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র।

এই একই কালো-আর-ধলোর সূত্রটি প্রয়োগ করে থাকে কম্যুনিস্টরাও, কেন না যাদেরই ধনতন্ত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা তাদেরই দলে টানতে চায় তারা।

কিন্তু আসল কথা এই যে, আমাদের নির্বাচনের বিষয়বস্তু শুধু ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের মধ্যেই পর্যবসিত নয়। বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বলতে নেই কিচ্ছুই। প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশেই ধনতন্ত্রের পাশাপাশি রয়েছে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্র (socialism) বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত লাভের পরিবর্তে জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা। টেনেসী উপত্যকার কর্তৃত্ব (T. V. A.—Tennessee Valley Authority) হচ্ছে সমাজতন্ত্রের একটি নিদর্শন। যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত

এবং পরিচালিত ওয়াশিংটনের গ্র্যাণ্ড কৌলী বাঁধ (Grand Coulee Dam) হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আর একটি উদাহরণস্থল। পৌরসভা অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত বাস্, ট্রলী প্রভৃতি যান-বাহন কিংবা বৈদ্যুতশক্তির ব্যবস্থাও হচ্ছে সমাজতন্ত্র। পরিণত-বুদ্ধির কাছে সমাজতন্ত্র শব্দটি ভয়ের বস্তু নয় মোটেই।

ব্যক্তিগত পরিচালনব্যবস্থার চেয়ে সর্বসাধারণের পরিচালনায় অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা দেখলে জনসমাজ অনেক সময় বিশেষ কোনো একটি শ্রমশিল্পের ভার দেশের গবর্ণমেণ্টকে এসে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়ে থাকে। এইরূপ কোনো কারণবশতঃই দেশবিদেশের গবর্ণমেণ্টের হাতে এসে পড়ে থাকে নানা রকমের নতুন নতুন অর্থনৈতিক কাজের ভার।

প্রথম বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে যে সব বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল তারা সব জে. পি. মর্গ্যান (J. P. Morgan), নাশন্যাল সিটি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আমেরিকান ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে যে-সব গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যের দরকার হয় তারা সব 'ঋণ-ইজারা' (Lend-Lease) ব্যবস্থায় সাহায্য লাভ করতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে। প্রথম বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রের কারবারীরা টাকা ধার করত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের মধ্যে সামরিক প্রয়োজনে শস্ত্রশিল্পের যে প্রসার ঘটে তার প্রায় সবটাই ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাজ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে কেন দেখা

দিল এ পার্থক্য ? কারণ যুদ্ধের জন্যে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সাধ্যের অতীত।

বর্তমানেও ইউরোপের পুনর্গঠন এবং এশিয়ার সংগঠনের কাজ অবিকল অক্ষশক্তির (the Axis) সঙ্গে আমেরিকার লড়াই করার মতোই এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার ব্যবসায়বাণিজ্য তার বিতুল বৈভব সত্ত্বেও যুদ্ধ চালাবার দায়িত্ব বহন করতে অক্ষম। যে ইউরোপ আজ এসে দাঁড়িয়েছে দারিদ্র্যের শেষদশায়, আর যে এশিয়া অর্থসম্পদে আজও রয়েছে অনুন্নত, গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ছাড়া, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে, কী করে তা' সমাধান করবে বৃহত্তর সমস্যার ?

যুদ্ধের মধ্যে প্রত্যেকটি বোমা আর গোলার বিস্ফোরণে উড়ে চলে গেছে ব্যক্তিগত মূলধন (private capital)। যুদ্ধের কাজে ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিকল হয়ে গেছে যত সব কলকারখানা। রণসঞ্জাত মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে যত সঞ্চিত মূলধন (capital savings)। শোনা যায় ধনতন্ত্রই না কি বাধিয়ে থাকে সংগ্রাম। হতেও বা পারে। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এসেছে এই ধনতন্ত্রেরই।

ইউরোপ ও এশিয়ার মূলধনসম্পদের এই ক্ষয়ের চেয়ে, ধনিক-শ্রেণী ও ধনতন্ত্রের প্রতি জনসমাজের আস্থাহানি একটি কম গুরুতর ব্যাপার নয়। ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী ও জাপানের বড় বড় পুঁজিপতিরা ছিলেন নাৎসী ও ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে একমন একপ্রাণ।

তাঁদের অনেককে তাই বহিষ্কৃত করে দিয়েছে বিজয়ী বিদেশী শক্তিবর্গ, নয় তো তাঁদেরই স্বদেশবাসীরা। সমাজে তাঁদের সেই পুরাতন প্রতিপত্তি ফিরে পাবার আশা নেই, আর।

একই পুরুষে দু'দুটি কুরুক্ষেত্র আর সেই দু'টি কুরুক্ষেত্রের অবকাশকালটুকুর মধ্যে অর্থনৈতিক বিপত্তি, বিপুল বেকার সমস্যা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, এত শত কাণ্ডকারখানার মধ্যে দিয়ে যাবার পর, বর্তমান সমাজ যে সব মৌলিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত সে সব বিষয়ে লোকের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক না হয়ে থাকতে পারে না।

বিশেষ করে গৌণ শ্রমশিল্পী, খুচরা কারবারী, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, দন্তবৈদ্য, সরকারী কর্মচারী, এবং সাধারণ চাষী গৃহস্থ—এক কথায় সমগ্র মধ্যবিত্তশ্রেণী—এই কয়েক বৎসরে তাদের পূর্বতন সকল আস্থা হারিয়ে বসে আছে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে তাদের আয় যায় কমে, সঞ্চিত ধনে পড়ে টান। নিরুপায় লোক হয় সম্পূর্ণ পিষে যায়, নয়তো কোনো বড় ব্যবসায়-সঙ্ঘ (trust) কি ভাণ্ডারসূত্রের (chain store) মধ্যে হারিয়ে ফেলে তার নিজস্ব সত্তা। বিপত্তির মুখে নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপের ভয়ে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী খুঁজে বেড়ায় নবতর মৈত্রীর সম্ভাবনা। রাজনীতির ক্ষেত্রে এ যেন একটি ভাসমান দ্বীপ।

আধুনিক শ্রমশিল্পপ্রধান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর আয়তন অবশ্য দেশের গতি নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে সম্পূর্ণই উপযুক্ত। জার্মানীর মধ্যবিত্তশ্রেণী আত্মসমর্পণ করেছিল হিটলারের কাছে,

আর তারই ফলে জার্মানী হয়ে দাঁড়ায় নাৎসী। ব্রিটেনে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী এসে দাঁড়িয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে। একমাত্র শ্রমিক-শ্রেণীর ভোটের জোরেই শ্রমিকদল পার্লামেণ্টে এমন বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারত না। মধ্যবিত্তশ্রেণীর দৌলতেই ঘটেছে এ কাণ্ড। পূর্বতন ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর 'পরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে মধবিত্তশ্রেণী (প্রসঙ্গতঃ, শাসকশ্রেণীরও নিজেদের 'পরে নেই আর সে অবিচল আস্থা।) মধ্যবিত্তশ্রেণী আর শ্রমিকশ্রেণী লক্ষ্য করেছিল লড়াইয়ের আগে ব্রিটিশ শ্রমশিল্পের অধোগতি। ব্রিটিশ মূলধনের একটা বড় অংশ প্রবাসযাত্রা করেছিল সাগরপারে, দেশের অবলুপ্ত কাজ-কারবারের পুনর্গঠন করে দেশের লোকের জন্যে যথোপযুক্ত আবাসগৃহের ব্যবস্থা করেনি তা দেশে থেকে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্রিটিশ কয়লাশিল্প গিয়েছিল বানচাল হয়ে। যথোপযুক্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার হতো না তাতে, প্রয়োজনের অনুপাতে অর্থনিয়োগ হতো স্বল্প পরিমাণে, আর বিধিব্যবস্থা ছিল যার-পর-নাই অব্যবস্থিত। কয়লাশিল্পকেই সর্বাগ্রে জাতীয় কারবারে পরিণত করার এ-ই হচ্ছে কারণ। ব্যক্তিগত মূলধন যেখানে অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে, সেখানে সেই কাজের ভার গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

অধিকন্তু, ব্রিটিশ জনসাধারণ স্বচক্ষে দেখে এসেছে ব্রিটিশ পর-রাষ্ট্রনীতির অন্তঃসারশূন্যতা; সময়োচিত কার্যের ফলে নিবারণ করা যেত দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম, কিন্তু হয় নি তা'। ব্রিটিশ জন-

সাধারণ জানত, কেন না রাজনীতিজ্ঞানে প্রবীণ তারা, যে সাম্রাজ্য বিলিয়েই দিতে হবে, নইলে আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে তা। কিন্তু চার্চিল, ঊনবিংশ শতকের সঙ্গে চিরদিন গাঁটছড়া বাঁধা তাঁর, উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে সে কাজ করবেন না তিনি কিছুতেই।

টোরীরা হলো ভূত। ব্রিটেনের দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের 'পরে। তারই ফলে এই শ্রমিকদলীয় গবর্ণমেণ্ট। আজকের এই পরিবর্তনশীল জগতে নতুন এক ইংলণ্ড গড়ে তোলার নির্দেশপত্র দান করা হয়েছে তাকে।

ইউরোপখণ্ডে এক ভাঙা জগৎ জোড়া দেবার ভার পড়েছে পঙ্গুদের 'পরে। খুরপী চালায় তারা, চালায় লাঙ্গল, ঘোরায় চাকা, পিষে মরে কলম। কিন্তু হাত কাঁপে তাদের; দীর্ঘ শ্রমে, পুষ্টির অভাবে, এবং সব চেয়ে যা মারাত্মক সেই শব্দময় অগ্নিকাণ্ড, শেষকৃত্যহীন রাশি রাশি শবদেহ, আর নির্বাপিত জীবনের স্মৃতিতে ক্লান্ত, অবসন্ন তারা। মরে গেছে এরা সব। মরে গিয়ে যেন ফের উঠেছে বেঁচে; আর শুধু অবাক হয়ে ভাবছে কী করে ঘটলো এমন কাণ্ড, জীবনের দিকে চায় তারা অদ্ভুত, অবোধ, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে। যে সব লোক একদিন মরে গিয়েছিল আজ তাদের কোনোক্রমে শুধু অস্তিত্ব-টুকু রক্ষা করে চলতে হবে মাত্র বারো হাজার ক্যালোরীর খোরাকে, তার সঙ্গে মিশবে না একবিন্দু আশার পানীয়। হয়তো নতুন কোনো ভাবাদর্শে ফিরে পেতে পারে তারা আত্মশক্তি।

পুরাতন আজ তাদের কবরখানা; তারই মধ্যে পুঁতে ফেলা হয়েছিল তাদের।

ইউরোপ—আমেরিকা এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির জননী এই ইউরোপ—এশিয়ার সূতিকাগৃহে জাত নানা ধর্মের পরিণতি লাভের ক্ষেত্র এই ইউরোপ আজ বড়ই ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত। ইউরোপ যদি বেঁচে উঠতে না পারে তবে সভ্যতা হয়ে পড়বে একদিককার হস্ত-ও-পদবিহীন পঙ্গুর সামিল, হয়ে পড়বে ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির মতো। ইউরোপের পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে হলে চাই বিজ্ঞান, প্রগতি, সম্পদ, মৈত্রী, এবং মুক্তির যাবতীয় বৈভব।

এশিয়া—লটপটগতি এক দৈত্যবিশেষ, এক ঘুমন্ত দানব, তার মধ্যে রয়েছে বিপুল শক্তির সমাবেশ, কিন্তু এখনও সে শক্তিকে সুসংহত করবার মতো মস্তিষ্কের অভিব্যক্তি ঘটেনি তার মধ্যে—এশিয়া, একত্রে অন্যান্য সকল মহাদেশের জনসংখ্যার চেয়ে বিপুলতর যার জনশক্তি—তার প্রয়োজন আজ বিজ্ঞানের বলে আধিভৌতিক বিপত্তিজালের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ, প্রয়োজন তার ক্রান্তীয় উত্তাপের শান্তি, মরুভূমির তৃষ্ণার বারি, আভ্যন্তরীণ দূরত্বের হ্রস্বতাসাধন, সংগুপ্ত সম্পদের আবরণ উন্মোচন, নগ্নতার লজ্জানিবারণ, আর প্রতি বৎসর অনশনের কবল থেকে লক্ষ লক্ষ প্রাণকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট চাল, গম আর দুধের সংস্থান করবার মতো অবস্থার।

এইরূপ আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকাও অপেক্ষা করে রয়েছে যাদুদণ্ডের স্পর্শ।

বিধির চেয়ে বেশি প্রয়োজন বস্তুর।

মানবিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য নয়, ধনতন্ত্র কি সমাজতন্ত্র কি কম্যুনিজ্‌ম্‌কে রক্ষা করা। মানুষের অধিকতর সুখসুবিধা বিধানই মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, আর বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ছাড়া অপর কোনও ব্যবস্থায় যদি তা' সম্ভবপর হয় তবে, যিনি জনহিতকামী, শুধু কোনো বিশেষ ব্যবস্থা বা বিশিষ্ট মতবাদেরই ভক্ত নন, তাতে কী কারণ থাকতে পারে তাঁর আপত্তির ?

সার্থকতা লাভ করেছে ধনতন্ত্র। অসার্থকও হয়েছে তা। ধনতন্ত্রের আওতায় পতিত হয়ে পড়ে রয়েছে এক-একটি মহাদেশ, নিজেদের রক্তস্রোতের উজান ঠেলে পথ অতিক্রম করে চলতে হয়েছে বিভিন্ন দেশকে, এমন কি সমৃদ্ধতম জাতিদেরও ভোগ করতে হয়েছে—ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাময়িক মন্দা, অর্থের মূল্যহ্রাস, বেকারসমস্যা এবং নিরাপত্তাহানি। কেউ কেউ ধনতন্ত্রকে চিরন্তন ধর্মের মতো মনে করে থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে চিরন্তন বলে কিচ্ছু নেই, সুপবিত্র কিছু থাকা তো দূরের কথা।

মানুষই হলো চরম লক্ষ্য, বিধি নয়। কাম্যবস্তু হচ্ছে স্বাধীনতা, 'স্বাধীন' কারবারই কাম্য নয়—আদপেই স্বাধীন নয় সে বস্তুটি।

পুরাতন পন্থায় আস্থা নেই আর 'পুরাতন পৃথিবীর।' নতুন কিছুর জন্যে হাতড়ে মরছে আজ ইউরোপ আর এশিয়া—যাতে তার 'পরে চলে আস্থা স্থাপন করা, আর তাতে করেই আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে তাদের।

ভুক্তভোগী জাতিমাত্রেরই অন্তরে জেগেছে প্রশ্ন, দেখা দিয়েছে সংশয় ও সন্দেহ। এ হেন মনোভাব থেকেই উপজাত হতে পারেন ডিক্টেটর। তবু এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, এ মনোভাব হলো পরীক্ষাকার্য ও পরিবর্তনের অনুকূল—তাতে করে তারা শুধু হারাবে তাদের দুঃখদুর্দশা আর দুঃস্মৃতি। রক্ষণশীলদের শুনতে হয় এই বিস্মিত প্রশ্ন: "কী, ফের সেই অতীত?"

কে কতটা রক্ষণশীল প্রায়ই তা' নির্ভর করে থাকে অতীত কতখানি সুখের হয়েছে কার পক্ষে, কিংবা অল্পভাগ্যদের কাছ থেকে কে থাকতে পেরেছে কতখানি দূরে, নয়তো কার কল্পনাশক্তির দৌড় কতদূর: মানবজাতি সম্বন্ধে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কল্পনায় আসে কি না তোমার তার 'পরে। প্রত্যেক যুগেরই নৈরাশ্য-প্রবণ রক্ষণশীলের নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, বর্তমানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হতে পারে না কিছুই—যতক্ষণ অবধি না তা' এসে দাঁড়াচ্ছে অতীতের পর্যায়ে। সংস্কারকেরা হচ্ছেন আশাশীল। তাঁদের বিশ্বাস উৎকর্ষ সাধনের শক্তি রাখেন তাঁরা।

বিংশ শতকের চিন্তাধারার 'পরে প্রধানতঃ প্রভাব বিস্তার করেছে তিনটি পরস্পর-প্রতিযোগী সমাজতত্ত্ব: রক্ষণশীলতা, অর্থাৎ ১৮৮০ কি ১৯০৭ সালের সেই অপরিবর্তিত ধনতন্ত্র; সমাজতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ধনতন্ত্র; কম্যুনিজ্‌ম্।

নির্জলা ধনতন্ত্রের প্রতি মৌখিক ভক্তি দেখিয়ে থাকেন যাঁরা তাঁদের অনেকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে সরকারী সাহায্য

লাভ করেই হয়েছেন লাভবান। ধনতন্ত্র যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই থাক, এই মতের বড় বড় পাণ্ডাদেরই অনেকে গবর্ণমেণ্টকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছেন। স্বাধীন কারবারের সমর্থক মাত্রেই বাস করে থাকেন সরকারী সংরক্ষণব্যবস্থার (protection) আশ্রয়ে।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া উচিত কি না, একান্তই নিরর্থক এখন এ প্রশ্ন ; ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েই পড়েছেন গবর্ণমেণ্ট। এখন প্রশ্ন হলো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব থাকা দরকার কতখানি।

প্রায় সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশেই এখন চেষ্টা চলেছে অর্থনৈতিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কতদূর অবধি হস্তক্ষেপ করতে পারেন সেই প্রশ্ন সমাধানের। এ সমস্যার সুষ্ঠু এবং সময়োচিত মীমাংসার 'পরেই নির্ভর করছে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা এবং ফুলেফলে তার পূর্ণ বিকাশ লাভের সম্ভাবনা। কেননা সরকারী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধির দ্বারাই নির্ণীত হবে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পরিক ক্ষমতার পরিমাণ। স্বাধীনতা-সমস্যার মূলকথাও এইখানেই।

কেউ কেউ মেনেই নিয়েছেন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে সরকারী ক্রিয়াকলাপকে ; তাঁদের মতে সরকার থাকবেন নিয়ন্ত্রণের কর্তা বা মীমাংসক রূপে, হবেন "সান্তা ক্লজ," নয়তো পথঘাট, সেতু প্রভৃতি জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থার কাজে থাকবেন মহাজন (financier) হয়ে। অন্যান্য অনেকে

আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে থাকেন ; তাঁরা চান গবর্ণমেণ্ট হবেন শ্রমশিল্পের কর্তা ও উদ্যোক্তা। কিন্তু কোন্ কোন্ শ্রমশিল্পের ? কতগুলোর ? এ সব হচ্ছে বিতর্কের বিষয়। জনকল্যাণমূলক শ্রমশিল্প (public utilities), রেলপথ, কয়লা, ইস্পাতের মতো গুরুশিল্প, এ সব কিছুরই জাতীয়করণের পক্ষে রয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন সমর্থকের দল।

এ সব প্রশ্নের সমাধান হবে না বাক্যবাগীশ ন্যায়চুঞ্চুদের দ্বারা, সমাধান হবে প্রত্যেক দেশের পরস্পর প্রতিযোগী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, অন্ততঃ যে সব গণতন্ত্র এখনও রয়েছে অবশিষ্ট সেগুলোতে এর মীমাংসার ফলে বুঝতে পারা যাবে ধনতন্ত্রের অতীত সাফল্য বা অসাফল্য সম্বন্ধে জনসাধারণের কী অভিমত।

এমন কি এই সুসমৃদ্ধ আমেরিকায়ও, সেনেটের রিপাব্লিকান দলের সদস্য রবার্ট এ. টাফট্ (Robert A. Taft), যাঁকে সাধারণতঃ সমাজতন্ত্রী বলে বিবেচনা করাই হয় না তিনি, ১৯৪৭ সালের ১৮ই মার্চ্চ ঘোষণা করেন, "ব্যক্তিগত কারবার কখনও বিভিন্ন বর্গের নিম্নতম আয়ের লোকেদের জন্যে প্রয়োজনীয় গৃহাবাসের ব্যবস্থা করে নি।" ন্যাশন্যাল হাউসিং এজেন্সীর (National Housing Agency) ১৯৪৫ সালের তথ্যানুসন্ধানের ফলে যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোয় শতকরা ১৬ ভাগেরও বেশি ব্যক্তিগত

ঘরবাড়ীতে নেই কলের জলের কোনো-রকমের ব্যবস্থা, দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশিতে নেই স্বতন্ত্র স্নানঘর, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে নেই আভ্যন্তরীণ প্রসাধনকক্ষ, এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে হয় ভয়ানক গরম, নয় রয়েছে যথোপযুক্ত তাপের অভাব।

ব্যক্তিগত কারবারের আওতায় বাড়ীঘর তৈরি হয় লাভের জন্যে, এবং স্বল্প আয়ের লোকেদের জন্যে বাড়ীঘর তৈরি করায় লাভ কম হ'তে বাধ্য বলে, এ দিকে ব্যক্তিগত কারবারীদের বিশেষ নজরই নেই। ফলে লোকের হয় স্বাস্থ্যহানি আর স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। সিনেটর টাফ্‌ট্‌ তাই বলেছেন যে, সুলভ আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের একটি মৌলিক দায়িত্ব।

দরিদ্রদের জন্যে গৃহাবাস নির্মাণের কাজে—গৃহের প্রয়োজন তাদেরই সব চেয়ে বেশি—গবর্ণমেণ্ট অর্থসাহায্য করলেও, ব্যক্তিগত কারবারীদের তাতে আগ্রহ না হতে পারে, এবং সেরূপ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টকেই স্বহস্তে করতে হবে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা। সে-ই হবে সমাজতন্ত্র।

যারা অবদমিত তাদের প্রতি অধিকতর মনোযোগদানের ফলে গবর্ণমেণ্টকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে ক্রমেই অধিকতর হস্তক্ষেপ করতে হবে। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে অবশ্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার হানি কিংবা তার মৌলিক পরিবর্তনের দাবি বিশেষ প্রবল নয় যুক্তরাষ্ট্রে, কারণ এ দেশে এ ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী এবং তা' বহু লোকের বহু সুযোগসুবিধার মূলও বটে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মন্দাই শুধু এ চাপকে প্রবলতর করে তোলে। তবে

যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে যে তারা সব হচ্ছে গিয়ে অর্থনৈতিক কিংবা প্রবংশগত নয়তো অন্য কোনোরূপ অবিচারের পাত্র, সেখানে সব সময়ই এ চাপ হচ্ছে প্রবলতম। সময় বিশেষে তার কারণ ব্যক্তিগতও হতে পারে।

মিসেস ক্লেয়ার ল্যুস্ (Mrs. Clare Luce) বলেন যে, ক্যাথলিক চার্চে প্রবেশের পূর্বে প্রথমে মনোবিকলন (Psycho-analysis) এবং তারপর কম্যুনিজ্‌ম্ পরখ করে দেখেছিলেন তিনি। তিনি লিখছেন, "আমার এখন মনে হয় যে, কম্যুনিজ্‌ম্-এর ধর্মভাবের দিকটাই আমার অন্তর স্পর্শ করেছিল। কম্যুনিজ্‌ম্ ছিল একটা নিরবগ্রহ ধর্মবিধান।" এইরূপ, হেউড ব্রৌনও (Heywood Broun) প্রথমে পরখ করে দেখেছিলেন কম্যুনিজ্‌ম্, তারপর গ্রহণ করেন তিনি ক্যাথলিক মতবাদ। লুই বুদেন্‌ৎজ্ (Louis Budenz) ছাড়লেন ক্যাথলিক চার্চ, হলেন কম্যুনিস্ট ডেইলী ওয়ার্কার (Daily Worker) পত্রিকার সম্পাদক, তারপর আবার ফিরে এসেছেন তিনি তাঁর পুরাতন চার্চে। এ ধরণের অন্যান্য আরও অনেকে হলীউডের নিজ নিজ সাঁতারদীঘির পাড়ে নিবিষ্ট-চিত্তে বসে বসে অধ্যয়ন করে থাকেন স্টালিনের পবিত্র ধর্মশাস্ত্র, নয়তো কনেক্‌টিকাট্-এর জমিদারীতে বসে বিভোর হয়ে দেখে থাকেন বিপ্লবের স্বপ্ন। যে সম্পদে আর কোনো রস পান না তাঁরা, কিন্তু যা হাতছাড়া করতেও প্রাণে সয় না তাঁদের, তারই জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে সাধ যায় তাঁদের চিত্তে। তাই একবার পরখ করে দেখবার জন্যে তাঁরা সব গিয়ে যোগদান করেন দরিদ্র সর্ব-

হারাদের দলে, অবশ্য ব্যাপারটা যাতে করে নিরাপদ ও আরামপ্রদ হতে পারে সে বিষয়ে নিঃসংশয় হবার পরই। যে রুশিয়া সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গেরও জ্ঞান নেই তাঁদের তা নিয়ে যে ভাবে স্বর্গরচনা করে থাকেন তাঁরা তা হচ্ছে বাস্তবিকই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, কিংবা হৃদয়বৃত্তি-সংক্রান্ত, কি প্রবংশ-গত কোনও বন্ধনের বশে (ভাবখানা হচ্ছে এই যে, এরা সব শ্লাব জাতীয় বলে "রুশিয়াজননীর" সেবা করে যাচ্ছে, এই আর কী) কোনো কোনো লোক আকৃষ্ট হয়ে থাকে সামগ্রিকধর্মী কম্যুনিজ্‌ম্-এর প্রতি। আবার, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং সমাজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ফলে যাদের অন্তরে উপজাত হয়েছে এই উচ্চতর নৈতিক চেতনা বা প্রত্যয় যে, ধনতন্ত্রই মানবিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা নয়, তাঁদেরও অনেকে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতি। কিন্তু আমেরিকা যখন দান করে বিবিধ প্রতিশ্রুতি ও সমৃদ্ধি তখন এ দুই দলের কোনো দলই পায় না বিপুল সমর্থন।

অপেক্ষাকৃত স্বল্পসমৃদ্ধ জাতিদের মধ্যে ধনতন্ত্রবৈরিতার দিকে স্বভাবতঃই লোকের ঝোঁক বেশি।

সামান্য দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, ইউরোপ আর এশিয়ার গণ-তান্ত্রিক জাতিরা, এমন কি ল্যাটিন আমেরিকারও কোনো কোনো জাতি, দ্রুত এগিয়ে চলেছে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণের দিকে। সুইডেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীলণ্ড, অস্ট্রিয়া এবং পশ্চিম-জার্মানীতে হয়েছে বৃহত্তর শ্রমশিল্পসমূহের

জাতীয়করণ। যে সব স্থানে গবর্ণমেণ্ট এখনও শ্রমশিল্পসমূহের ভার স্বহস্তে তুলে নেন নি সে সব স্থানে হয় তা করার ব্যবস্থা চলছে, নয়তো প্রবর্তিত হয়েছে কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিধান, কিংবা সুরু হয়ে গেছে ব্যক্তিগত কাজ-কারবারের 'পরে রাষ্ট্রের তদারক। ব্যক্তিগত ধনতন্ত্র, যুদ্ধ থেকে যা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি ক্ষীণযষ্টিবিশেষ, ক্রমেই তা হয়ে উঠছে সরকারের 'পরে নির্ভরশীল। আর সব দেশেরই সরকার জনসাধারণের আস্থাহীনতা অনুযায়ী ব্যক্তিগত উদ্যমের 'পরে খরতর দৃষ্টি রাখতে এবং বজ্রমুষ্টি স্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাজনৈতিক সমর্থন হারাতে সুরু করেছে ধনতন্ত্র। ১৯৪৭ সালের ১১ই মে গ্রেট ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ঘোষণা করেছেন যে, শাসনভার ফিরে পেলে ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ড, কয়লাখনিগুলো, কিংবা রেলপথসমূহ আর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করবার চেষ্টা করবেন না তাঁরা। ফ্রান্সে কম্যুনিস্ট আর সোসালিস্ট দল হচ্ছে ধনতন্ত্রের বিরোধী, ক্যাথলিক দলেও আছে একটি শক্তিশালী ধনতন্ত্রবিরোধী শাখা। দেশের মধ্যে এই তিনটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় দল। এমন কি জেনারেল শার্ল দ্য গল (General Charles de Gaulle), ফ্রান্সে যিনি হচ্ছেন মস্ত বড় একজন দক্ষিণপন্থী, তিনিও ১৯৪৭ সালের ২৪শে এপ্রিল প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কয়লাশিল্প, বৈদ্যুতশিল্প আর বীমার কারবার জাতীয়করণের পক্ষপাতী তিনি। ইতালীর অবস্থাও তথৈবচ। জার্মান ক্রিশ্চিয়ান

সোস্যাল য়ুনিয়ন, যার মধ্যে রয়েছে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যাণ্ট দুই মতেরই লোক, হচ্ছে কোনো কোনো শ্রমশিল্পের জাতীয়-করণের পক্ষপাতী। শুধু ক্ষুদ্র একটি জার্মান দল হচ্ছে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্রের সমর্থক। চীনের জাতীয় সরকার এমন একটি বিরাট বয়নশিল্পসঙ্ঘ পরিচালনা করে থাকেন যে তা হচ্ছে যাবতীয় বয়নব্যবসায়ীদের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান। জাপানের নির্বাচক-মণ্ডলীর একটি বৃহৎ অংশ হলো সমাজতন্ত্রী দলের পৃষ্ঠপোষক। ইন্দোনেশিয়ার নতুন সাধারণতন্ত্রের অর্থনীতিবিভাগের মন্ত্রী মিঃ এ.কে. গনি—জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটি—যবদ্বীপ ও সুমাত্রাকে 'সমাজতন্ত্রবিশেষে' (Semi-Socialism) পরিণত করবার জন্যে এক দশবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। ভারতবর্ষের নতুন কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্কল্প করেছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে, আর কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্যে বাঙলা ও বিহারে তৈরি করছেন তাঁরা দশ হাজার বাসগৃহ। ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্রী দলের নেতা হচ্ছেন জয়প্রকাশ নারায়ণ; জওহরলাল নেহরু, জে. আর. ডি টাটার মতো বড় বড় পুঁজিপতি, এবং অন্যান্য আরও অনেকের বিশ্বাস তিনিই হচ্ছেন তাঁর দেশের ভাবী নেতা। ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রীরা—যেহেতু তারাই হলো দেশের সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ দল—হয়তো হিন্দু মোসলেম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মীমাংসায় সব চেয়ে সক্ষম প্রতিপন্ন হতে পারে। গান্ধী বলেছেন তিনি চান সব চেয়ে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী, এমন কি কম্যুনিস্টেরই মতো, ধনতন্ত্রের, একেবারে

সম্পূর্ণ যদি না-ও হয় তবুও, প্রায়-সম্পূর্ণ অবসান সংঘটন করতে—অবশ্য তাঁর নিজের পন্থায়। প্যালেস্টাইনে সব চেয়ে সংখ্যাগুরু ইহুদী-দল হচ্ছে ইহুদীদের শ্রমিক দল (Jewish Labour Party)। সমগ্র ইউরোপে বহুকাল থেকেই রয়েছে বিবিধ নাতিক্ষুদ্র সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এদের মধ্যে সর্ব-প্রধান হলো ব্রিটিশ শ্রমিক দল। ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রের পথে দীর্ঘ পদক্ষেপ করেছে তারা।

জনগণের সমর্থন হারাতে সুরু করেছে ধনতন্ত্র। দারিদ্র্য ও অভাবের দ্বারা নিপীড়িত জনগণ চাইছে সমাজতান্ত্রিক কাজ-কারবার আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। অবাধ ব্যক্তিগত কাজকারবারে আস্থা হারিয়েছে তারা।

মনীষীদেরও সমর্থন হারাতে সুরু করেছে ধনতন্ত্র। ধনতান্ত্রিক ইউরোপ আর এশিয়ার সৃজনীপ্রতিভা আজ হয় ধর্মপন্থী, নয় সমাজতন্ত্রী, নয়তো কম্যুনিস্ট। এই দুই মহাদেশে ক্বচিৎ এক-আধজন চিন্তাশীল ব্যক্তি, কি বিশ্লেষণবিদ ব্যক্তিগত কারবারের পক্ষসমর্থনে অবতীর্ণ হয়ে শেষটায় হতমান অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হতে বাধ্য হয়ে থাকেন। সম্মুখপথে এগিয়ে যেতে পারেন না তিনি।

ইউরোপের সমগ্র সোভিয়েট প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে—ফিন্‌ল্যাণ্ডে, পোল্যাণ্ডে, রুশীয় জার্মানীতে, রুশীয় অস্ট্রিয়ায়, রুমানিয়ায়, হাঙ্গেরীতে, চেকোস্লোভাকিয়ায়, বুলগেরিয়ায়, যুগোশ্লা-বিয়ায় এবং আল্‌বানিয়ায়—রুশীয় এবং কম্যুনিস্ট চাপের ফলে অর্থনীতির প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ঘটেছে জাতীয়করণ-ব্যবস্থার

সম্প্রসারণ। এই বিরাট ক্ষেত্রের উৎপাদন-ব্যবস্থা আর ব্যবসায়ের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ এখন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে মস্কৌ-এর বিভিন্ন ব্যবসায়সঙ্ঘ (trusts) ও বণিকসঙ্ঘের (cartels) অঙ্গুলিহেলনে।

সামাজিক বর্ণচ্ছটায় (spectrum) তাই একদিকে রয়েছে সমাজতন্ত্রের প্রায়-স্পর্শলেশশূন্য ধনতান্ত্রিক আমেরিকা এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে ধনতন্ত্রের সঙ্গে দ্রুতগতিতে চলেছে সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ সেই গণতান্ত্রিক ইউরোপ ও এশিয়া এবং সোভিয়েটের প্রভাব পরিমণ্ডল যেখানে প্রতি মাসেই ঘটছে গণ-তন্ত্রের সঙ্কোচ আর সমাজতন্ত্রের বিস্তার সাধন, আর তার পাশ দিয়ে আর-একদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ সংস্পর্শশূন্য এবং ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের অস্তিত্ববিহীন সোভিয়েট য়ুনিয়ন।

এ-ই হচ্ছে যুদ্ধোত্তর নবীন জগতের আলেখ্য। যুদ্ধের ফলে সর্বত্রই ঘটেছে ধনতন্ত্রবিমুখ গতিবেগের প্রসার।

দশম অধ্যায়

বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে অভিযোজন সাধনের সমস্যা

মানবজাতির চোখের সম্মুখে অভিনীত হয়ে চলেছে ক্ষমতালাভের এক উন্মাদ প্রচেষ্টা। বৃহত্তর জাতিরা গ্রাস করে চলেছে ক্ষুদ্রতর জাতিদের; বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আত্মসাৎ করে ফেলছে যত সব ছোট ছোট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে; শ্রমশিল্প আর সরকারের মাথার 'পরে গদা উঁচিয়ে রয়েছে ট্রেড-য়ুনিয়নগুলো। প্রতি-যোগীদের অনুরূপ এবং বিপরীত কার্যাবলীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে আত্মসমর্থন করে চলেছে প্রত্যেকটি দল। প্রত্যেকের কথাই অন্ততঃ আংশিক ভাবে সত্য।

এই ক্ষমতালোভের সমস্যার মূলে রয়েছে বর্ত্তমান যুগে উৎ-পাদনের অসম্ভব রকমের বিস্তার। যে প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতি যত সমৃদ্ধ সে প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা পরিচালকবর্গ যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দলভুক্ত তাদের ক্ষমতার পরিধিও ততখানি বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯০ সালের চেয়ে বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রসার স্পষ্টতঃই অশেষ গুণে অধিক, শুধু এই কারণে যে আজ সেখানে হচ্ছে অধিকতর উৎপাদন, চলছে অধিকতর ক্রয়বিক্রয়, রয়েছে অধিকতর অর্থ, সকল কিছুই বেড়ে উঠেছে বিপুল পরিমাণে।

এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে জীবনযাত্রাকে স্বয়ংশাসিত পল্লীর

বহুসংখ্যক কুটিরশিল্পের মধ্যে সরল ও আদিম অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে চান গান্ধী। কিন্তু ভারতবর্ষও এ বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না, পৃথিবী তো করবে না নিশ্চয়ই।

ক্ষমতাকে সংযত রাখবার জন্যে কিংবা সমগ্র ক্ষমতার পরিমাণ হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই জটিল শ্রমশিল্পপ্রধান সভ্যতার মধ্যে কোনরূপ রচনাত্মক (constructive) কর্ম্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করা যেতে পারে কি? এরূপ কোনো কৌশল যদি আবিষ্কৃত না হয় তবে যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর বিজ্ঞানশিল্প সম্বন্ধীয় (technological) উদ্ভাবন আজ আশীর্বাদস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত সেগুলোই হয়ে দাঁড়াবে মানবজাতিকে শৃঙ্খলিত করার, অথবা মানবকুলের উৎসাদনের, পন্থাস্বরূপ।

কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে, ক্ষমতা আর মূলধনের ব্যাপারে যদি একচেটে ব্যবস্থাই করতে হয় তবে তা' ব্যক্তির হাতে থাকার চেয়ে জনসাধারণের প্রতিভূস্বরূপ যে গবর্ণমেণ্ট তারই হাতে থাকা অধিকতর নিরাপদ। তাঁরা তাই যাবতীয় ক্ষমতা পুঁজিপতিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গবর্ণমেণ্টের কাছে হস্তান্তর করার পক্ষে ওকালতি করে থাকেন। কিন্তু তাতে করে স্বাধীনতার বিপদ কাটে না, কিংবা তা' হ্রাসপ্রাপ্তও হয় না; কেন না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের দ্বারা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ করা চলতে পারে কিন্তু যে গবর্ণমেণ্ট নিজেই যাবতীয় মূলধনের মালিক তা' হচ্ছে নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী।

যে গবর্ণমেণ্টের কার্যক্ষেত্রের প্রসার যতখানি, ক্ষমতার ভাগও

তার ততই বেশি ; আর তার ক্ষমতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, ব্যক্তির পরে কর্তৃত্বের পরিমাণও বেড়ে যাবে তার সেই অনুপাতে। রুশিয়ায় রাষ্ট্রই করে থাকে সব কাজ। রাষ্ট্রই হচ্ছে একমাত্র পুঁজিপতি ও শাসনকারী। এর থেকেই আসে শোষণ (exploitation), অত্যাচার, স্বৈরাচার (dictatorship), আর রাজ্যলিপ্সা (imperialism)। মার্কস্‌পন্থীরা ধরে নিতেন যে, রাষ্ট্রের হাতে পুঁজিপতিদের বিষয়সম্পত্তির হস্তান্তর ঘটলেই দেখা দেবে সত্যযুগ (the millenium)। কিন্তু যাবতীয় বিষয়সম্পদ রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়লেই আয়তনে এবং নিষ্ঠুরতায় রাষ্ট্র হয়ে ওঠে এক দানববিশেষ—আর তাতে করে কী লাভ হয়ে থাকে তখন মানুষের ?

গান্ধীর চরকাযন্ত্রের অর্থনীতি স্পষ্টতঃই স্বৈরতন্ত্রের একমাত্র অন্যতর বিধান (alternative) নয়। আর অর্থনৈতিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের কোনোই হাত থাকবে না, এ তারও কোনো ব্যবস্থা নয়। তা' হলে তার ফলে দেখা দেবে অরাজকতা আর নিরাপত্তার অভাব।

অনর্থের কারণ হচ্ছে হয় গবর্ণমেণ্টের, নয় ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের হাতে ক্ষমতার একচেটে অধিকার চলে যাওয়া। দুই-ই মানুষকে পরিণত করতে চায় প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষে। একচেটে ক্ষমতা হলো গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

এর প্রতিকার হচ্ছে ক্ষমতার বিক্ষেপণ (diffusion), অর্থাৎ অধিকতর সমভাবে তার বণ্টন।

আজকাল অন্যান্য এত সব দেশের মতো অস্ট্রেলিয়ায়ও দেখা গেছে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছোট ছোট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রাস করে ফেলার ব্যাপার; এর গতি হচ্ছে ক্রমশঃ সংখ্যায় কম আর আয়তনে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা। তার দরুণ অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদল গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচিত করেছে ব্যবসায়ে নাবতে। অস্ট্রেলিয়ার মহামন্ত্রী (Prime Minister), শ্রমিকদলের সদস্য তিনি, বলেছেন, "আমার মতে এখানে দু'রকম ব্যবস্থারই ঠাঁই আছে।"

অবাধ কর্মোদ্যম-ব্যবস্থায় (free enterprise) ব্যক্তিগত শ্রমশিল্প সময়বিশেষে স্বল্প কয়েকটি ব্যবসায়সঙ্ঘের মধ্যে এত বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে যে, তার ফলে হয়ে থাকে প্রতিযোগিতার শ্বাসরোধ। যখন গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যক্তিগত মূলধন দুই-ই থাকে শ্রমশিল্পে লিপ্ত, প্রতিযোগিতা সম্ভবপর হতে পারে শুধু তখনই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্তমান জাতীয়করণের বিষয়সূচীর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে কয়লাশিল্প, রেলপথ ও রাজপথের যানবাহন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, আর তার ও বেতারে সংবাদাদি আদান প্রদানের ব্যবস্থা; বস্তুতঃ সর্বসাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ। এই সব কাজে নিযুক্ত আছে শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের শতকরা মোটামুটি ১০ ভাগ লোক। অবশিষ্ট ৯০ ভাগ এর পরও নিযুক্ত থাকবে বে-সরকারী কাজ-কারবারে।

একেই বলে মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy)। বিস্তর

গণতান্ত্রিক দেশে এই হয়ে উঠতে পারে নববিধান। মিশ্র অর্থনীতি হচ্ছে বে-সরকারী ধনতন্ত্র আর সরকারী ধনতন্ত্রের সমন্বয়।

আণবিক বোমা তৈরি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট আর বে-সরকারী শ্রমশিল্পের নিবিড় সহযোগের ফলে। বে-সরকারী প্রয়োজনে আণবিক শক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণাও এইভাবে চলেছে কয়েকটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে। আণবিক শক্তি সামরিক ব্যাপারের সঙ্গে এমনই নিবিড় ভাবে যুক্ত এবং বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রেও এমনই এক দুর্জয় ব্যাপার যে, এর নিয়ন্ত্রণে সরকারের যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকা উচিত। ভবিষ্যতে সরকারই হয়তো হবেন আণবিক শক্তির মূল—বস্তুতঃ একমাত্র—উৎস। আণবিক শক্তির কল্যাণে পণ্য-উৎপাদন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হতে পারে—উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কয়লা উত্তোলন বন্ধ হওয়ার কথা।

সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আণবিক শক্তি উৎপন্ন করে, সরকার তা' সরবরাহ করবেন বে-সরকারী ধনতান্ত্রিক কারখানাগুলোতে। সেই হবে মিশ্র অর্থনীতি। আধুনিক বিজ্ঞান রূপ দান করেছে ধনতন্ত্রের। অতি-আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে পারে ধনতন্ত্রকে।

মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকানা আর সে সব কার্যে প্রয়োগের অধিকার শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

আর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই ভাগাভাগি হয়ে থাকবে না; মালিকানা আর প্রয়োগ বিভক্ত হয়ে পড়বে কেন্দ্রীয় সরকার, উপরাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার, জেলা-সরকার, নগর-সরকার, সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ, বে-সরকারী ব্যবসায়সমূহ, আর বে-সরকারী জনগণের মধ্যে।

অর্থনৈতিক শক্তির এরূপ সম্প্রসারণ রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করবে, বহুজনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে ব্যক্তিগত কর্মপ্রেরণা আর ক্রিয়াশীলতা; অন্য ভাষায় এর ফলে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের দ্বারা সুরক্ষিত রাজনৈতিক গণতন্ত্র।

মিশ্র অর্থনীতির একটি প্রধান গুণ হবে এই যে, তাতে করে সরকারের সঙ্গে সহযোগে বে-সরকারী ব্যবসায় স্বেচ্ছায় সর্ব-বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। পরিকল্পনা করতে হয় পরিবারকে, পরিকল্পনা করতে হয় পাঠশালাকে, পরিকল্পনা করতে হয় কারখানার মালিককে। তবুও পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ের মধ্যে। পূর্বে সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল যে, অর্থনীতির বিবিধ শাখা-প্রশাখার মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ বা পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন নেই; পণ্যমূল্য আর চাহিদা ও যোগানদারির মধ্যে দিয়ে আপনা থেকেই এ সব ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু শুধু একবার বর্তমান বিশৃঙ্খলা, দেউলিয়াপনা, আর পণ্যসম্ভারের অগ্নিমূল্য ও পণ্যভোগের স্বল্পতা থেকে উদ্ভূত নানা ধর্মঘটের দিকে দৃষ্টিপাত

করলেই বেশ উপলব্ধি করতে পারা যায় যে, আপনা থেকে যে নিয়ন্ত্রণ ঘটতে পারে তার জন্যে প্রায়ই দিতে হয় অসম্ভব রকমের উচ্চমূল্য, আর বড় কোথাও ঘটেই না আপনা থেকে নিয়ন্ত্রণ।

বে-সরকারী ব্যবসায়ীরা যদি সমগ্র জাতির জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে অগ্রসর হন তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে তাঁদের মধ্যে, নয়তো তাঁরা একচেটে কারবার ফেঁদে ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করে তোলবার মতলব করছেন বলে দোষের ভাগীও হয়ে উঠতে পারেন।

বর্তমানে বিভিন্ন সরকারই নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন নিয়ন্ত্রণের ভার। পণ্যমূল্য হ্রাস, রাজস্ব আদায়ের মধ্যে দিয়ে আয়ের বণ্টন, মজুরির হার নিয়ন্ত্রণ, কাজকর্মে নিয়োগ, এই সব কাজ হয়ে থাকে যেন-তেন-প্রকারেণ—গোলযোগ দেখা দিলে পর। অথচ গোলযোগের সম্ভাবনা গোলযোগ দেখা দেবার আগেই অনুমান করে, অন্ততঃ আংশিক ভাবেও তার প্রতিবিধান করা উচিত।

তাই হবে মিশ্র অর্থনীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনার কাজ।

পরিকল্পনা বলতে বোঝাবে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের হ্রাস আর কোন-একটা জাতির বৈষয়িক জীবনের অসংখ্য দিকের আপনা থেকেই সুশৃঙ্খল গতি।

বতমানে ধনতন্ত্র অন্ধ পরীক্ষা আর মারাত্মক ভ্রমের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অসম্ভব রকমের বিশৃঙ্খলা আর

অরাজকতার মধ্যে কাজ করে চলেছে। আগামী সপ্তাহের বাজারের চেয়ে আগামী সপ্তাহের আবহাওয়া সম্বন্ধে ঢের বেশি ওয়াকিবহাল আমরা। এমন কি রাজনীতিও ব্যবসাবাণিজ্যের চেয়ে অধিকতর সুশৃঙ্খল।

মিশ্র অর্থনীতি শুধু যে শৃঙ্খলাই আনবে তাই নয়, এর ফলে নবপ্রেরণারও সঞ্চার হবে। এতে করে শ্রমিকদের কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে। জোর কাজের সময়, শ্রমিকরা যখন কাজ পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত তখন, তাদের কর্মপ্রচেষ্টা শ্লথ হয়ে আসতে পারে। হয়তো পৃথিবীতে আসছে এখন জোর কাজের সময়। ইউরোপীয় ভূমিভাগ এবং গ্রেট-ব্রিটেনে বর্তমানে রয়েছে যথোপযুক্ত শ্রমশক্তির অভাব।

১৩৪৮-৯ সালে যে কাল-মহামারীর কবলে পড়েছিল ইংল্যাণ্ড তাতে করে সেখানকার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকের মতো লোক নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে শ্রমশক্তির যে ঘাটতি দেখা দেয় তাতে করে ভূমিদাসরা জমি ছেড়ে শহরবাজারে ছড়িয়ে পড়তে পারে, আর তাই তারা সম্ভব করে তোলে শ্রমশিল্প আর ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের প্রসার সাধনকে।

সেই রকম গ্রেট-ব্রিটেনে এখন শ্রমশক্তির যে ঘাটতি দেখা দিয়েছে তার দরুন প্রয়োজন হয়েছে বে-সরকারী ব্যবসায়ীরা আজ অবধি শ্রমশিল্পে যে পরিমাণে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ আর শৃঙ্খলাবদ্ধ উৎপাদন-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে প্রস্তুত তার চেয়ে অধিকতর পরিমাণে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ আর শৃঙ্খলাবদ্ধ

উৎপাদনপদ্ধতির প্রবর্তন। এইভাবেই মানবিক কর্মশক্তির ঘাটতি ইংল্যাণ্ডে সমাজতন্ত্রের একটি অনুকূল শক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে।

যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকে আর আমলাতন্ত্রের যদি অতি-বাড় না বাড়ে তবে জোর কাজের সময় বে-সরকারী ব্যবসায়ের চেয়ে রাষ্ট্রীয় কারবারে উৎপাদন বেশি হতে পারে, কেন না শ্রমিকের মনে এই ভাব আসতে পারে যে, সে কাজ করছে তার নিজের জন্যে, তার সমাজের জন্যে।

মিশ্র অর্থনীতি, শেষে, হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সহায়।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রে নির্বাহী (executive), ব্যবস্থাপক (legislative), আর বিচার (judiciary) বিভাগ পরস্পরকে সংযত করে সাম্য রক্ষা করছে পরস্পরের মধ্যে। এই ত্রিভুজটিই হলো স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও চাই সংযম ও সাম্য রক্ষার এইরূপ কোন ব্যবস্থা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বর্তমানে এইরূপ একটি ত্রিভুজ হচ্ছে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুঁজি-পতিদের আর ট্রেড-য়ুনিয়নগুলোর নিয়ন্ত্রণ, আর এই সব ট্রেড-য়ুনিয়ন কর্তৃক পুঁজিপতিদের বিরোধিতা। বিস্তর উপযোগিতা রয়েছে এ ব্যবস্থার। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পারস্পারিক সাম্য ও সংযমের ব্যবস্থা সম্ভবতঃ আরও সহজে, আরও নিয়মিত ভাবে, কার্যকরী হতে পারে যদি উৎপাদন ও বণ্টনের ভার ভাগাভাগি করে দেওয়া যায় দেশের সরকার, দেশের বিভিন্ন

বে-সরকারী পুঁজিপতি, আর নানারূপ সমবায়-প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে।

ক্ষমতালিপ্সা থেকে যে সমস্যার উদ্ভব, একচেটে কারবার ভাঙবার আর অধিকতর প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের জন্যে মিশ্র-অর্থনীতির প্রয়োগ হচ্ছে সে সমস্যা সমাধানের একটি উপায় মাত্র। এ-ই যথেষ্ট নয়। আরও একটি পন্থা অবলম্বন করা উচিত : কারও হাতেই যেন অতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে না পারে। বহু পথ আছে।

ভারতবর্ষে দুঃস্থ চাষীকে অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার দেয় মহাজন। তার ফলে প্রায়ই চাষীকে আজীবন ভূমিদাসের মতো বাঁধা পড়ে থাকতে হয় মহাজনের কাছে। ভূমিব্যাঙ্ক, কি পারস্পরিক সাহায্যের জন্যে নিজেদের মধ্যে কোন রকমের লগ্নী-কারবারের প্রতিষ্ঠান থাকলে অধমর্ণের উপর উত্তমর্ণের এ হেন প্রভাব আর থাকবে না।

পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন দেশের মধ্যে পাসপোর্ট, ভিসা প্রভৃতির ব্যবহার উঠিয়ে দিলে, পর্যটকদের বিলম্ব করিয়ে দেওয়া, বাধা দেওয়া, আর বিরক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যায় কন্সালীয় (consular) আমলাকুলকে।

লিঞ্চিং-এর ফলে বৎসরে বৎসরে শুধু একজন, কি ছয়জন, কি দশজন, করে নিগ্রোই প্রাণ হারায় না। এর ফলে আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে থাকে লক্ষ লক্ষ নিগ্রো, তাতে করেই তাদের কাগজে-লেখা স্বাধীনতা পর্যবসিত হয় এক প্রচণ্ড কৌতুকে। আইনের

শাসনে লোপ পাবে নিগ্রোদের 'পরে শ্বেতকায় বর্বরদের ঐ আধিপত্য।

জন্মশাসনের ফলে স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিতে পারেন জনকজননীরা।

একজন ব্যবসায়ী হয়তো শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন কিছু টাকা, নয়তো শুধু জুতো বেচেই লাল হয়ে উঠেছেন তিনি, যদি কোন-একটা শহরের যে একখানা কি দু'খানা স্থানীয় সংবাদ-পত্র রয়েছে তার আর সেই শহরের বেতারকেন্দ্রের স্বত্বাধিকার লাভ হয় তাঁর তবে অনায়াসে সহস্র সহস্র লোকের মনোরাজ্যে কর্তৃত্ব করতে থাকেন তিনি। প্রয়োজন আছে প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগিতা যে ক্ষেত্রে একান্তই অসম্ভব, স্বত্বাধিকারীর সেক্ষেত্রে থাকা চাই বিশেষ প্রকারের এক সামাজিক দায়িত্ববোধ যাতে করে কোন-একটা প্রশ্নের প্রত্যেকটি দিকই সততার সঙ্গে পাঠকমহলে উপস্থাপিত করেন তিনি।

প্রত্যেকটি পরিবারের পক্ষেই একখানা হাওয়াগাড়ী থাকার চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন একখানি করে গৃহাবাস থাকার। যদি প্রত্যেকটি পরিবারেরই থাকতো একখানি করে ভদ্রাসন কিংবা কোন নাগরিক সমবায়-সমিতির অধীন একখানি বাসগৃহ, তবে বাড়ীওয়ালাদের অন্যায় অত্যাচারের বিষদাঁত যেত ভেঙে। ঠিক এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকটি নগর যেখানে অবস্থিত সে জমির স্বত্বাধিকার নগরেরই থাকা ভালো।

যাতে করে কোন ট্রেড-য়ুনিয়ন একটা সমগ্র জাতির

জীবনযাত্রা অচল করে তুলতে না পারে সেজন্যে মজুরির অনুপাত নির্ধারণ, কাজকর্মের বিধিব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, যানবাহন এবং এই রকমের যাবতীয় একচেটে কি প্রায়-একচেটে কাজকারবার নিয়ন্ত্রণের জন্যে চাই একটা সুসভ্য বিধান,—এসব হচ্ছে বাস্তবিকই জনকল্যাণকর কাজকারবার। এতে করে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের পরিমাণ হ্রাস ঘটবে।

চাষের জমি হওয়া চাই বাতাসের মতো সুলভ। এর বিকিকিনি চলবে না। সাধারণের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে সমাজই জমি কাজে লাগাবার শক্তির অনুপাতে তা' দেবে প্রত্যেকটি পরিবার এবং ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে। প্রত্যেকটি লোকের হাতে কী পরিমাণ জমি থাকতে পারে তা' যথাযথ ভাবে স্থির করে দিতে হবে। যারা পৃথিবীর আহার্য আর শ্রমশিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করে থাকে সেই সব নরনারী বালকবালিকার ওপর থেকে এ ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব লোপ পাবে অনুৎপাদক ভূস্বামীদের।

কাজকর্মের মান উন্নত হলে আর তার সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা আর বেকার অবস্থার জন্যে খেসারৎ দেবার ব্যবস্থা থাকলে, যারা মজুরি কি বেতনের জন্যে কাজ করে থাকে তাদের পক্ষে কাজকর্মের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে দরদস্তুর করা হয়ে ওঠে ঢের সহজ। তাতে করে মনিবদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয়ে থাকে ঢের বেশি স্বাধীন।

যে সব রাজনৈতিক দল বিভিন্ন পদের জন্যে প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করতে পারে তাদের হাতে রয়েছে অসম্ভব রকমের ক্ষমতা; গণতন্ত্রকে ব্যাহত করে তারা। সর্বসাধারণ রাজনীতিতে অধিকতর অংশ গ্রহণ করতে থাকলে এ সব দলের ক্ষমতা খর্ব হয়ে থাকে।

যারা ভোট দেবে, কি যারা হবে পদপ্রার্থী, তাদের যদি নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হয়, কি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি থাকা দরকার হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে, তবে অতিরিক্ত ক্ষমতা এসে কেন্দ্রীভূত হয় মুষ্টিমেয়ের হাতে। গণতন্ত্রের এই সব বাধা-বিপত্তি দূর হতে পারে জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠলে।

খনির কাজে নিযুক্ত কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানই যদি হয় খনি-শ্রমিকদের আবাস আর পণ্যভাণ্ডারের মালিক, তবে শ্রমিকদের জীবনমরণ নির্ধারণের ক্ষমতা লাভ করে থাকে সে প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর প্রতিবিধানও সম্ভবপর।

শিক্ষালাভ যখন হচ্ছে একটা ব্যয়সাপেক্ষ অধিকার তখন সামান্য যে কয়জন তা' লাভ করতে পারে, যারা তা' পারে না তাদের উপর সে কয়জন পেয়ে থাকে এক মারাত্মক সুযোগ। এ ভাবে ক্ষমতালাভের যে সুযোগ রয়েছে তা' হ্রাস করবার জন্যে চাই সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন।

অনুরূপ ভাবে বিত্তের সমতা মূলোচ্ছেদ করবে বর্তমানে বিত্তের মধ্যে যে ক্ষমতার বীজ সংগুপ্ত রয়েছে তার। বিত্তের সমতার আদর্শে পৌঁছুতে এখন ঢের দেরি। কিন্তু বিভিন্ন

ব্যক্তির মধ্যে ক্রমশঃ সমতা প্রবর্তনের চেষ্টা হতে থাকলে, ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের পথ খুলে যাবে।

তবুও বিত্তের সমতা যদিই বা কখনও আসে, ক্ষমতার সমতা আসবে না কখনই। পৃথিবীতে সর্বদাই থাকবে কর্মচারী আর সাধারণ লোকের পার্থক্য, পদস্থ আর অধস্তন কর্মচারীর মধ্যে প্রভেদ। কে কী ভাবে ব্যবহার করে তা' কতকটা নির্ভর করবে উপযুক্ত আইনকানুন আর পরস্পরকে সংযত রেখে সাম্য রক্ষা করার ব্যবস্থার উপর। তবুও থাকবে অপকর্ম সাধন আর শক্তি অপব্যবহারের অবসর, আর সেইজন্যেই সব কিছুরই শেষকথা হলো ব্যক্তি এবং জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র।

জবরদস্ত মনিব হবার সাধ যার তার সে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পথ খুঁজে নেয় সে ; পরিবারের মধ্যে, পাঠশালা-গৃহে, আপিসে কারখানায়, সরকারী কাজে, সর্বত্রই এ সুযোগ সে পেয়ে থাকে। তার প্রয়োজন হচ্ছে চিকিৎসার, আরশীর মধ্যে তাকিয়ে, আর যাদের 'পরে অত্যাচার করে থাকে সে তাদের মুখ চেয়ে, নিজের চিকিৎসা তার নিজেরই করা ভালো। এই রকমই চলতি ধারা আর চিরাচরিত প্রথা যদি উৎকোচ গ্রহণ, জনস্বার্থের হানি, আত্মীয়-পোষণ, কর্মকুশলতার অনিবার্য ক্ষতি সত্ত্বেও প্রিয়জনের প্রতি পক্ষপাত, এবং জনস্বার্থ-হানিকর অন্যান্য নানা রকমের দুর্নীতিকে ক্ষমার চোখে দেখে থাকে, তবে কষ্টভোগ করতে হয় সমাজকে, তা' হয়ে থাক না কেন যে রকমেরই আইনকানুন পাশ।

সামাজিক অন্যায়-অবিচারের প্রতিকারের জন্যে অর্থ নৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, আর আইনগত যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে সে সব উপায়ের সম্পূর্ণতা বিধান করতে হয় ব্যক্তিকে আপন চরিত্রবলের 'পরে কাজ করে, আর সমাজকে উচ্চতর নৈতিক মানদণ্ড খাড়া করে।

বিধানের মূল্য আছে। স্বৈরতন্ত্রে গান্ধীর মতো লোকেরও বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। বাঁধা পথের বাইরে ব্যক্তির সৎপ্রচেষ্টাকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে থাকে স্বৈরতন্ত্র, এবং সচরাচর সাফল্যও লাভ করে থাকে তাতে। স্বৈরতন্ত্রের ভয়েতেই প্রত্যেকে মেনে চলে অধর্মাচারের একটা আদর্শকে।

পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই রয়েছে প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র, তার মধ্যে তার গুণাগুণ যথেষ্ট কার্যকর হয়ে থাকে।

এককালে লোকে মনে করত যে, ব্যক্তিগত ধনতন্ত্রের অবসান ঘটলে আপনা থেকেই হবে সন্নীতির উদ্ভব। এ মতবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম যুক্তি হচ্ছে সোবিয়েৎ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। সোবিয়েৎ সমাজ হচ্ছে স্পষ্টতঃই দুর্নীতিপরায়ণ। ভি. কাবেরিন (V. Kaverin) প্রণীত ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'অজ্ঞাত শিল্পী' (Unknown Artist) নামে উপন্যাসখানার একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, "সন্নীতি? কথাটা চিন্তা করে দেখবারও অবকাশ নেই আমার। ব্যস্ত আমি। গড়ে তুলছি সমাজতন্ত্র। তবে যদি আমায় সন্নীতি আর একজোড়া

পাজামার মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয় তবে বেছে নেব আমি পাজামাই।” পা-জামার ঘাটতি দেখা দিয়েছে বলেই যে সে পাজামাটাই বেছে নেবে তা’ নয়, পাজামা বেছে নেবে সে এইজন্যে যে সন্নীতির মূল্য খুবই কম। মিথ্যাচার যেখানে হলো অন্যতম সরকারী অস্ত্র, আর আতঙ্কের দরুন যে-কোন-মূল্যে নিরাপদ থাকাটাই যেখানে হচ্ছে দামী কাজ, সন্নীতি সেখানে মূল্যবান বিবেচিত হবে কী করে ?

সোবিয়েৎ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা অবশ্য চূড়ান্ত কথা নয়। কিন্তু এ হচ্ছে এক বিপৎসঙ্কেত—বিশেষতঃ যে সব কম্যুনিস্ট রুশীয় লোক নয় তাদের ক্রিয়াকলাপ লোকে যখন দেখছে তখন, এদের মস্কৌএর গুরুকুলের চেয়ে কম অধর্মাচারী নয় এরা। মহামতি পিটার (রুশীয় জাতীয়তা) কর্তৃক দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে কার্ল মার্ক্স্ (সমাজতন্ত্র) হয়ে উঠেছেন বিকৃতির এক অবতার। গান্ধীর সহযোগে মার্ক্স্ হয়তো ফলপ্রসূতার সূচনা করে যেতে পারেন। অর্থনৈতিক সংস্কার আর বিপ্লবই যথেষ্ট নয়। সুলভ জীবন, মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি ঔদাসীন্য, অসাধুতা, এই সব হোলো ডিক্টেটরদের উপজীব্য। এ সব ব্যাপারের বিরুদ্ধাচরণ করাই হচ্ছে ডিক্টেটরতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ। গণতান্ত্রিক জীবনে মানুষের প্রাণ, স্বাধীনতা, আর সত্যের মর্যাদা উপলব্ধি করতে শিখলে, মানবিক দয়ামায়া, বিনয় আর ভ্রাতৃত্ব অভ্যাস করতে শিখলে, গণতান্ত্রিক দেশের শিশু আর বয়স্ক লোকেরা সামগ্রিকতন্ত্রের দুর্নীতিমূলক ভাবধারা গ্রহণে বিশেষ

তৎপর বোধ করবে না। সমাজতান্ত্রিকতার চূড়ান্ত ঘটলেও মানুষ ফুল কি সূর্যাস্তের শোভাকে ভালোবাসতে শিখবে না, জীবজন্তুর প্রতিও মমত্ব বোধ করতে পারবে না। তেম্নি শাসন-ব্যবস্থা কি অর্থনৈতিক বিধানের কোনরূপ পরিবর্তনই সত্বর মানবজাতির প্রতি প্রীতির ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে না।

শাসনতন্ত্র আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে থাকে এ সব যাঁরা চালিয়ে থাকেন তাঁদের চরিত্র, আর জনগণ কতটা সজাগ, তার উপর। তেইশ শ' বৎসর আগে ঠিক এই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন প্লেটো যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, "যতদিন জ্ঞানের প্রকৃত সাধকরা এসে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত না করেন, কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীরা, কোনরূপ ঐশী প্রেরণার বশে, জ্ঞানসাধনায় সত্য সত্যই না নিযুক্ত হন, ততদিন কিছুতেই মানবজাতির দুর্দশা মোচন ঘটবে না।"

গণতন্ত্রের চারধারে যে বিপজ্জাল ঘনিয়ে এসেছে তা' থেকে একে উদ্ধার করা হচ্ছে মূলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নৈতিক দায়িত্ব, এ দায়িত্ব নিজের মধ্যেই জাগাতে হবে প্রত্যেককে। শান্তি আর গণতন্ত্র, দানধর্মের মতোই, প্রথম দেখা দেয় স্বগৃহে, মানুষের অন্তরের মধ্যে।

শাসনযন্ত্র আর অর্থনৈতিক সংবিধান সম্বন্ধে যে কথা, ধর্ম আর ধর্মসঙ্ঘ (church) সম্বন্ধেও তাই ; এ সবও হচ্ছে যাদের হাতে এ সব পরিচালনার ভার তাদেরই মতো নৈতিক ধর্মের

আধার। মহাত্মা গান্ধী, যিনি হলেন একান্তই ধর্মপরায়ণ, যাঁর সন্নীতি, দর্শন, এবং জীবনধারার একমাত্র উৎস প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তাঁর ধর্মজ্ঞান, তিনি বলেন, "কোন ধর্মেই আমি বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করিনি। পৃথিবীর এই সব ধর্ম যদি উন্নতিশীল হতো তবে পৃথিবী আজ যে কষাইখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা' হতো না।" রুশিয়ার সনাতন গ্রীক চার্চ (Greek Orthodox Church) 'ভগবৎপ্রেরিত' বলে ঘোষণা করেছে স্তালিনকে। উদগ্র স্বজাতিপ্রেমিক রূপে হিটলারকে সমর্থন করার সময় সকল সম্প্রদায়ের জার্মানরাই বিস্মৃত হয়ে বসে ছিল তাদের খৃষ্টধর্মকে। ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোকে সহায়তা দান করেন এবং এখনও করছেন ক্যাথলিক চার্চের একজন নেতৃস্থানীয় প্রজা ফ্রান্সিস ম্যাকমোহন ১৯৩৭ সালের ৩০শে এপ্রিলের নিউ ইয়র্ক পোস্ট পত্রিকায় লিখে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তদনুসারে, স্পেনে ক্যাথলিক চার্চকে "ঠিক ততটুকু স্বাধীনতাই দেওয়া হয় যতটুকু হচ্ছে ডিক্টেটর প্রভুর স্বার্থের অনুকূল।" ইতালীর ক্যাথলিক পুরোহিতরা বলপূর্ব্বক ইথিয়োপিয়া অধিকারে সক্রিয় সাহায্য দান করেছিলেন মুসোলিনিকে ; এ কাজের জন্যে তাল তাল সোনা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন তাঁরা।

ক্ষমতার পাপাচার উচ্ছেদের জন্যে তার বিরুদ্ধতা করার পরিবর্তে, ক্ষমতা যাদের করায়ত্ত তাদের সঙ্গে আপোষ করতে অতিমাত্রায় প্রস্তুত হয়ে রয়েছে যত ধর্ম।

সন্নীতিপরায়ণ আর গণতান্ত্রিক ছিলেন খৃষ্ট। কয়জন খৃষ্টান

অনুসরণ করে থাকে খৃষ্টকে? হিন্দুত্বের মধ্যে বর্ণাশ্রম হলো কুনীতি আর গণতন্ত্রের বিরোধী। কয়জন হিন্দু গান্ধীর অনুসরণে তার বিরুদ্ধে লড়ছে? ইসলামের শিক্ষা হলো ভ্রাতৃত্ব; অত্যন্ত গণতান্ত্রিক ধর্ম ইসলাম। কিন্তু কতটা গণতান্ত্রিক মিশর, ইরাক, ট্রান্সজর্ডন, ইরান, কিংবা সৌদী আরব? ইহুদীধর্মে রয়েছে উচ্চ নীতিধর্মের বাণী। কয়জন ইহুদী তার অনুসরণ করে থাকে?

অতিরিক্ত ক্ষমতা আর এককেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের বাস্তব প্রচেষ্টাই সকল ধর্মসঙ্ঘকে নীতিধর্মে মণ্ডিত করে তোলে।

একাদশ অধ্যায়

জগতে রুশীয় প্রতাপের উৎস কোথায় ?

পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি-সমস্যা হলো রুশিয়া। জগতে সব চেয়ে প্রতাপশালী ব্যক্তি হলেন স্তালিন। ক্ষমতালোভী পুরুষ তিনি, ক্ষমতালাভের কৌশল সম্পূর্ণ করায়ত্ত তাঁর। স্বেচ্ছায় প্রচণ্ড ক্ষমতা গ্রাস করেন তিনি স্বদেশে, তারপর বিদেশেও প্রচণ্ড ক্ষমতা অধিকার করে বসেছেন তিনি।

কী করে আমেরিকা তথা সমগ্র গণতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে আজ সোবিয়েৎ য়ুনিয়ন ? সোবিয়েৎ সরকার জনগণের জন্যে না করতে পেরেছে যথোপযুক্ত খাদ্যভাণ্ডারের ব্যবস্থা, না দিয়েছে তাদের যথোপযুক্ত স্বাধীনতা। সামরিক শক্তিতে আমেরিকার চেয়ে রুশিয়া হচ্ছে দুর্বলতর। স্পষ্টতঃই স্বাধীনতা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। তবুও কী করে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে কমুনিস্টরা ?

পৃথিবীময় রুশিয়ার প্রতাপ আর কমুনিস্টদের প্রভাবের উৎস কোথায় ?

কিছুকাল পূর্বে পারী নগরীতে যখন শান্তি-সম্মিলনের বৈঠক বসেছিল তখন একদিন এক বুড়ো নাপিত আমার চুল ছাঁটাই শেষ

করলে পর নির্বোধের মতো আমি তাকে বললুম একটু জলপাই তেল আমার মাথায় ডলে দিতে।

"জলপাইয়ের তেল!" অবাক হয়ে বল্লে সে, "মাথায় আপনার! আমরা যে তা' পেটে খাবার জন্যেও পাইনে।" অবস্থা বিপর্যয়ের জন্যে দুঃখ করতে লাগল সে, বল্লে, "এর পরের বার কম্যুনিস্টদের ভোট দিচ্ছি আমি। আর সবাই চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। এবার কম্যুনিস্টদের পরখ করে দেখব। তারা বলে তারা এর সুরাহা করতে পারে।"

আমার সে নাপিতটি কম্যুনিস্ট ছিল না, কিন্তু দুরবস্থার ফলে ধনতন্ত্রে আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল সে। তার ক্ষতি হবার ভয়ও বিশেষ কিছুই ছিল না আর। ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা পাড়লাম আমি। "বাঃ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা!" মন্তব্য করে উঠল সে, "কাজ আমি সব সময়ই পাব। নাৎসীদের অধীনেও চালিয়ে এসেছি আমি।" ফরাসী কম্যুনিস্ট দলের পক্ষে একটি ভোটের এই হলো যথাযথ কারণ-নির্দেশ। তবে একা তারই এরূপ মনোভাব ছিল না।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে আমি ছিলাম যেরুজালেমে। নাৎসী মার্শাল রোমেল তখন এগিয়ে চলেছিলেন সুয়েজ-খাল আর কায়রোর দিকে। তিনি যদি সাফল্য লাভ করতে পারতেন, তা' হলে যুদ্ধের গতি ফিরে যেত অক্ষশক্তি-বিরোধী মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে। যেরুজালেমের আরব নেতারা আমায় বলেছিলেন যে, প্যালেস্টাইনের আরবরা রোমেলের অগ্রগতির আশায় রয়েছেন

পথ চেয়ে এবং তাঁকে সংবর্ধনা করবার জন্যেও প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা। কারণ? কারণ আরবরা ছিল ব্রিটিশ-বিদ্বেষী; নাৎসীরা যুদ্ধ করছিল ব্রিটিশের বিপক্ষে; তাই আরবরা হয়ে উঠেছিল নাৎসীদের অনুরাগী।

১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমি আবার যাই যেরুজালেমে। একজন বিখ্যাত আরব মহিলা স্কোপাস পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত তাঁর বাড়ীতে আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন। জনকয়েক তরুণ আরব-নেতাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন আরব বল্লেন, "ব্রিটিশরা যদি এখানে ইহুদীদের অনুকূল কোনও মীমাংসা করে, তবে রুশিয়ার মুখাপেক্ষী হতে হবে আরবদের।" আর একজন আরব মন্তব্য করলেন, 'রুশিয়ার কাছে মুক্তি ভিক্ষা করা হচ্ছে ডুবে মরা থেকে উদ্ধার লাভের আশায় হাঙ্গরকে জড়িয়ে ধরায় শামিল।" তবুও আরবদের মধ্যে মস্কো-এর সঙ্গে প্রেমের খেলা করে থাকেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র নয়। সঙ্কেতসূত্র সেই একইঃ আরবরা বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে ব্রিটিশদের প্রতি; রুশিয়া চায় মধ্যপ্রাচ্য থেকে ব্রিটিশদের বহিষ্কার; অতএব আরবদের অনেকে হচ্ছে রুশদের অনুরক্ত।

চারদিকে যখন অন্ধকার তখন তুমি চাইবে পরিবর্তন—তা' কেমনতর সে পরিবর্তন সে বিষয়ে কোনরূপ পরিষ্কার ধারণা তোমার থাকুক, আর না-ই থাকুক। অতৃপ্ত কি উৎপীড়িত

ব্যক্তিরা সুখশান্তি বলতে বুঝে থাকে বর্তমান অবস্থার বিপরীত অবস্থাকে।

কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর পক্ষে যে প্রচারকার্য হয়ে থাকে তার বীজ প্রায়ই উপ্ত হয় দীর্ঘকালের দৈন্য ও উৎপীড়নে উর্বর ভূমিতে। রুশীয় ব্যবস্থাকে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে এই যুক্তিতে যে, তা' বড় বড় ভূস্বামী আর বে-সরকারী ধনিকের উচ্ছেদ সাধন করে, তার পরিবর্তে প্রবর্তন করেছে রাষ্ট্রীয় স্বত্বাধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। যে দেশ থেকে গায়ের হাড়মাস খুবলে-খাওয়া খাজনা-আদায়কারী আর জুয়াড়ী ব্যবসাদারকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে, সে দেশের কল্পকথায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে ক্ষুৎপীড়িত চীনা ভাগচাষী; সোবিয়েৎ জীবনযাত্রার মানদণ্ড সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই জাগে না তার মনে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও উৎকণ্ঠিত নয় সে।

তা' ছাড়া এশিয়া আর আফ্রিকার লোকেদের কাছে রুশিয়াকে চিত্রিত করা হয় দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ উপনিবেশ-সমূহের পক্ষসমর্থক রূপে। অথচ নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, রুশিয়া নিজেই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে থাকে বিদেশী জাতিদের। মাঞ্চুরিয়া লুণ্ঠন করেছে সে। নৌবহরের একটি কেন্দ্ররূপে পোর্ট আর্থার অধিকার করে বসায় এবং অন্যতম বন্দর হিসাবে ডায়রেনকে অংশতঃ নিজ আয়ত্তে রাখায় সে করেছে জারতন্ত্রের কর্মনীতিরই অনুসরণ। লাল ফৌজ যখন ইরানে ছিল তখন ইরানীয় সরকারের কাছ থেকে তৈল সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা

আদায় করার ব্যাপারেও সে সেই জারতন্ত্রের কর্মনীতিরই অনুসরণ করেছে। দার্দানেলিসের যৌথ রক্ষা-ব্যবস্থা দাবি করেও সে করেছে সেই জারতন্ত্রের কর্মনীতির অনুসরণ।

কিন্তু এ সব তথ্য হচ্ছে নতুন, প্রচারকারীরা চেপেই যান এ সব কথা। জোর দেওয়া হয় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব আর্নস্ট বেভিনের সঙ্গে বিশিনস্কির বিতর্কের উপর—সে বিতর্কে ইন্দোনেশিয়ার বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল রুশিয়া। জোর দেওয়া হয় দক্ষিণ-আফ্রিকার জিম ক্রো হরিজনাবাসের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের দরবারে ভারতীয় প্রস্তাবের পক্ষে পররাষ্ট্র-সচিব মোলোতোবের সমর্থনের উপর।

প্রাচ্যের অগণিত জনগণ অবস্থাটাকে দেখে থাকে যার-পর-নাই সহজ ও সরল রূপে: বিদেশীদের সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি চায় তারা। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী হলো গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, আর পোর্তুগাল। আমেরিকা নিয়ে থাকে ইংল্যাণ্ডের পক্ষ। রুশিয়া করে থাকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ। তাই উপনিবেশবাসীরা মৈত্রীর চোখে দেখে থাকে রুশিয়াকে।

এশিয়া পরিদর্শনকারীর চোখে পড়ে শ্বেতজাতি আর পাশ্চাত্ত্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান বৈরিভাব। কুৎসিত, অসভ্য, এ জাতিবিদ্বেষ। আধুনিক মানুষ যে এক অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে, এ হলো তারই একটি লক্ষণ; কঠিন হবে সে অতল থেকে মুক্তিলাভ। এ হচ্ছে নাৎসীদের পরজাতি-বিদ্বেষ আর যুক্তরাষ্ট্রীয়

বর্বরকুলের 'শ্বেতাভিজাত্যের' অনুরূপ মনোভাব—গান্ধীর শিক্ষাদীক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বর্তমান সঙ্কটকালের এক চরম সঙ্কটময় লক্ষণ এটা।

ভারতবর্ষে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারিয়ারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। ভারত-সরকারের অন্যতম সদস্য তিনি, গান্ধীর পুরাতন বন্ধু, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি বল্লেন, "জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ই আমেরিকার হাতে ছিল আণবিক বোমা। কিন্তু জার্মানদের 'পরে আমেরিকা নিক্ষেপ করেনি সে বোমা, কারণ জার্মানরা হচ্ছে শ্বেতজাতি। আমেরিকা তা' নিক্ষেপ করলে জাপানীদের 'পরে, কেন না তারা হচ্ছে অ-শ্বেত জাতি।" এ অভিমত থেকে কোন মতেই বিচ্যুত করা গেল না তাঁকে। এশিয়ায় এই একই অভিমত বহুবার শুনতে হয়েছে আমায়। সত্য নয় এ কথা। হিটলারের পরাভবের পূর্বে আণবিক বোমা ছিল না আমেরিকার হাতে। ভিত্তিহীন ছিল রাজাগোপালাচারিয়ার অভিমত। তবুও এর ভিত্তি হলো এই অভিজ্ঞতা যে, শ্বেতজাতিরা বিভেদের দৃষ্টিতে দেখে থাকে অ-শ্বেত জাতিদের।

পৃথিবীর ২০০ কোটি নরনারীর মধ্যে প্রায় ১৩০ কোটিই হচ্ছে অশ্বেত জাতি: তার মধ্যে ৪৫ কোটি রয়েছে চীনদেশে: ৪০ কোটি ভারতবর্ষে; অবশিষ্ট জাপান, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, আফ্রিকা প্রভৃতিতে। সমস্বার্থে মোটেই ঐক্যবদ্ধ নয়

তারা ; কিন্তু যে কোনও ক্ষেত্রেই বর্ণবিদ্বেষ-সঞ্জাত উৎপীড়নের সংবাদে বিক্ষুব্ধ বোধ করে থাকে এদের সকলেই।

লিঞ্চিং (গান্ধী প্রথমেই আমাকে যে সব প্রশ্ন করেন তার মধ্যে একটি ছিল এই, "এ বছরে কতটি লিঞ্চিং হয়েছে আমেরিকায় ?") এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো-বিদ্বেষ-গত গোঁড়ামি, আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি আরোপিত বিবিধ বাধানিষেধ এবং শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদ সাধারণতঃ তাদের করে তোলে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি বিরূপ। ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, আর ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনে গুরুত্বময় ভূমিকায় অভিনয় করেছে কম্যুনিস্টরা।

ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি-প্রচেষ্টায় রত প্রাচ্যের উপনিবেশগুলো ; তারই ফলে তাদের মধ্যে উপজাত হয়েছে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধ শিক্ষা ও নির্দেশ গ্রহণের প্রবণতা। বিদেশী বণিকদের শুধু শোষণকারী রূপেই দেখতে পারে উপনিবেশের অধিবাসীরা।

এ সবই হচ্ছে কম্যুনিস্টদের অনুকূল অবস্থা। রক্ষণশীল নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন লিখেছেন, "যে সব অন্যায়-অবিচারের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে কম্যুনিস্টরা সে সব অন্যায়-অবিচার প্রতিকারের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলে পর উদ্বিগ্ন হবার মতো বড়-কিছুই আর থাকবে না কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের।"

এশিয়া চায় খাদ্য আর স্বাধীনতা। ইউরোপ, দীর্ণ ক্ষিন্ন দরিদ্র ও আপৎসঙ্কুল ইউরোপ, তেমনই আজ হাতড়ে মরছে

পুনরভ্যুত্থান আর অস্তিত্বরক্ষার রহস্য-সন্ধানে। প্রতিকার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছে রুশিয়া।

জার্মানীতে বিদেশীদের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনকারী সোবিয়েৎ কর্মচারীদের মধ্যে যিনি প্রধান সেই কর্ণেল তুলপানোব একজন জার্মান রাজনৈতিক নেতাকে বলেছিলেন, "আপনাকে, এবং অন্যান্য সমস্ত জার্মানকে, বেছে নিতে হবে আমেরিকা আর রুশিয়ার মধ্যে একটিকে। আমেরিকা হলো ধনকুবের, অনেক কিছুই দেবার মতো রয়েছে তার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আসছে এক অর্থনৈতিক মন্দা ; আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে পর নীচে টেনে নামাবে তা' আপনাদের—ঠিক যেমনটি ঘটেছিল বহু ইউরোপীয় জাতির ভাগ্যে ১৯২৯ সালে ওয়াল স্ট্রীটের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বসে পড়ার ফলে। আমেরিকার মতো ধনী নয় রুশিয়া। কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির 'পরে আমাদের অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা।"

প্রত্যয় গেলেন না জার্মান নেতা। রুশিয়ার অর্থনৈতিক ভিত্তি যে সুদৃঢ়, কিংবা আমেরিকায় যে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা আসন্ন, এরূপ কোন নিশ্চিত বিশ্বাসে এসে পৌছুতে পারলেন না তিনি। স্বৈরতন্ত্রের হাতে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু ফের চেষ্টা করবে রুশরা। তারা জানে স্থায়িত্বের জন্যে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে ইউরোপ।

কম্যুনিস্টরা এ কথাও বুঝিয়ে দিতে কসুর করে না যে, ইউরোপে এসেছে রুশিয়া স্থায়ী হয়ে বসবে বলে ; আমেরিকা

পারে চলে যেতে। এইজন্তেই কোন কোন ইউরোপীয় আমেরিকার প্রতি তাঁদের সম্প্রীতির কথা মুখ ফুটে ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করে থাকেন; অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁরা জেনে বসে আছেন যে, যদি আমেরিকা চলে যায় তবে এর জন্তে দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে তাঁদের।

কোন একজন রুশ যে উক্তি করে থাকেন জার্মানীতে, বিশ্বের বহু স্থানেই জাগে তার প্রতিধ্বনি। অন্যান্যদের সঙ্গে, চীনের তিয়েন্‌ৎসিন শহরের দৈনিক পত্রিকা তা কুঙ পাও ১৯৪৭ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌-এ বেঞ্জামিন ওয়েল্‌স্‌-প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী, এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, "দশ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯২৯ সালের মন্দার চেয়েও ঢের মারাত্মক রকমের এক মন্দার কবলে গিয়ে পড়বে। তাই যদি ঘটে তবে, এই খবরের কাগজের বিশ্বাস এই যে, যুক্তরাষ্ট্র চলে যেতে পারে জাতিপুঞ্জ ছেড়ে, ত্যাগ করতে পারে মধ্যপ্রাচ্যকে, আর সরে যেতে পারে এশিয়া থেকে।" চীনা কাগজখানার সেই একই প্রবন্ধে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের।

আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জগৎকে বিভ্রান্ত আর দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত করে তোলার যে সোবিয়েৎ পরিকল্পনা, তার সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যায় এ ব্যাপারটি। আর ইত্যবসরে এগিয়ে চলতে থাকে রুশিয়া।

ইউরোপ আর এশিয়ার সঙ্গে রুশিয়ার ভৌগোলিক নৈকট্য,

আর তার জবরদস্তি, এই দু'টি ব্যাপার হচ্ছে তার শক্তির অঙ্গস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ, তুরস্ককে বলেছিল রুশিয়া নিজের দু'টি প্রদেশ রুশিয়াকে ছেড়ে দিতে, আর দার্দানেলিস রক্ষার কাজে বলশেভিক-তন্ত্রের অংশ গ্রহণে সম্মত হতে—এ এমনই একটি ব্যাপার যে তা' হতো তুরস্ককে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করারই শামিল। তবে এ বিষয়ে অবশ্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি রুশিয়া; শুধু দাবিই জানিয়েছিল সে; তুরস্ককে পরিব্যাপ্ত করে নিজের দীর্ঘচ্ছায়া বিস্তার করেছিল সে শুধু। আতঙ্কে নিজেদের সৈন্যশক্তিকে আহ্বান করে বসেছিল তুর্করা, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে আরম্ভ করেছিল সৈন্যদলকে, এরই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে তাদের জাতীয় অর্থনীতির হয়েছিল ভেঙে পড়ার উপক্রম। (এই রকমেরই কাজ করেছিলেন হিটলার অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর ফ্রান্স সম্বন্ধে। এ সব দেশের মধ্যে সৈন্য-পরিচালনা করার পূর্বে ক্রমাগত ভীতি-প্রদর্শনের দ্বারা তাদের হৃদয়কে আতঙ্কে অসাড় করে তুলেছিলেন তিনি।)

এইরূপ সহজ সাফল্যে আত্মহারা হয়ে প্রচারকার্য চালাতে যায় কম্যুনিস্টরা। "গণতান্ত্রিক দেশ নয় তুরস্ক," তারস্বরে ঘোষণা করতে থাকে তারা। "আর্মেনিয়ানদের হত্যা করেছিল তুর্করা। দ্বিতীয় বিশ্বসমর প্রায় শেষ না হওয়া অবধি যুদ্ধে এসে যোগদান করেনি তুর্করা।" এ সব কথাই সম্পূর্ণ সত্য, সরলমতি লোকেরা তাই দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বল্লে যে, সাহায্য-

লাভের যোগ্য নয় তুরস্ক—আর অবিকল এই-ই চেয়েছিল কম্যুনিস্টরা।

১৯১৯ সালে কামাল পাশার (আতাতুর্ক) দ্বারা নব্য তুরস্ক সৃষ্টি-র পর থেকে অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্তও তুরস্ক ছিল একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের শাসনে। সম্প্রতি দ্বিতীয় একটি দলকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বিরোধিতা করার অনুমতি দান করা হয়েছে। তুরস্কের দীর্ঘ একদলীয় জীবনে তুরস্কের সঙ্গে পরম মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল সোবিয়েৎ রুশিয়ার। ১৯২১ আর ১৯২২ সালে আনাতোলিয়ার যুদ্ধে গ্রীস আর ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে রুশিয়ার সাহায্যই রক্ষা করেছিল তুরস্ককে। তারপরে তুর্কদের অর্থনৈতিক উপদেশ আর আর্থিক সাহায্যও দান করেছিল মস্কো। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মিলনে (যথা—১৯২৩ সালে লোজানে) তুরস্কের স্বার্থ সমর্থন করত রুশিয়া—সেই একদলীয় তুরস্কেরই স্বার্থ যেখানে কম্যুনিস্ট ক্রিয়াকলাপ ছিল বে-আইনী আর যেখানে নির্দয় ভাবে উৎপীড়ন করা হতো কম্যুনিস্টদের। আর এখন হঠাৎ ক্রেমলিন আবিষ্কার করে ফেল্লে যে, গণতান্ত্রিক দেশ নয় তুরস্ক।

পরিবর্তন ঘটল কার? পরিবর্তন ঘটল রুশিয়ার। রুশিয়াই জেদ ধরলে যে, তুরস্ককে মেনে নিতে হবে তার দাবি-দাওয়া। গররাজি হয়ে বসল তুরস্ক। তৎক্ষণাৎ রুশিয়া আবিষ্কার করে ফেল্লে যে, গণতান্ত্রিক দেশ নয় তুরস্ক। সঙ্গে

সঙ্গে কম্যুনিস্টরাও আবিষ্কার করে ফেল্লে যে, তুরস্কবাসী আর্মেনীয়দের রুশিয়ায় স্থানান্তরিত করা উচিত।

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তেহেরান শহরে মূল শক্তি-ত্রয়ের (Big Three) মধ্যে যে সব গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের ২৪শে মার্চ ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রীয় দপ্তর (State Department) তার মধ্যে একটি চুক্তি প্রকাশ করেন। সে চুক্তিতে লেখা ছিল এই যে, রুজভেল্ট, চার্চিল, আর স্তালিন এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন যে, "বৎসর শেষ হবার আগেই মিত্রপক্ষে তুরস্কের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত।" এই অ-গণতান্ত্রিক তুরস্ককেই স্বপক্ষে চেয়েছিলেন তাঁরা। আর তাঁরা "মার্শাল স্তালিনের এই বিবৃতিও শ্রবণ করেন যে, যদি তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বাধে, আর তার ফলে বুলগারিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কিংবা তাকে আক্রমণ করে, তা' হলে সোবিয়েৎ তৎক্ষণাৎ বুলগারিয়ায় বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।" স্তালিন রক্ষা করবেন অ-গণতান্ত্রিক তুরস্ককে।

সে সময় যুদ্ধে যোগদান করেনি তুরস্ক। আরও ঢের পরে এসে যোগদান করে সে। এই ব্যাপারটাকেই তুরস্কের বিরুদ্ধে উদ্যত করে রেখেছে রুশ আর কম্যুনিস্টরা। কিন্তু বুলগারিয়া মোটেই যোগদান করেনি মিত্রপক্ষে। বস্তুতঃ বহুকাল যাবৎ হিটলারেরই পক্ষে যুদ্ধ করে এসেছে বুলগারিয়া, আর রুশিয়াকে বুলগারিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এবং বুলগারিয়া আক্রমণ করতেও হয়েছে। তৎসত্ত্বেও, পারী নগরীর ১৯৪৬ সালের শান্তি-

সম্মিলনে রুশিয়া জেদ ধরে বসল যে, পুরাতন শত্রু বুলগারিয়াকে গ্রীসের একাংশ গ্রাস করবার ছাড়পত্র দিতে হবে; অথচ অমিতবিক্রমে এই গ্রীসই বাধা দিয়ে এসেছিল ইতালী আর জার্মানীর আক্রমণ।

কেন? কারণ বুলগারিয়া হচ্ছে রুশিয়ার হাতের পুতুল, আর তুরস্ক তা' হতে চায় না কিছুতেই।

রুশীয় কূটনীতি আর কম্যুনিস্ট চালবাজি, যা' আজ এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে গণতন্ত্রগুলোর, তার অন্তর্নিহিত দুর্নীতির এই হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। রুশিয়ার জাতীয় স্বার্থের স্থান আর সব কিছুর পুরোভাগে। কোন-একটি দেশের প্রতি মস্কো-এর কর্মনীতি সে দেশের রাজনৈতিক স্বরূপের দ্বারা মোটেই নির্ণীত হয় না। হিটলার আর জাপানী রণলিপ্সুদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন স্তালিন; আর্জেন্তিনার ডিক্টেটর পেরোঁর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন স্থাপন করেছিলেন তিনি। রুশিয়ার ভাবাদর্শ (ideology) আর রাজনীতি বিভ্রান্ত করে থাকে অপরকে, সৃষ্টি করে কুহকজাল। সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়া উচিত এ সব জিনিষ। কিন্তু তেমনটি নয় মোটেই। স্তালিনের অধর্মবুদ্ধি (unscru-pulousness) আর কম্যুনিস্টদের অধর্মবুদ্ধি অসংখ্য বিজয় লাভে সহায়তা করেছে রুশিয়াকে।

বাহুবলে পৃথিবী কিংবা একটা মহাদেশও জয় করার মতলব আঁটছেন না সোবিয়েৎ সরকার। দুরূহ কাজ হবে সেটা, হবে নির্বুদ্ধিতার কাজ। কমুনিস্টরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে,

বিশৃঙ্খলাকে আরও জট পাকিয়ে তোলার কাজে, আর হতাশাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে, মস্কো থেকে তারা কিছু কিছু সাহায্য পেলে, বিভিন্ন গণতন্ত্রী দেশই আপনা থেকে সোবিয়েৎ-বহির্ভূত জগৎকে ফেলবে ধ্বংস করে। এ উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে গণতন্ত্রগুলো ইতিমধ্যেই কাজও গুছিয়ে রেখেছে যথেষ্ট।

স্তালিন-হিটলার চুক্তির ফলস্বরূপ রুশিয়া গ্রাস করে বসেছে কার্জন-লাইন অবধি পোল্যাণ্ডের আধখানা, এস্থোনিয়া, লাৎবিয়া, লিথুয়ানিয়া, এবং রুমানিয়ার একাংশ। ফিনল্যাণ্ডের 'পরে হামলার ফলস্বরূপ রুশিয়া গ্রাস করেছে ফিনল্যাণ্ডের একাংশ; রুশিয়ার সামরিক শক্তি আর স্তালিনের সক্রিয় কূটনীতির ফলস্বরূপ, আর বারংবার পাশ্চাত্ত্যের রাজনৈতিক ভ্রান্তির ফলেও বটে, রুশিয়া গ্রাস করে ফেলেছে জার্মান-ভূমি, পোলিশ-ভূমি, চেকোশ্লোভাক-ভূমি, আর জাপ-ভূমি। সব-সমেত দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের দ্বারা অধ্যুষিত প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত ভূমিভাগ।

সোবিয়েৎ কর্তৃক এই সব দেশ গ্রাস করার ব্যাপারটা খণ্ডিত করেছে আটলাণ্টিক শনদকে। মস্কো নিজেই যে সব দেশের সঙ্গে সন্ধি করেছিল, এ সব কাজের অধিকাংশই সে সব সন্ধিকে করেছে খণ্ডিত। জার্মান আর চেকোশ্লোভাক ক্ষেত্র এবং পোল্যাণ্ডের সমৃদ্ধতম অঞ্চল (পূর্ব-গ্যালিসিয়া) কোনদিনই ছিল না রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ ক্ষেত্র জারগণই কুক্ষিগত করে বসেছিলেন। ১৯১৭ সালের মে মাসে পেট্রোগাডে প্রকাশিত

'যুদ্ধ ও বিপ্লব' নামে তাঁর পুস্তিকাখানিতে লেনিন রুশিয়া, জার্মানী, আর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী কর্তৃক লাৎবিয়ার অন্তর্গত কুরল্যাণ্ড (Courland) আর পোল্যাণ্ডকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ব্যাপারটাকে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "রাজমুকুটশোভিত তিন দস্যুর দ্বারা কুরল্যাণ্ড আর পোল্যাণ্ড তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। একশ' বছরের মতো তারা ভাগ করে গ্রাস করেছে এ সব দেশকে। জীবন্ত মাংস ছিঁড়ে খেয়েছে তারা। আর রুশীয় দস্যুই ছিঁড়ে নিয়েছে সব চেয়ে বড় টুকরোখানা, কেন না সে-ই ছিল তখন সব চেয়ে বলবান।" এ সব দেশ ভাগাভাগি করে নেওয়াকে অপরাধের কাজ বলে গণ্য করতেন লেনিন। বিপ্লবের গোড়াতেই এ সব জায়গা ফিরিয়ে দেন তিনি। সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন তিনি যে, পুরাতন রুশিয়ার স্বেচ্ছাচারীদের লুঠের মাল ধরে বসে থাকতে চায় না বলশেভিকরা। আর এখন নব্য রুশিয়ার স্বেচ্ছাচারী স্তালিন ফের থাবা মেরেছেন তাতে।

সব জাতিই যদি আজ সেই সব জায়গা ফিরে নিতে চায় যে সব জায়গা কোন-না-কোন সময়ে ছিল তাদের অধিকারে, তবে ইংল্যাণ্ড নেবে ফ্রান্সের অংশবিশেষ, সুইডেন নেবে লেনিনগ্রাড, তুরস্ক নেবে সোবিয়েৎ উক্রাইনের প্রায় সবটাই, ব্রিটেন নেবে নিউ ইয়র্ক, ডাচরাও নেবে নিউ ইয়র্ক, ফ্রান্স নেবে লুইজিয়ানা, স্পেন নেবে ক্যালিফোর্নিয়া, জার্মানী নেবে আল্‌সেস আর লোরেইন, আর পৃথিবী হয়ে উঠবে এখন যেমনটি আছে তার

চেয়েও নিকৃষ্ট এক উন্মাদশালা। গোড়াতেই এ সব অধিকার ছিল বে-আইনী আর পাশবিক কাণ্ড।

আর 'অধিকারভুক্ত' কথাটার অর্থই বা কী? পোল্যাণ্ড কি কখনও ছিল রুশিয়ার 'অধিকারভুক্ত'? চেকোশ্লোভাকিয়া কি ছিল হিটলারের 'অধিকারভুক্ত'? কখনও কি ভারতবর্ষ ছিল ইংল্যাণ্ডের 'অধিকারভুক্ত'? না, তাকে ধরে রাখা হয়েছিল পশুবলে? সাধুসজ্জন ব্যক্তিরাও যে 'অধিকারভুক্ত' কথাটাকে ব্যবহার করতে পেরে থাকেন, এই ব্যাপারটাই হচ্ছে আমাদের নৈতিক অধঃপতনের একটি চিহ্ন। ঠিক এই ভাবেই এককালে ভূস্বামী কথা কইতেন তাঁর ভূমিদাসদের বিষয়ে; তারা সব ছিল তাঁর 'লোকজন', ছিল তাঁর 'অধিকারভুক্ত'। এখন এক ধাপ উপরে উঠেছি আমরা (না কি নীচেই নেবে গেছি এক ধাপ): যাঁদের সে ক্ষমতা আছে তাঁদের 'অধিকারভুক্ত' থাকে এক-একটা গোটা জাতি।

সোজাসুজি বিভিন্ন ভূমিভাগ গ্রাস করা ছাড়াও, সোবিয়েৎ সরকার যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেট-ব্রিটেনের সম্মতিক্রমে কোরিয়া, জার্মানী, আর অস্ট্রিয়ার বড় বড় অংশ অধিকার করে বসেন, এবং ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, আর রুমানিয়ার ল্যাজের ডগাটুকুর, আর চোকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগারিয়া, যুগোশ্লাবিয়া, আলবানিয়া, আর মাঞ্চুরিয়ার বিভিন্ন অংশের, উপর কার্যকরী কর্তৃত্ব চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৫ কোটি লোকের কাছাকাছি জনসংখ্যা-সমেত এই সব দেশ হয়ে উঠেছে

সোবিয়েৎ প্রভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, এক নবীন সোবিয়েৎ সাম্রাজ্য।

সোবিয়েতের সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রগুলোতে সোবিয়েৎ-বিরোধিতার, কিংবা আমেরিকার হাতে আণবিক বোমা থাকার, ফলস্বরূপ নয়। সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম অংশই অধিকৃত হয়েছিল ঠিক সেই সময় যখন রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আর আমেরিকার মধ্যে ছিল প্রীতির সম্পর্ক, যখন পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের কাছ থেকে কোটি কোটির হারে রুশিয়া পাচ্ছিল ঋণ-ইজারা ব্যবস্থায় সাহায্য, আর প্রথম আণঠিক বোমা ফাটবার আগে। সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যের প্রায় সবটাই অধিকৃত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্ত-রাজ্যের নিরুদ্বেগ সম্মতির কল্যাণে।

পশুবল থেকে উদ্ভব সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যের। এর অস্তিত্বের কারণ হলো জার্মানী, ইতালী, আর জাপানের পতন, যুদ্ধের দরুন ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের শক্তিক্ষয়, আর আমেরিকার এ বিষয়ে কিছু করার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা।

সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে রুশীয় আর উক্রাইনীয় জাতীয়তাবাদের, আর পার্শ্বচর জাতিদের সুলভ সহায়তায় যুদ্ধে অবতীর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত রুশিয়ার পুনর্বাসন-আকাঙ্ক্ষার, সম্মিলিত ফল।

এখানেই রয়েছে হিটলারের বিস্তারলাভ আর স্তালিনের বিস্তারলাভের মধ্যে এক উদ্বেগজনক সাদৃশ্য। প্রত্যেকেই সহায়তা লাভ করেছেন ঠিক সেই সব গণতন্ত্রের কাছ থেকে, শেষে যাদেরই সব চেয়ে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিস্তারলাভ।

গণতন্ত্র সম্বন্ধে স্বৈরাচারীর অবজ্ঞার শিক্ষা প্রত্যেকেই দিয়েছেন। বের্লিন আর মস্কো থেকে দেখলে মনে হয় এই সব গণতন্ত্র যেন তাড়িত হয়ে চলেছে আত্মঘাতী উন্মাদনায়। হিটলার আর জাপানীরা ভুল করেছিল এই ভেবে যে, যতদূর খুশী এগিয়ে যেতে পারে তারা।

সাম্রাজ্যবাদের আছে একটা নিজস্ব গতিবেগ। সেই জন্যে সব রকমেরই সাম্রাজ্যবাদ আর প্রসার-সাধন হচ্ছে অমঙ্গলের আকর—রুশীয়, ব্রিটিশ, আর আমেরিকান, সবই। তৃপ্ত হতে জানে না সাম্রাজ্যবাদ। একের সাম্রাজ্যবাদ থেকে উদ্ভব লাভ করে আর দশজনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, আর তখন ইস্কুলের ছেলেদের মতো তারা সবাই বিবাদ করতে থাকে কে প্রথম শুরু করেছিল এ কাজ।

জার্মানীর বাইরে প্রভাব বিস্তার করেন হিটলার বাহুবলে, গুপ্তচরদের মারফৎ, বিদেশে তুলনায় অল্পসংখ্যক সেই সব জার্মানের কল্যাণে যারা নিজেদের দেশের চেয়েও বেশি অনুরাগী ছিল নাৎসীদের, গণতন্ত্রীদের মন ভিজিয়ে, কোন কোন প্রতিক্রিয়াপন্থীর সহযোগে, এবং গণতন্ত্রী দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং নীতিধর্মগত অধঃপতনের সুযোগ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বসমর বাড়িয়ে তুলেছে এ অধঃপতনকে এবং স্তালিনের পক্ষে সহজ করে তুলেছে রুশিয়ার বাইরে প্রাধান্য লাভের পন্থা। কাজটা এতই সহজ হয়ে উঠেছে যে, তাঁর

প্রতিযোগীরা আরও ভুল করবেন এই বিশ্বাসে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে উৎসাহ বোধ করছেন তিনি।

ক্ষমতার ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আটলান্টিক শনদের রচয়িতারা। অক্ষশক্তির যাবতীয় যুদ্ধরত বিরোধীই শনদে স্বাক্ষর দান করে, নিজেদের এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেছেন যে, "ভৌমিক অথবা অপর কোন রকমের ক্ষমতারই অনুসরণ করবেন না তাঁরা···।" পৃথিবীর অভিজ্ঞতা এই যে, ক্ষমতার অনুসরণই পরিণামে টেনে এনে নাবায় রণক্ষেত্রে। দু' দু'টি বিশ্বসমরে অবতীর্ণ হয়েছিল ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা একটিমাত্র মূল কারণেঃ একটিমাত্র জাতিকে ইউরোপে কর্তৃত্ব করা থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে। ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা রূপে হিটলার এশিয়ার জাপানী ভাগ্যবিধাতাদের সহযোগে আমেরিকা আর ব্রিটেনের পক্ষে হয়ে উঠতেন মর্মান্তিক ভয়ের কারণ। এই সম্ভাবনার বাস্তবে পরিণতিলাভ নিবারণের জন্যেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় পাশ্চাত্ত্য শক্তিবৃন্দ। আজ যদি ইউরোপের 'পরে, অতএব এশিয়ার 'পরেও, রুশিয়ার কর্তৃত্বের আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে হিসাবনিকাশের আওতার মধ্যেই নিকটতর হয়ে এসে দেখা দেবে তৃতীয় মহাযুদ্ধ।

মেক্সিকো নগরীতে রাষ্ট্রপাল ট্রুম্যান বলেছিলেন, "এক পুরুষে দু'-দু'টি বিশ্বসমরে লড়াই করেছি আমরা। আমরা দেখেছি সামগ্রিক সমরে বিজিত যেমন, বিজেতাও তেমনই, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।" স্তালিনও তা' দেখেছেন ঃ দেখেছেন তিনি দ্বিতীয়

বিশ্বসমরে রুশিয়ার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, আর লক্ষ লক্ষ মৃত সোবিয়েৎ প্রজা (হিসাব হয়েছে ১৫০ লক্ষ) আর বিকলাঙ্গের মধ্যে। তৃতীয়টি হবে আরও মারাত্মক—তা' যে-ই হারুক, আর যে-ই জিতুক। আমি বিশ্বাস করিনে যে স্তালিন চান বিশ্ববিপ্লব। কোন লোকই বলে না, "অস্ত্রবলে আর বোমা মেরে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জয় করব আমি।" কিন্তু ক্ষমতা লাভের জন্যে সতত ব্যগ্র স্তালিন ক্ষমতা প্রসারের প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে থাকেন এবং সময়বিশেষে এ রকমের সুযোগ তৈরিও করে থাকেন তিনি। তার ফলে যদি পরজাতিদের মধ্যে দেখা দেয় দারিদ্র্য, দুঃখ, আর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোনও ক্ষতি নেই তাঁর। কম্যুনিস্ট অর্থনীতিই হলো শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি—এ কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। এ বিষয়ে নিশ্চিত তিনি যে, ধনতন্ত্র যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে, তাঁরই বিধান শাসন করবে জগৎকে, আর তিনি হলেন সে পরিণতি-প্রাপ্তির মার্ক্স্-প্রেরিত পয়গম্বর। বর্তমানের যাবতীয় ঘটনাকেই তিনি দেখে থাকেন কম্যুনিস্ট-বিজয়ের পথে বিস্তৃত পাদশিলা রূপে। সোবিয়েৎ কর্মনীতি এবং বিদেশী কম্যুনিস্টদের ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টই নির্দেশ করছে যে, বর্তমান যুগের অবসাদ, মোহভঙ্গ, হতাশা, আর পণ্যের অভাব, এ সবই হচ্ছে গণতান্ত্রিক জগতের শক্তিক্ষয় করার সুবর্ণ-সুযোগ, বিশেষতঃ—সোবিয়েৎ প্রেস যে কথার বারংবার উল্লেখে কখনও শ্রান্তিবোধ করে না—ধনতন্ত্রের মন্দা যখন আসন্ন হয়ে এসেছে তখন তো বটেই।

স্বল্প উপায় নিয়ে বিপুল ব্যাপার সাধন করতে চান স্তালিন।

তাঁর প্রেরণার মূল উৎস হচ্ছে সেই সব শত্রুর নির্বুদ্ধিতা যারা বুঝতেই পারে না তাঁকে। গণতন্ত্রের ক্ষয় আর বিচ্যুতির মধ্যে দিয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে চান স্তালিন। সে-ই হয়ে উঠতে পারে রুশিয়ার কাল।

লোভের যোগান দেওয়া হয়েছে যে পররাষ্ট্রলোভীর, ভীষণ হয়ে ওঠে তার স্বভাব। কোথায় আর কখন থামতে হয় বোঝে না সে। যুদ্ধের সমাপ্তিকাল থেকেই অগ্রগতি অব্যাহত রেখে চলেছেন স্তালিন। ইরানের আজেরবাইজন প্রদেশে খাড়া করেন তিনি এক পুতুল-গবর্ণমেণ্ট, আর সোবিয়েৎ সৈন্যদল যখন ইরানে উপস্থিত ছিল তখন তেহেরানের কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন তিনি রুশিয়ার জন্যে খনিজ তেলের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করতে। মাসকয়েক পরেই পতন ঘটল আজেরবাইজনের উপগ্রহের, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ইরান-সরকার সেখানে সৈন্য প্রেরণ করলেন। জনগণ স্বাগত-সংবর্ধনা জানিয়ে গ্রহণ করলে সে সৈন্যদলকে, রুশীয়-বিভীষণের দল করলে সোবিয়েৎ য়ুনিয়নে পলায়ন। এই একটি ক্ষেত্রেই বাধা পেয়েছে সোবিয়েতের অগ্রগতি। ১৯৪৫ সালে পট্‌স্‌ডামে স্তালিন ট্রুম্যান আর অ্যাটলীকে বলেছিলেন যে, দার্দানেলিস রক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করতে চান তিনি। পরে সরকারী ভাবে এ সুবিধা চেয়ে পাঠায় সোবিয়েৎগুলো তুরস্কের কাছে। এতে করে তুরস্কের 'পরে কর্তৃত্ব করার সুযোগ হতো রুশিয়ার। এখনও বলবৎ রয়েছে এ দাবি। সরকারী সোবিয়েৎ মুখপত্রগুলো

বলেছে যে, তুরস্কের কার্স্ আর আর্দাহান প্রদেশদু'টি রুশিয়াকে দান করা উচিত। ক্ষুদে স্তালিন টিটো, পদকমালার শোভায় যাঁকে দেখায় গোয়েরিঙের মতো তিনিও, যুগোশ্লাবিয়ার জন্যে সরকারী ভাবে দাবি করেছেন গ্রীক মাকেদোনিয়া, ইতালীয় ভূমি, আর অস্ট্রিয়ার কোন কোন অংশ। ত্রিয়েস্ত নিয়ে টানাহ্যাঁচড়ারও বিরাম নেই তাঁর।

সমগ্র সোবিয়েৎ প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে কম্যুনিস্টদের বজ্রমুষ্টি প্রতি সপ্তাহে হয়ে উঠছে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। হাঙ্গেরীর কম্যুনিস্টরা, স্বাধীন নির্বাচনে হেরে যাবার পরও, লাল ফৌজের উপস্থিতির দৌলতে সম্প্রতি হাঙ্গেরীর গবর্ণমেণ্ট দখল করে নিতে শুরু করেছে। আস্ট্রিয়ানদের কাছ থেকে নাৎসীরা যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নিয়েছিল, অস্ট্রিয়ায় আবার রুশরা বসেছে সে সব দখল করে। অস্ট্রিয়ার এক বৃহৎ অংশ এইভাবে হয়ে উঠেছে রুশিয়ার একটি অর্থনৈতিক উপনিবেশ। জার্মানীর সোবিয়েৎ পরিমণ্ডলে মস্ত বড় বড় সোবিয়েৎ ট্রাস্ট এখন জার্মানীর বিভিন্ন শ্রমশিল্পের মালিক হয়ে সেগুলো চালাচ্ছে, আর এইভাবেই সেগুলোকে করে ফেলা হয়েছে সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের অর্থনীতির অঙ্গীভূত। জার্মান ঐক্যের আহ্বান সত্ত্বেও, বাস্তবিক পক্ষে মস্কৌ জার্মানীকে দ্বিধা-বিভক্ত করে সামরিক অধিকারকে পরিণত করেছে স্থায়ী অধিকারে। শুরু হয়ে গেছে সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যবাদের কুচকাওয়াজ।

লোকে বলত সাম্রাজ্যবাদের স্থিতি হচ্ছে রপ্তানি মূলধনের

'পরে : শ্রমশিল্পপ্রধান দেশে থাকে বাড়তি মূলধন আর বিভূত পণ্যদ্রব্য, আর এই সব বাড়তি মালই বিদেশে রপ্তানি করতে চায় সে দেশ। শ্রমশিল্পপ্রধান দেশ তাই অর্থনীতি আর সংস্কৃতিতে অনগ্রসর ক্ষেত্রগুলো অধিকার করে সেগুলোকে উপনিবেশে পরিণত করে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের পর থেকে রুশিয়া কাজ করে চলেছে বিপরীত দিকে : সে এসে জেঁকে বসেছে অত্যন্ত শ্রমশিল্পপ্রধান, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের চেয়েও উন্নততর, দেশগুলোতে। নানা রকমের কৌশল আর চুক্তির সাহায্যে বলশেভিকরা তাদের এই নতূন প্রভাব-পরিমণ্ডলের পণ্যদ্রব্য নিয়ে তুলছে তাদের খাদ্যাভাবগ্রস্ত ঘরোয়া বাজারে। সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যবাদের স্থিতি হলো আমদানি মূলধনের 'পরে। বাড়তি থেকে এর উদ্ভব নয়, এর উদ্ভব হচ্ছে ঘাটতি থেকে। এর ফল হচ্ছে প্রভাবাধীন অঞ্চলের শোষণ, আর তার ফলে তার দারিদ্র্যদশার একশেষ।

নিজ সাম্রাজ্যের বাইরে সোবিয়েৎ য়ুনিয়ন পেয়ে থাকে কম্যুনিস্ট দলগুলোর সাগ্রহ সহযোগ—তা' তারা সরকার পক্ষীয়ই হোক, আর সরকারের বিরোধী দলই হোক। কম্যুনিস্ট আর কম্যুনিস্ট-অনুরাগীরা, আর তাদের যত সব সরলমতি ও অন্ধ অনুগামীর দল মিলে গড়ে তুলেছে ওঅর্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড য়ুনিয়ন্‌স্ (WFTU)। পররাষ্ট্র-সচিব মোলোতোব আর সোবিয়েৎ প্রতিনিধি গ্রোময়কো (Gromyko) সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে (United Nations) এই ফেডারেশনকে বিশেষ পদাধিকার

দানের জন্যে বহু চেষ্টা করেছেন। কোন কোন দেশে, যেমন ফ্রান্সে, ভয়ানক রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে থাকে এই WFTU।

সোবিয়েৎ-শ্লাব-কম্যুনিস্ট জোড় এখনও অনুসরণ করে চলেছে বিস্তারসাধনের নীতি। এর ফলে বেধে যেতে পারে যুদ্ধ—যেমনটি একদিন বেধেছিল জার্মান, ইতালীয়ান, আর জাপানীদের বিস্তার-প্রচেষ্টার ফলে।

সোবিয়েতের ভৌমিক এবং রাজনৈতিক বিস্তার-প্রচেষ্টায় বাধাদানের ইচ্ছার প্রথম কারণ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বসমর নিবারণ করা। যদি বহুদূর অবধি এগিয়ে আসে রুশিয়া তবে অন্যান্য জাতিরা পেয়ে যেতে পারে ভয়—যেমন করে ভয় পেয়ে গিয়ে ১৯৩৯ সালে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াই স্থির করেছিল ইংল্যাণ্ড।

রুশীয় শক্তির পিছু পিছু গড়িয়ে আসে স্বৈরতন্ত্রের হিমবাহ, অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ করে চলে স্বাধীনতা। সোবিয়েতের বিস্তার-প্রচেষ্টায় বাধাদানের দ্বিতীয় কারণ হলো এই।

১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মান সংবাদপত্রগুলোয় সোবিয়েৎ কর্তৃক জার্মান বালকদের চুরি করার সংবাদ বার হতে লাগল। রুশ আর কম্যুনিস্টরা বিরক্তিভরে করতে লাগল সে সব সংবাদের প্রতিবাদ। কিন্তু সেবার শরৎকালে বের্লিন শহরে আমি এমন একখানা চিঠির আলোক-চিত্রানুলিপি হাতে পেলাম যাতে করে এ সব সংবাদের সমর্থনই হয়ে থাকে। চিঠিখানা ছিল রুশদের দ্বারা অধিকৃত স্যাক্সনী প্রদেশের কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত 'সমাজতন্ত্রী ঐক্যদলের' প্রধান পাণ্ডা ওটো বুখীৎস-এর (Otto

Buchwitz) লেখা এবং তাঁরই স্বাক্ষরিত, আর সেখানা পাঠানো হয়েছিল এই দলেরই বের্লিন-শাখার প্রধান পাণ্ডা ওটো গ্রোটেওল-এর (Otto Grotewohl) বরাবর। ১৯৪৬ সালের ৭ই মে তারিখে লেখা চিঠিখানার মুখবন্ধ হয়েছে—

প্রিয় ওটো,

নিম্নলিখিত বিষয়ে দু'-একবার তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় বাধ্য হয়ে আমাকে সে কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে।

NKVD (সোবিয়েৎ গুপ্তপুলিশ, L. F.) যাদের গ্রেপ্তার করেছে এ রকমের গোটা চল্লিশেক মামলা রয়েছে আমার দপ্তরে। তাদের প্রায় সবাই হচ্ছে পনেরো থেকে আঠারো বছরের ছেলে; এদের গত বৎসরই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

তারপর চিঠিখানায় রয়েছে রুশদের দ্বারা গ্রেপ্তার-হওয়া দু'জন জোয়ান বয়সী লোকের নাম। বুখীৎস বলছেন, এদের একজনও কোনদিন নাৎসী দলে ছিল না।

চিঠিখানার আলোকানুলিপি নিয়ে আমি গেলাম বের্লিনের রুশ-অধিকৃত অংশে অবস্থিত সমাজতান্ত্রিক ঐক্যদলের আপিসে; সেখানে গিয়ে তা' আমি ওটো গ্রোটেওলকে দেখালাম—মূল চিঠিখানা তাঁকেই পাঠানো হয়েছিল। তিনি বললেন তাঁর চেষ্টায় জনকয়েক ছেলে মুক্তি পেয়েছে।

উত্তরে আমি বললাম, "কিন্তু জার্মান এবং অ-জার্মান বন্ধু লোক যাঁরা এই সব হতভাগ্যের নাম সংগ্রহ করেছেন তাঁদের

অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে হাজার হাজার ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।”

সম্পূর্ণ নিরুত্তর রইলেন গ্রোটেওল।

ব্রিটিশের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত বের্লিনের ‘টেলিগ্রাফ’ (Telegraf) নামের দৈনিক কাগজখানা ১৯৪৭ সালের ৬ই এপ্রিল মিসেস আন্নেদোর লেবের (Annedore Leber) নামে একজন বিখ্যাত জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটের একখানা খোলা চিঠি প্রকাশ করে ; তাতে বলা হয়েছে, “ষোলো বছর বয়সের ছেলেদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তাদের মায়েরা মরিয়া হয়ে আমাদের কাছে এসে থাকেন। তরুণদের প্রতি মার্জনা ঘোষণা সত্ত্বেও, অনেক মা আজ প্রায় দু’ বছর হলো তাঁদের সন্তানদের বিষয়ে অনিশ্চয়তার জন্যে শোকে জর্জরিত হয়ে দিন যাপন করছেন।”

সোজাসুজি রাস্তাঘাট, কি রাস্তাঘাটে চলন্ত গাড়ী থেকে রুশীয় পুলিশ বিনা কৈফিয়তে এ সব ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় যে গাপ করে ফেলে কেউ জানে না। যুদ্ধ শেষ হলে পর এইভাবেই বহু রেলগাড়ী-ভর্তি জার্মান শ্রমিক আর বিজ্ঞানীকে জোর করে ধরে রুশিয়ায় চালান করে দেওয়া হয়েছে।

স্বকীয় স্বভাব ছাড়তে পারে না স্বৈরতন্ত্র। ঘরে যে সব পদ্ধতি আর যে নীতিধর্ম প্রয়োগে তা’ অভ্যস্ত, বাইরেও তা’ চালান দিয়ে থাকে সেই সব পদ্ধতি আর সেই নীতিধর্ম।

জার্মানীর তিনটি পশ্চিম-পরিমণ্ডলেই কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী,

আর খৃষ্টীয় গণতন্ত্রীদের (Christian Democrats) নিজ নিজ দল রয়েছে। কিন্তু রুশীয় পরিমণ্ডলটি সমাজতন্ত্রী কিংবা সামাজিক গণতন্ত্রীদের (Social Democrats) সম্মুখে রুদ্ধ-দ্বার; বুর্জোয়া দলগুলো বে-আইনী নয় বটে, কিন্তু সব জেলায় তারা পদপ্রার্থী দাঁড় করাতে পারে না; 'সমাজতন্ত্রী ঐক্য দল' নামের ছদ্মবেশী কম্যুনিস্ট দল রুশদের কাছ থেকে পেয়েছে সত্যিকারের মূল্যবান সাহায্য।

বের্লিন শহরের শাসনকার্য চারটি বিদেশী বিজেতা সরকারের তত্ত্বাবধানেই নির্বাহিত হয় বলে, শহরের সবক'টি অংশেই সব রকমের রাজনৈতিক দল কাজকর্ম করতে পারে। তবুও সমাজ-তন্ত্রী ঐক্য দল যখন ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় আমেরিকান, ব্রিটিশ, আর ফরাসী অঞ্চলে দেওয়ালে দেওয়ালে তাদের বিজ্ঞাপনী এঁটে দিতে পেরেছিল তখন, রুশ অঞ্চলে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের বিশেষ কতকগুলো বিজ্ঞাপনী প্রচার করতে দেওয়া হয়নি। এই সব নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপনীর দু'খানা ছিল এই রকম:

যেখানে ভয় আছে সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না; স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজতন্ত্র অসম্ভব; আর **আইনগত স্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্র সম্ভবপর নয়।** এই সব সহজ সত্যকে রুশরা বোধহয় মনে করেছিল সোবিয়েৎ প্রভুত্ব আর কম্যুনিজম্-এর বিরূপ সমালোচনা।

যেখানে, অন্ততঃ দৃশ্যতঃও, বের্লিনের মিত্রশক্তি-তত্ত্বাবধান-

সভায় (Allied Control Council) আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, আর রুশদের দ্বারা সমবেত ভাবে শাসনকার্য নির্বাহ হচ্ছে, সেই জার্মানীতেই যদি রুশরা উৎপীড়ন চালাতে আর রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে পারে, তা' হলে হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগারিয়া, এবং যুগোশ্লাবিয়ার মতো যে সব দেশে রুশদের অবাধ কর্তৃত্ব, আর বিদেশী কূটনীতিক ও সাংবাদিকদের গতিবিধি সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং লক্ষ্যের বিষয়ীভূত, সে সব দেশের অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়।

সোবিয়েৎ প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থানভেদে রুশীয় কর্তৃত্বের দৃশ্যমান প্রসার এক-এক প্রকারের। রুমানিয়া আর বুলগারিয়ার চেয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া আর ফিনল্যাণ্ডে-এর প্রসার দৃশ্যতঃ কম। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রুশিয়ার 'পরে অর্থনৈতিক নির্ভরতা, কম্যুনিস্টদের ক্রমবর্ধমান সাহসিকতা, আর স্বৈরতন্ত্রের চিরাচরিত উপায়ে বিরোধের কণ্ঠরোধ, এই সব কারণে মস্কৌ-এর ক্ষমতা কেবলই চলেছে বেড়ে।

ইউরোপ আর এশিয়ায় সোবিয়েতের এই সুবিপুল নবীন সাম্রাজ্য এককালে ছিল নাৎসী, ইতালীয়ান, কিংবা জাপানীদের অধিকারে। শ্লাবরা, হিটলারের হাতে যে ইহুদীরা এমন অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছে তারা, কম্যুনিস্টরা, এবং সম্ভবতঃ আরও কেউ কেউ হিট্‌লারের চেয়ে স্তালিনকে পছন্দ করে বেশি। কিন্তু এদের প্রায় সবাই হয়তো স্তালিনকে বাদ দিতে পারলে হতো আরও সুখী। বাদামি আর কালো রঙের তক্‌মাওয়ালা

স্বৈরতন্ত্রের বদলে লাল রঙের তকমা-পরা স্বৈরতন্ত্রের গুণগ্রহণ করতে পারে না তারা। তারা চায় তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। সোবিয়েৎ-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভূত সকল দেশেই কোন-না-কোন কম্যুনিস্ট—সচরাচর মস্কৌ থেকেই শিক্ষা পেয়ে এসেছেন তিনি—হচ্ছেন গুপ্ত-পুলিশের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত স্বরাষ্ট্র-সচিব আর কী। যুদ্ধের আগে প্রতিক্রিয়াপন্থী সরকারের অধীনে থেকেও সকল শ্রেণীর লোকেরা যেটুকু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করত, বর্তমানে তাদের সেটুকু স্বাধীনতার পরিধিও খর্ব হয়ে গেছে; মস্কৌ-এর সাম্রাজ্যবাদ আর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মিলনে রুশিয়ার পক্ষে ভোট দানের দায় থেকে তাদের জাতীয় স্বাধীনতাকেই তারা সবাই পছন্দ করে বেশি। কিন্তু যদি কোন গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, কি এম্নি একজন সাধারণ লোক তার দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস রেখে সে কথা মুখ ফুটে বলে, কি তদনুযায়ী কাজ করে, তবে তাকে গিয়ে উঠতে হবে বন্দিশালায়, কিংবা সাইবেরিয়ায়, নয়তো করতে হবে পলায়ন। হাঙ্গেরী, যুগো-শ্লাবিয়া, আর বুলগারিয়ার বিরোধী পক্ষের বিস্তর নেতাকে পলায়ন করতে হয়েছে পারী আর লণ্ডনে। জনকয়েক এসে বাস করছেন ওয়াশিংটনে।

কোন কোন দুর্জয় বীরহৃদয় সোবিয়েৎ প্রভাব-পরিমণ্ডলে এখনও চলেছেন রুশদের অগ্রাহ্য করে। সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যে, বিশেষ করে চোকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, অস্ট্রিয়ার পূর্বাঞ্চল, আর জার্মানীর পূর্বাঞ্চলে, রয়েছে অসংখ্য

গণতান্ত্রিক 'বিবর'। কিন্তু উপস্থিত তাদের কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই। রুশ আর কম্যুনিস্টরা পশুবল, উৎপীড়ন, আর অর্থনৈতিক প্রাধান্যের দৌলতে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে রেখেছে এ সাম্রাজ্যকে।

রুশীয় পরিমণ্ডলে কম্যুনিস্টরা কী পরিমাণে জন-সমর্থন লাভ করেছে তা' নিরূপণ করা কঠিন। অবাধ নির্বাচনে হাঙ্গেরীর কম্যুনিস্টরা পেয়েছিল শতকরা মাত্র ১৭টি ভোট। জার্মানী আর বের্লিনের তিনটি পশ্চিম-মণ্ডলে কম্যুনিস্ট-বিরোধী ভোটের প্রায় লেখাজোখা ছিল না। অস্ট্রিয়ায়ও ঘটেছিল এই ব্যাপার। পূর্ব-ও-মধ্য-ইউরোপ দেখেছে রুশদের। দেখেছে তারা সেই সব লুঠতরাজ আর বলাৎকার, দেখেছে তাদের যন্ত্রপাতির রুশিয়ায় স্থানান্তর, দেখেছে কৃষিক্ষেত্র থেকে শস্যসম্পদ কেড়ে নিয়ে গিয়ে তাই খেয়ে রুশদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে, দেখেছে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে, আর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে পক্ষপাতমূলক চুক্তি করতে।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপারও দেখেছে তারা; যে মুহূর্তে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল সেই মুহূর্তেই প্রত্যেক আমেরিকান জি. আই. (G. I.) ব্রিটিশ টমি, ফরাসী সৈনিক, আর যুদ্ধে বন্দী জার্মান মরিয়া হয়ে উঠল বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির একমাত্র ব্যতিক্রম-স্থল ছিল রুশরা। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সহস্র সহস্র সোবিয়েৎ নাগরিক, যুদ্ধের মধ্যে কাজের খাতিরে যাদের আসতে হয়েছিল দেশের বাইরে, কিংবা

নাৎসীরা যাদের টেনে এনেছিল দেশ থেকে তারা, দল ছেড়ে পালিয়ে বিদেশেই বসবাস করতে চাইছে। এই রকমের হাজার হাজার সোবিয়েৎ পলাতক কখনও দলে দলে, কখনও বা একা একা, সোবিয়েতের গুপ্ত-পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইউরোপময়। অনেকে এসে ঠাঁই নিয়েছে আমেরিকান, ব্রিটিশ, আর ফরাসীদের উদ্বাস্তু-শিবিরে। তাদের নামধাম নথিভুক্ত করে তাদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

এই সব লোকদের, আর বহুসংখ্যক বল্ট ও পোল যারা দেশে ফিরে গিয়ে কম্যুনিস্ট শাসনে বাস করতে নারাজ তাদের, বিষয়েই জাতিসঙ্ঘের লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কের বৈঠকে মিসেস রুজভেল্ট আর সোবিয়েতের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব বিশিন্স্কির (Vishinsky) মধ্যে তর্কাতর্কি হয়েছিল। বিশিন্স্কি দাবি করেন যে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের রুশিয়ায় ফেরৎ দেওয়া হোক। যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি হিসাবে মিসেস রুজভেল্ট আপত্তি তুলে বলেন যে, তারা সব হচ্ছে আশ্রয়লাভের যোগ্য নির্বাসিত রাজনৈতিক ব্যক্তি।

এ সব ব্যাপার যাঁদের জানা আছে সেই সব ইউরোপীয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকেন, "কেন এই সব সোবিয়েৎ নাগরিক নিজেদের দেশ ফিরে না গিয়ে আজকের এই বিধ্বস্ত, বিচূর্ণ, ছিন্নবাস, ক্ষুৎকাতর, শীতজর্জর ইউরোপে পড়ে থাকতে চায়?"

এর একমাত্র সদুত্তর এই যে, রুশিয়ায় থেকে থেকে স্বৈরাচার আর কঠোরতায় অস্থির হয়ে উঠেছে এই সব পলাতক। যিনিই

একবার এদের সঙ্গে আলাপ করেছেন তিনিই জানেন এ কথার একমাত্র উত্তর হচ্ছে এই।

শুধু এই ব্যাপারটাই পূর্ব-ও-মধ্য-ইউরোপের অধিবাসীদের কাছে রুশিয়ার বিষয়ে ব্যক্ত করে থাকে বিতর্কমূলক পুস্তকমালায় পরিপূর্ণ পুরো এক-একটি গ্রন্থাগারের চেয়েও ঢের বেশি তথ্য। কিন্তু যারা রয়েছে সোবিয়েৎ জগতের মধ্যে তারা পারে না নিজেদের মুক্ত করে তুলতে, আর যারা রয়েছে বাইরে তারা প্রায়ই পায় না এ সব তথ্যের নাগাল, নয়তো নিজেদের বিড়ম্বনায়ই একান্ত উদভ্রান্ত হয়ে আছে তাদের মন।

এ খুবই সম্ভব যে, সোবিয়েৎ জগতের প্রজারা—অর্থাৎ ১৮ কোটির মতো সোবিয়েৎ নাগরিক আর সোবিয়েৎ প্রভাব-পরিমণ্ডলের ১৫ কোটির মতো প্রাণী, মোট প্রায় ৩৩ কোটি লোক—ঠিক সেইভাবেই স্বৈরতন্ত্রের কবল থেকে মুক্তির জন্যে ব্যাকুল বোধ করছে যে ভাবে সোবিয়েৎ জগতের বাইরের লোকেরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে জীবনযাত্রার উন্নততর ব্যবস্থা আর সত্যতর গণতন্ত্রের জন্যে। সোবিয়েৎ জগতের অন্তর্ভূক্ত প্রায় কোন দেশেই এর জন্যে তারা বড়-কিছুই করে উঠতে পারে না। সোবিয়েৎ-বহির্ভূত জগতে তারা পারত অনেক কিছুই করতে।

সোবিয়েতের প্রসারলাভের চাবিকাঠি এককথায় হচ্ছে: শূন্যতা। ইউরোপ আর এশিয়ায় জার্মানী, ইতালী, আর জাপানের পরাভব, আর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুর্বলতার ফলে শক্তির যে শূন্যতা সৃষ্ট হয়েছে, স্তালিন এগিয়ে এসেছেন তারই

সুযোগ গ্রহণ করতে। অবিকল এই ভাবেই রুশিয়া আর কম্যুনিস্টরা পৃথিবীময় প্রত্যেক স্থানে এগিয়ে এসেছে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের অপচয় ঘটার দরুন যে রাজনৈতিক আর মানসিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা' পূর্ণ করে তোলার অভিপ্রায়ে।

শান্তি আর গণতন্ত্র রক্ষার চাবিকাঠি হচ্ছে এই সব শূন্যতা পূরণ করে সোবিয়েতের অধিকতর সম্প্রসারণ রোধ করা। শক্তির শূন্যতার পরিবর্তে যদি কোন শক্তি এসে রুশিয়ার পথরোধ করে দাঁড়ায় তবে ভূমিভাগ অধিকার করে নিজের সম্প্রসারণ সাধন করা থেকে বিরত হবে রুশিয়া। গণতন্ত্র যদি আজ সক্রিয়, উন্নতিশীল, আর বাস্তব হয়ে ওঠে তবে রাজনীতি আর ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করবে না রুশিয়া।

লোকে যখন আধ্যাত্মিক শূন্যতা বোধ করতে থাকে, কোন দিকেই দেখতে পায় না কোন আশা, আর তাই হয়ে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখনই কান দেয় হাতুড়ের কথায়, প্রাণ দেয় তুলে ডিক্টেটরদের হাতে। শূন্যতা হলো দায়িত্বহীন সমালোচক, বিকৃতমস্তিষ্ক, আর গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকদের ক্রীড়াক্ষেত্র।

রুশ-সমস্যা হচ্ছে জার্মান-সমস্যার স্মারক, কারণ এরও উদ্ভব সেই একই উৎস থেকে : জীবনকে তৃপ্তি আর মহত্ত্বের আধার করে গড়ে তুলতে আধুনিক সভ্যতার অক্ষমতা। দারিদ্র্যই যে কম্যুনিজমের পরিপুষ্টির কারণ, অতি সাধারণ কথা এটা আজ। অন্ন, বস্ত্র, জ্বালানির অভাব হচ্ছে এর পরিপুষ্টির কারণ, তা' ছাড়া অধ্যাত্মচেতনার অভাবও এর পরিপুষ্টির কারণ বটে।

দ্বাদশ অধ্যায়

রুশিয়ার সঙ্গে আদর্শগত দ্বন্দ্ব

'এক পৃথিবী' হচ্ছে খুবই এক প্রশংসনীয় আদর্শ; এ মন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে ওয়েণ্ডেল উইল্‌কী, যাঁর অকালমৃত্যু হলো আমেরিকার জাতীয় জীবনের পক্ষে এক পরম ক্ষতি তিনি, গণতন্ত্রের যশোমন্দিরে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক নয় এ পৃথিবী। পৃথিবী হয়ে পড়েছে দ্বিধা-বিভক্ত, আর এই তথ্যটির সম্মুখীন না হওয়ার দরুন অনেক কিছুই চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। সম্ভবতঃ একদিন একই হয়ে উঠবে পৃথিবী, আর তাই যে প্রশ্ন আপনিই জেগে ওঠে তা' হলো এই যে, সে কি তখন হবে এক গণতান্ত্রিক জগৎ, না, এক স্বৈরতান্ত্রিক জগৎ। এই নিয়েই চলেছে যত সব গলাবাজি, যত সব সম্মিলন, বক্তৃতা, আর কলহ।

আগে বলা হতো যে রুশিয়া আর আমেরিকা পরস্পর থেকে এত দূরে অবস্থিত যে, এদের মধ্যে মন-কষাকষির অবকাশ দেখা দিতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বসমরে জয়লাভের ফলে বদ্‌লে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র। রুশিয়া আর আমেরিকা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের প্রতিবেশী আর জাপান, কোরিয়া, চীন, ইরান, তুরস্ক, গ্রীস, বলকান অঞ্চল, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, আটলান্টিক মহাসাগর, আর উত্তর মহাসাগরে পরস্পরের

প্রতিযোগী। পৃথিবীময় রুশিয়া আর আমেরিকা আজ রাজনীতি ও ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রত।

এমন কি ল্যাটিন আমেরিকায়, যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে আছে নৈকট্য আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্যের সুযোগ সেখানেও, ইয়াঙ্কী-শক্তির একচেটে প্রাধান্যের বিরুদ্ধে কোন কোন সাধারণতন্ত্রের সাম্যরক্ষার বাসনা (ইংল্যাণ্ড এখন ঘর সামলাতে ভয়ানক ব্যস্ত বলে সাম্য রক্ষা করতে অক্ষম হওয়ার দরুন) কম্যুনিস্টদের, অতএব রুশিয়ার, প্রভাব-প্রতিপত্তি ঢের বাড়িয়ে দিয়েছে। ডিক্টেটর পেরোঁ যখনই ওয়াশিংটনের বিরাগের গন্ধ পান তখনই দহরম-মহরম করতে থাকেন মস্কো-এর সঙ্গে, আর মস্কোও তাতে সানন্দে দিয়ে থাকে সাড়া।

এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল স্তালিন; তাঁর অস্ত্রশালায় যত রকমের অস্ত্র আছে সব প্রয়োগ করে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি এ যুদ্ধ। সোবিয়েৎ প্রেস আর রেডিয়োর কথাবার্তায় আর সোবিয়েৎ কর্মচারীদের ক্রিয়াকলাপে প্রতিফলিত হয়ে থাকে সোবিয়েৎ-বহির্ভূত জগতের বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত শত লোক যাঁরা সোবিয়েৎ কর্মনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে আর প্রবন্ধ লিখে থাকেন তাঁরা সোবিয়েৎ পত্রিকা আর সংবাদপত্র পড়তে পারেন না।

আগাগোড়া ব্যাপারটাকে শব্দার্থের মারপ্যাঁচ, শব্দের পরিতাপজনক অপব্যাখ্যা, সংশয় এবং সাময়িক ব্যক্তিগত বিরক্তির বিষয় বলে সাহিত্যিক যাদুদণ্ড সঞ্চালনের দ্বারা নস্যাৎ

করে দেওয়া যায় না এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে। এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ হচ্ছে একটা দৃশ্যমান বাস্তব ব্যাপার। প্রাত্যহিক সংবাদপত্রই হচ্ছে সে যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি।

রুশদের মধ্যে একটা প্রবাদবাক্য চলিত আছেঃ "সার্কাস দেখতে গিয়েও হাতী চোখে পড়েনি লোকটার।" আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় জিনিষ হলো সোবিয়েৎ-জগৎ আর সোবিয়েৎ-বহির্ভূত জগতের মধ্যে এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ। শুধু এক অন্ধ কিংবা নির্বোধরাই দেখতে পাচ্ছে না তা। পাছে আমরা এর বিরোধিতা করে জয়লাভ করি তাই অনেকে চানও না যে ব্যাপারটা চোখে পড়ে আমাদের।

"রুশিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনটা কী? রুশিয়ার সঙ্গে তাল রেখেই চলতে হবে আমাদের। রুশিয়ার সঙ্গে আপোষ করে, রুশিয়াকে সাহায্য করেই আমাদের চলা উচিত।" প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় এ হেন মন্তব্য।

ব্রিটিশ আর আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট আপোষ করেছিল রুশিয়ার সঙ্গে পোল্যাণ্ড, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, যুগোশ্লাবিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, আর বুলগারিয়া সম্বন্ধে। রুজভেল্ট আর চার্চিল স্তালিনকে দান করেছিলেন পোল্যাণ্ডের অর্ধেকটা, আর তা' ছাড়া বাকি অর্ধেকটাকে ওয়ারশ থেকে মস্কোয়ে গড়া গবর্ণমেণ্ট খাড়া করে শাসন করবার সুযোগও দিয়েছিলেন তাঁরা। স্তালিনকে শুধু এই কথা দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, পোল্যাণ্ডে হবে "স্বাধীন আর অবাধ নির্বাচন।" কথা

দিয়েওছিলেন তিনি। কথার খেলাপও করেছেন তারপরে। রুমানিয়া আর বুলগারিয়াতেও স্বাধীন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি তিনি দেন। ভঙ্গও করেন সে প্রতিশ্রুতি। হাঙ্গেরীতে বাস্তবিকই হয়েছিল স্বাধীন নির্বাচন, আর তাতে কম্যুনিস্টরা পেয়েছিল শতকরা মাত্র ১৭ ভোট। কিন্তু মাসকয়েক পরেই, হাঙ্গেরীতে রুশিয়ার সামরিক শক্তির দৌলতে সংখ্যা-লঘু কম্যুনিস্টরা হাঙ্গেরীর গবর্ণমেণ্টের রাশ হাতে নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে একতরফা চুক্তি করে রুশিয়া যা যা চেয়েছিল সব দিলে তার হাতে তুলে। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পট্স্ডামে স্তালিন নিজে কথা দিয়েছিলেন যে, জার্মানীকে এক অখণ্ড অর্থনৈতিক সংস্থা রূপে গ্রহণ করা হবে। এ আপোষ মেনে চলতে অক্ষম হয় রুশিয়া। স্তালিন কথা দিয়েছিলেন যে, বিশেষ একটি নির্দিষ্ট দিনে ইরান পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া হবে। সে দিনটির বহুকাল পরেও সেখানে ছিলেন তিনি। রুশরা একেই বলে থাকে দেওয়া-নেওয়ার কারবার। প্রথমে কথা দিয়ে পরে কথা ফিরিয়ে নেয় তারা।

রুশিয়ার সঙ্গে আপোষে এসে পৌঁছুবার জন্যে আটলাণ্টিক-শনদের নীতি সম্পর্কে আপোষ করেছিল গণতন্ত্রগুলো। ফলে হয় পুরোপুরি ক্ষতি। গণতন্ত্রগুলো তাঁকে যা যা দিয়েছিল সব হাত পেতে নেন স্তালিন, তারপর আরও বেশি নেবার জন্যে হাত বাড়ান তিনি। এ-ও হচ্ছে সেই দেওয়া-নেওয়ার কারবার; গণতন্ত্রগুলো দেয় আর রুশিয়া নেয়।

জার্মানীর পূর্বাঞ্চলের অর্ধেকটা রুশিয়ার হাতে চলে গেছে হয় সরাসরি গ্রাস করবার ফলে, নয় পোল্যাণ্ডে রুশিয়ার তাঁবেদার গবর্ণমেন্টের উপহার হিসাবে, অথবা রুশিয়া কর্তৃক অধিকৃত পরিমণ্ডল রূপে। তাতে করে পরিতৃপ্ত হয়েছে কি ক্রেমলিন? না, সেই থেকে চেষ্টা করে আসছে সে সমগ্র জার্মানী জয় করে নিতে।

ত্রিয়েস্ত ছিল এক ইতালীয়ান শহর; ইতালীয়দের প্রাণের টান আছে এর 'পরে। ইতালীতে গণতন্ত্রের ক্ষতি করে, গণতন্ত্র-গুলো ইতালীর কাছ থেকে কেড়ে নিলে ত্রিয়েস্ত, এখন তাকে আনা হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিধির মধ্যে। কিন্তু ত্রিয়েস্ত নিয়ে রুশিয়ার খেলা সবে হয়েছে শুরু। মস্কো-এর আশীর্বাদে যুগোশ্লাবরা এখনও চেষ্টা করছে ত্রিয়েস্তকে সোবিয়েৎ প্রভাব-পরিমণ্ডলভুক্ত করতে।

কোরিয়া ছিল আমেরিকা আর রুশিয়ার মধ্যে বিভক্ত। সেটা ছিল একটা আপোষ-রফা। কিন্তু সংঘাত চলছেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র চায় যারা জেঁকে বসে আছে সেখানে, তাদের দু'পক্ষই তা ছেড়ে চলে যাক, যাতে করে কোরিয়ানরা হতে পারে স্বাধীন। স্তালিনের ভয় তাতে করে কোরিয়া হয়ে উঠবে আমেরিকার অনুরাগী।

প্রতীচ্য শক্তিবর্গ আর রুশিয়া জার্মানীর পূর্বতন মিত্রদের সম্বন্ধে সন্ধিপত্রে সই করেছে। ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, আর বুলগারিয়া সম্বন্ধে যে সব সন্ধি হয়েছে তাতে এই চারটে

দেশের উপর রুশিয়ার আধিপত্যকেই নেওয়া হয়েছে স্বীকার করে। ইতালী সংক্রান্ত সন্ধি হয়েছে ইতালীয় গণতন্ত্রকে পিছিয়ে দেবার এক যন্ত্র। কূটনৈতিক সম্মিলনগুলোয় যে সব সন্ধি আর ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে থাকে তা রুশিয়া সংক্রান্ত সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে না।

১৯৪১ সালে রুশিয়া হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে, এবং বিশেষ করে যুদ্ধ-বিরতির পর থেকে, প্রতীচ্য শক্তিরা রুশিয়ার সঙ্গে যত অসংখ্য বার আপোষ করেছে, যত রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে তাকে, যতবার তার কাছে করেছে নতি স্বীকার, তার তুলনায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে রুশিয়া যখন সকলের সঙ্গে সহযোগ বা আপোষ করবার কোন লক্ষণ দেখিয়েওছে তখনও তার সে চেষ্টা হয়েছে অণুপরিমাণ মাত্র। অধিকন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যখন সাংস্কৃতিক বা সামাজিক সম্বন্ধ, খাদ্য, স্বাস্থ্য, উদ্বাস্তু, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকাকড়ির লেনদেন প্রভৃতি বাস্তব ব্যাপার নিয়ে বিধিব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে, সোবিয়েৎ গবর্ণমেণ্ট তখন সে সব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলো থেকেই নিজেকে রেখেছে সরিয়ে।

"রুশিয়ার সঙ্গে মাঝপথে গিয়ে মিলব আমরা," এ কথা বলা সহজ। আমরা শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রেই এগিয়ে গিয়ে মিলতে চেষ্টা করেছি রুশিয়ার সঙ্গে। কিন্তু শতকরা ১০-টি ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসেনি রুশিয়া আমাদের দিকে।

এ বিষয়ে মাস্ক-এর যুক্তি খুবই সঙ্গত—মস্কো-এর দিক থেকে অবশ্য। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে মস্কো হচ্ছে রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত। মস্কো চায় লাভ। কিছুই হাতছাড়া করতে রাজি নয় মস্কো। যা তার হাতে এসে পড়েছে তা ধরে বসে রয়েছে মস্কো, আর—সম্ভবতঃ আমেরিকায় যখন দেখা দেবে অর্থনৈতিক মন্দা তখন—এগিয়ে যাবার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে সে।

রুশিয়া আর আমেরিকার, অথবা ডিক্টেটরতন্ত্র আর গণ-তন্ত্রের, পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের আগাগোড়া সমস্যাটাই এখন কূটনীতি-ক্ষেত্রের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। মস্কো আর ওয়াশিংটন আলাপ-আলোচনা করে একমত হতে পারে কি না, এখন আর সে প্রশ্ন ওঠে না। রুশিয়ার, কি আমেরিকার প্রত্যক্ষ জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে মতবিরোধ যদি কখনও হয়ও তবুও তা' নিতান্তই এক বিরল ব্যাপার; মতবিরোধ ঘটে চীন, জার্মানী, গ্রীস, তুরস্ক, জাপান, এই সব নিয়ে। এ দু'য়ের কেউই চায় না যে, কেউ এসে রাজনৈতিক জয় লাভ করে এ সব দেশে। এ-ই হচ্ছে রাজ-নৈতিক সমর, আর যে পর্যন্ত না হয় রুশিয়া নয় গণতন্ত্র জয়লাভ করছে সে পর্যন্ত সমাপ্তি ঘটবে না এর।

রূপান্তর ঘটেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির। ইতিপূর্বে গবর্ণমেণ্টে গবর্ণমেণ্টে পারস্পরিক সম্পর্কই ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতি। অবশ্য যে সব লোক আর যে সব দলের হাতে থাকত গবর্ণমেণ্ট চালানোর ভার তাঁদের প্রভাব ছিল যথেষ্টই, কিন্তু বাইরের লোকের কোনও হাত ছিল না তার

মধ্যে। কোন কোন দেশ সম্বন্ধে এ কথা আজও সত্য বটে। কিন্তু বড় বড় দেশগুলো, বিশেষতঃ রুশিয়া আর আমেরিকা, এখন ক্রমাগত চেষ্টা করছে বিদেশী জাতিদের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে। কারণ ফ্রান্স যদি আজ হয়ে ওঠে কম্যুনিস্ট তবে, তার ফলে, তা' হয়ে পড়বে সোবিয়েৎ প্রভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। তাই রুশিয়া চায় ফ্রান্স কম্যুনিস্ট হয়ে যাক, আর আমেরিকা চায় ফ্রান্স যেন কম্যুনিস্ট না হয়। তাই ফরাসী কম্যুনিস্ট দলের শক্তি কতখানি, ফ্রান্সের ট্রেড-য়ুনিয়ন আন্দোলনে কম্যুনিস্টদের প্রভাব কতটা, আর সে আন্দোলনের সঙ্গে মস্কো-এর যোগাযোগ আছে কি না, সব ব্যাপারে ক্রেমলিন আর হোয়াইট হাউস সমভাবেই কুতূহলী। ইতালী, জার্মানী, জাপান, এবং আরও অনেক দেশ সম্বন্ধেও এই একই কথা। এই হচ্ছে নতুন ভাবাদর্শগত সাম্রাজ্যবাদ (ideological imperialism); সোবিয়েৎ আর আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট মহোৎসাহে অনুসরণ করে চলেছে এ নীতি। (এ সব দেশ আমেরিকার এই ভাবাদর্শগত বা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে কোন্ চোখে দেখবে তা নির্ভর করবে যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির 'পরে।)

স্তালিনকে বলবেন রুশিয়ার বাইরের কম্যুনিস্ট দলগুলোকে গুটিয়ে নিতে? তবে যুক্তরাষ্ট্রকেও জোর করতে পারেন আপনি যারা কম্যুনিস্ট নয় তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, কিংবা যে সব দেশ কম্যুনিস্টদের ভয়ে জড়সড় সে সব দেশকে ঋণদান আর বাজার-সম্ভ্রম (credit) মঞ্জুর করা থেকে বিরত হতে।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা বাস্তবিকই চান যে, রাজনীতির এ লড়াই থামিয়ে, বাকি পৃথিবীর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে, একা একা সুখেস্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে থাকুক আমেরিকা। কিন্তু তার ফলে ক্রেমলিনের বিস্তারলাভের প্রচেষ্টায় এসে যাবে আরও জোর। রুশিয়া এসে জুড়ে বসবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সে ফাঁক-টুকু, ঠিক যেমনটি করে সে এসে জুড়ে বসেছে জার্মানীর পতনের ফলে সৃষ্ট ভৌমিক শূন্যতাকে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন কথা হচ্ছে এই যে সোবিয়েৎ জগৎ, আর গণতান্ত্রিক জগৎও বটে, রত হয়েছে ভাবাদর্শের সম্প্রসারণে। ভাবাদর্শের সম্প্রসারণ হচ্ছে রাজনৈতিক সম্প্রসারণেরই শামিল। কম্যুনিস্ট ইতালী হবে রুশিয়ার এক সম্পদ আর আমেরিকা ও ইংলণ্ডের এক আপদ। গণতান্ত্রিক জাপান হবে কম্যুনিস্ট-বৈরী। কম্যুনিস্ট জার্মানী, আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড উঠে চলে গেলে যা হয়ে উঠবে একান্তই এক অনিবার্য ব্যাপার তা, রুশদের এগিয়ে দেবে রাইন-নদের তীরে ফ্রান্সের একেবারে মুখোমুখি। তাতে করে ফ্রান্সও হয়ে পড়বে কম্যুনিস্ট। তৃতীয় মহাযুদ্ধ তখন আসবে আসন্ন হয়ে। অথবা, ইতিমধ্যে অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক দেশগুলো যদি হয়ে পড়ে যার-পর-নাই সংখ্যালঘু আর দুর্বল, তবে সেই হবে গণতন্ত্রের অবসান।

ফাসিস্তদের অগ্রগতি আর পার্ল হারবারের দুর্মূল্য শিক্ষা হচ্ছে এই। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ পুরাতন স্বাতন্ত্র্যবাদী (isolationists) আর ইউরোপের অধিকাংশ তৃপ্তিবিধায়ক

(appeasers) সম্ভবতঃ আয়ত্ত করতে পেরেছেন এ শিক্ষা। কিন্তু সম্প্রতি গজিয়ে উঠতে শুরু করেছেন একদল নতুন স্বাতন্ত্র্য-বাদী। তাঁরা হচ্ছেন সেই সব কম্যুনিস্ট আর তাঁদের সহযোগীরা যাঁরা তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন, "হাত গুটিয়ে নাও গ্রীস থেকে", "হাত গুটিয়ে নাও তুরস্ক থেকে," "হাত গুটিয়ে নাও চীন থেকে," "হাত গুটিয়ে নাও জার্মানী থেকে," "ব্রিটেনকে অর্থ-সাহায্য দেওয়া চলবে না," ইত্যাদি ইত্যাদি। নাও হাত গুটিয়ে যাতে করে রুশিয়া সেখানে দিতে পারে হাত।

সব রকমের সাম্রাজ্যবাদ আর সর্বপ্রকারের সম্প্রসারণই যখন অন্যায় তখন সোবিয়েৎ-সম্প্রসারণের আমি যেমন প্রবল বিরোধী, আমেরিকার সম্প্রসারণের তেমন প্রবল বিরোধী নই কেন? একটা পার্থক্য রয়েছে: আমেরিকার সম্প্রসারণের আওতায় পড়েও, বিভিন্ন দেশ যা চায় তার জন্যে তাদের লড়াই করারি তবুও বা একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু একবার যেখানে এসে জেঁকে বসেছে রুশিয়ার ডিক্টেটরতন্ত্র সেখানে নির্মম ভাবে দমন করা হয়ে থাকে যে-কোনও রকমের বিরোধকে। তৎসত্ত্বেও আমেরিকার সম্প্রসারণ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন আমি।

এমন অনেক আমেরিকান আছেন যাঁরা স্বাতন্ত্র্যবাদের ঠিক বিপরীত মতবাদের সমর্থক। তাঁদের স্বপ্ন এক আমেরিকান সাম্রাজ্য, আর পৃথিবীময় আমেরিকার অপরিমিত শক্তি, বিস্তার। সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সহায়ে, এই তাঁদের দাবি। এ বিষয়ে আমি

সম্পূর্ণ নিঃসংশয় যে এ পথে চললে অর্থ বিপর্যয়, নৈতিক, বিদ্রোহ আর কুরুক্ষেত্র অনিবার্য।

কোন কোন আমেরিকান মনে করেন যে, অর্থনৈতিক সাহায্য আর রুশিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সামরিক ব্যবস্থা করলেই গ্রেট-ব্রিটেন, ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলো, ল্যাটিন আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী, গ্রীস, তুরস্ক, স্কান্দিনেবিয়া, নিকট-প্রাচ্য, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ইন্দোচীন, চীন, আর জাপান আমেরিকার পরে নির্ভর করার কথা শোনামাত্রই কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নয়ই বা কেন ? তাঁরা বলেন। সবাইকে বাঁচাবে আমেরিকা ঐ অতিকায় কালো নেকড়ে, কি ঐ অতিকায় লাল ভালুকের কবল থেকে। এ হচ্ছে অর্বাচীনের উক্তি। এরা তা' পছন্দ করবে না। প্রাণপণে বাধা দেবে এরা। অবশ্য এ সব দেশের অনেকগুলোতেই যুক্তরাষ্ট্র খুঁজে বার করতে, কি সাহায্য দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলতে, পারে আমেরিকার অনুরাগী কোন কোন রাজনৈতিক দলকে। কিন্তু প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে সে দলকে।

আমেরিকা সম্বন্ধে সংশয় এবং আমেরিকার প্রতি বিরূপ মনোভাব বাইরে শুধু যে কম্যুনিস্ট আর কম্যুনিস্ট-অনুরাগীদের মধ্যেই রয়েছে তাই নয়, রয়েছে বহু গণতান্ত্রিকের মধ্যেও,— তাদের ভয় হচ্ছে এই যে যুক্তরাষ্ট্র হলো গিয়ে বিংশ শতকের মহা-দানব এবং তার অপরিমেয় অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ক্ষুদ্রতর দেশগুলোর 'পরে করবে আধিপত্য। রক্ষণশীল, ধনতান্ত্রিক

আমেরিকা সাহায্যদানের সঙ্গে পাছে এই শর্ত জুড়ে দেয় যে, গ্রহীতাদের আমেরিকান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে হবে, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন তারা।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পূর্বতন জাপ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে বসার ব্যাপারটা—সরকারী ভাবে অবশ্য তা' অধিকার করা বলে বর্ণিত হয় নি—ইতিমধ্যেই এশিয়ার লোকদের আর আমেরিকারও যারা এশিয়ার মৈত্রীর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন তাদের অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালদ্বীপের অধিকার লাভ করার পরিবর্তে দশ কোটি এশিয়াবাসীর বন্ধুত্ব লাভ বরং আমার কাছে ঢের বেশি কাম্য; বৈমানিক আর আণবিক মহাসমরে দ্বীপপুঞ্জ আর রাজ্যখণ্ড রক্ষাকবচের কাজ করবে না মোটেই।

ইউরোপে, আর চীন এবং জাপানেও, যাচাই করে দেখা হচ্ছে আমেরিকার ভূমিকা। কিন্তু অপপ্রচারের ফলে বিকৃত হয়ে উঠেছে ছবিখানা। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে তার নিজের অধীন জার্মান-পরিমণ্ডলে সমাজতান্ত্রিক আর কম্যুনিস্টদের স্বাধীন নির্বাচনে কোনরূপ আপত্তি তোলেনি ধনতান্ত্রিক আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট, অথচ সোবিয়েৎ গবর্ণমেণ্ট তার পরিমণ্ডলের মধ্যে কাজ করতে অনুমতি দেয়নি সোস্যাল ডেমোক্রাটদের।

প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে, অস্ট্রিয়ায় শ্রমশিল্পের জাতীয়-করণের অনুকূলতা করেছে আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট, কিন্তু সোবিয়েৎ গবর্ণমেণ্ট করেছে তার প্রতিকূলতা।

প্রকৃত তথ্য হচ্ছে এই যে, জেনারেল জর্জ সি. মার্শাল চীনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেননি আমেরিকার অনুরাগী কোন গবর্ণমেণ্ট, যেমনটি করেছিলেন বিশিন্‌স্কি (Vishinsky) রুমানিয়ার ঘাড়ে রুশিয়ার অনুরাগী গবর্ণমেণ্ট চাপিয়ে দিয়ে, যেমনটি করেছিলেন স্তালিন পোল্যাণ্ডে রুশিয়ার অনুরাগী গবর্ণমেণ্ট নির্বাচন করে। পক্ষান্তরে, চীনা গবর্ণমেণ্টে আমেরিকা-দ্বেষী, রুশিয়ার অনুরাগী, কম্যুনিস্টদের গ্রহণ করাবার জন্যে বহু চেষ্টা করেছিলেন মার্শাল। আর যখন তাঁর আয়াস বিফল হলো তখন তিনি যে শুধু চীনা কম্যুনিস্টদের মধ্যে যারা নেহাৎ গোঁড়া তাদেরই দোষ দিয়েছিলেন তাই নয়, দোষারোপ করেছিলেন তিনি কুওমিন্‌টাঙের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আর লড়াইয়ের ভক্তদেরও। চীনকে তিনি উপরোধ করেছিলেন সব দল থেকে মধ্যপন্থী মডারেটদের নিয়ে এক মিশ্র সরকার গঠন করবার জন্যে। কিন্তু জোর করে চীনের উপর এ রকমের কোন গবর্ণমেণ্ট চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল না তাঁর।

প্রকৃত তথ্য হলো এই যে, জেনারেল ম্যাকআর্থার জাপানী কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট, আর ট্রেড-য়ুনিয়নিস্টদের কার্য্যতঃ দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। জাপানে নির্বাচন হয়েছে স্বাধীন্ ভাবে। নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারগুলো এবং তোকিয়োর সরকারকে ভেঙে দেননি আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষ। ম্যাকআর্থারের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়েছে শুধু ফ্যাসিস্ট-অনুরাগীর দল, লড়াইয়ের ভক্তরা, আর বড় বড় শ্রমশিল্পপতিরা।

তবুও এই ব্যাপারটাকে বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়েই বিকৃত করে দেখিয়ে থাকেন প্রচারকারীরা, এবং বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও সত্য বলে গ্রহণ করেন সে বিকৃতিকে। তাঁরা বলেন, "চীনে প্রতিক্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেছে কেন আমেরিকা? গ্রীসেই বা কেন?" "কেন আমেরিকা কোটি কোটি টাকা ঢালছে আরবের তৈলময় ফিউডাল রাজ্যগুলোতে?" "এই কি গণতন্ত্র বিস্তারের পন্থা?" ওয়াশিংটনের কর্তাদের চোখে আমেরিকার কূটনীতি নির্দোষ ঠেকতে পারে, কিন্তু অপর দিক থেকে যারা তা দেখছে তাদের চোখে তা দেখায় অন্যরূপ।

১৯৪৬ সালে সকল দলেরই অসংখ্য দায়িত্বশীল ইংরেজ আমেরিকা কর্তৃক ব্রিটেনকে ঋণদানের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, এবং যদিও তাঁদের দেশের পক্ষে অর্থ-সাহায্যের একান্তই প্রয়োজন ছিল তবুও পার্লামেণ্টে তাঁরা সে সাহায্য গ্রহণের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। বিপৎপাত কিংবা পতনের ভয়ে কোন বিদেশী গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার অর্থ-সাহায্যের জন্যে দরবার করতে, আর তা গ্রহণ করতে, বাধ্য হলেও, তা থেকে এ নিশ্চয়তা লাভ করা যায় না যে, তাঁরা তার জন্যে কৃতজ্ঞ বা বন্ধুভাবাপন্ন থাকবেন।

আমেরিকা যদি ঘুণাক্ষরেও এই ভাব প্রকাশ করে যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ কিংবা পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত কাজ-করবারে সে প্রভাব বিস্তার করতে চায় তবে যে ভারতবর্ষ আজ ব্রিটিশ-শাসন থেকে মুক্তিলাভ করেছে সে কি তাকে এক বিরুদ্ধাচরণ

করা ছাড়া আর কোনও পুরস্কার দান করতে পারে? পারে কি ইন্দোনেশিয়া? কিংবা ব্রহ্মদেশ? অথবা ইন্দোচীন? কোটি কোটি লোক, স্বাধীনতা লাভ করার পর, ব্যগ্র হয়ে উঠেছে আত্মবিকাশের জন্যে।

যে সব দেশের ভালোমন্দ বিচার করবার কোনরূপ অবকাশ রয়েছে সে সব দেশ এমন কোনও শক্তিমান জাতির আওতার মধ্যে এসে পড়তে রাজি নয় যে জাতির দ্বারা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র খর্ব হতে পারে। যদি তাদের মনে এ সংশয় জাগে যে যুক্তরাষ্ট্র চলেছে এক নতুন সাম্রাজ্য গঠনের দিকে, তবে তারা সব বাধা দেবার শক্তি বাড়াবার জন্যে নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হবে, আর, মোটের উপর, সৃষ্টি করে বেড়াবে নানা রকমের অসুবিধা। শেষ অবধি আমেরিকাকে হয়তো ধরতে হবে স্তালিনেরই পথ: নিজের প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে হয়ে উঠতে হবে ডিক্টেটর, জোর করে খাড়া করতে হবে যত সব তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট, দমন করতে হবে বাধা, আর রুশিয়া যেমন হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, বুলগারিয়া, রুমানিয়া, আর যুগোশ্লাবিয়ার বিরোধী পক্ষের নেতাদের নিয়ে করেছে, তেমনই আমেরিকা-বিরোধীদের এক আমেরিকান সাইবেরিয়ায় দিতে হবে নির্বাসন।

স্তালিনের অস্ত্রে স্তালিনের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে হয়ে উঠতে হবে তোমায় স্তালিন-পন্থী।

গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টদের আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে কম্যুনিস্টদের নিজেদের অস্ত্রেই কম্যুনিস্টদের

করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কাজ করতে হবে তাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, চলতে হবে গণতান্ত্রিক নীতির অনুবর্তী হয়ে।

শক্তিমান ফরাসী কম্যুনিস্ট দল, যাদের দমন করতে গেলেই বাধবে গৃহযুদ্ধ তারা, প্রভাব বিস্তার করছে ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতির উপর, আর ঠেকিয়ে রাখছে ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র-অনুরাগী, প্রতীচ্যের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, কিংবা আমেরিকা-অনু-রাগী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা থেকে। অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে হতে পারে না এ অবস্থার প্রতিকার—যদি না প্রত্যেক ফরাসী গ্রাম ও নগরে পাহারা বসাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। শুধু গায়ের জোরে চীন থেকে কম্যুনিজম্‌কে তাড়াতে হলে প্রায় ১৫ কোটি লোকের বাস-ভূমি সুদূর সোবিয়েৎ-চীনা অঞ্চলে বাধাতে হবে এক কুরুক্ষেত্র। পারবে কি আমেরিকা তা' করতে ? এর জন্যে প্রস্তুত আছে কি সে ? আমার তো মনে এর উত্তর হচ্ছে 'না'।

যে বাস্তববাদের কথা হচ্ছে এই যে বৃহত্তর এবং প্রকৃষ্টতর সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে নিবৃত্ত করতে হবে সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যবাদকে, আদপেই তা বাস্তববাদ নয় ; তা হচ্ছে নির্বোধ আর আত্মবিরোধী নীতি।

গণতন্ত্র এসে পড়েছে আক্রমণের মুখে। তাই এখনই হচ্ছে আরও গণতান্ত্রিক, আরও সন্নীতি-পরায়ণ, আরও খৃষ্টধর্মানুসারী, আরও গান্ধীপন্থী হয়ে ওঠার সময়। ডিক্টেটরতন্ত্রের 'পরে জয়লাভের একমাত্র আশা হলো এইখানে। যে গণতন্ত্র নিজের

কাছেই দোষী—বিশেষতঃ সঙ্কটকালে নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলবে তা।

রুশিয়ার সম্প্রসারণের সদুত্তর আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যশীলতাও নয়, ব্রিটিশের স্বাতন্ত্র্যশীলতাও নয়। কোন কোন সরলমতি ইংরেজ মনে মনে স্বপ্ন দেখছেন যে প্রথম আণবিক যুদ্ধে অনেক দেশ নিরপেক্ষ থাকবে, তাঁরা ভাবছেন যে রুশিয়া যে সময় পরিধি বিস্তার করে চলেছে, কিংবা প্রাধান্যলাভের জন্যে যখন হানাহানি বেধে গেছে রুশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে, তখন তাঁরা থাকতে পারবেন গণতান্ত্রিক। কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের অবস্থান হচ্ছে সন্ধিক্ষেত্রে। ইংল্যাণ্ড বাদ পড়লে, ধ্বংস হয়ে যেতে পারে গণতন্ত্র। তা' ছাড়া ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক কর্ণধাররা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ককে স্বেচ্ছায় তিক্ত হয়ে উঠতে দেন তবে পৃথিবীতে ইংল্যাণ্ডের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। তার ফলে আমেরিকার প্রতি ইংল্যাণ্ডের ঔদাসীন্যের সুযোগে পরিধি বিস্তারে উৎসাহী হয়ে উঠবে রুশিয়া, আর ইংল্যাণ্ড তখন হয়ে পড়বে সেই রুশিয়ার কৃপাপাত্র। নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও যেমন, ইংল্যাণ্ডের পক্ষেও তেমনই অচল।

আর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদও রুশীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যুত্তর নয়। তার অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, অমঙ্গল।

আর আণবিক বোমাও নয়। কোন কোন আমেরিকান গলাবাজ আগামী কাল অপরাহ্ণেই মস্কো-এর উপর ফেলতে চান আণবিক বোমা। গণতন্ত্রের বন্ধু এঁরা? না। এঁরা সব হচ্ছেন

গণতন্ত্রের শত্রু। গণতন্ত্রে বিন্দুমাত্র আস্থা নেই এঁদের। সোবিয়েৎ স্বৈরতন্ত্রের উপর শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে পারে গণতন্ত্র, এ বিশ্বাস নেই এঁদের।

আমার আছে।

অতএব চলতে থাকুক গণতন্ত্রী দেশগুলো আর রুশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা। রুশিয়া যদি জয়লাভ করে, তবে অস্তিত্ব থাকবে না গণতন্ত্রের। আর রুশিয়ার সঙ্গে রাজনীতির এ দাবাখেলায় যদি গণতন্ত্রের জয় হয়, তবে তিরোহিত হবে ভয়াবহ কুরুক্ষেত্রের সম্ভাবনা।

সোবিয়েৎ-বহির্ভূত সমগ্র জগৎকেই, একা যুক্তরাষ্ট্রকেই নয়, নাবতে হবে সোবিয়েৎ রুশিয়ার বিপক্ষে এ রাজনৈতিক সমরাঙ্গনে। আমার বিশ্বাস জয়লাভের উপযোগী নির্ভুল সমর-কৌশল অনুসরণ করলে গণতান্ত্রিক দেশগুলোরই জয় হবে। কী সে সমর-কৌশল ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ নিবারণের উপায়

এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এই পৃথিবী। অর্থ নৈতিক দুর্দশা গ্রাস করে ফেলতে পারে সমগ্র জগৎকে। বেধে উঠতে পারে তৃতীয় কুরুক্ষেত্র, লক্ষ লক্ষ লোক হতে পারে হতাহত। গণতন্ত্রই যেতে পারে বিলুপ্ত হয়ে। নৈরাশ্যবাদ নয় এ। এ-ই হচ্ছে খাঁটি সত্য। নৈরাশ্যবাদী বলছেন কিছুই করবার উপায় নেই। অবস্থাটাকে হেসে উড়িয়ে দেন নৈরাশ্যবাদী, উৎফুল্ল হয়ে ওঠার ভাণ করেন, পড়েন খুন-খারাবির গল্প, হয়ে থাকেন মদের নেশায় ভরপুর। আশাবাদীর হালচাল হচ্ছে গুরুগম্ভীর। আশাবাদী হচ্ছেন যেন জেরেমিয়া। তাঁর বিশ্বাস একটা কিছু অবশ্যই করা যেতে পারে।

নিবারণ করা যেতে পারে তৃতীয় বিশ্ব-সমর। অনিবার্য যুদ্ধ বলে থাকতে পারে না কিছুই। আপনা থেকে বাধে না কোন যুদ্ধ; যুদ্ধ বাধাতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কী করে বাধানো হয়েছিল সে কথা লেখা আছে ছাপার হরফে, সবাই তা' পড়ে দেখতে পারেন। লক্ষ লক্ষ নিবুর্দ্ধিতার দ্বারা বাধাতে হয় একটা-একটা যুদ্ধ। জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, আর সময়োচিত কার্যের দ্বারা নিবারণও করা যেতে পারে এ সব।

"পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্যে নিরাপদ করার অভিপ্রায়ে" সততই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত গণতান্ত্রিক দেশগুলো। প্রথম বিশ্ব-সমর এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরে অংশ গ্রহণ করেছিল এ সব দেশ "পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্যে নিরাপদ করবার অভিপ্রায়ে।" কিন্তু দু'-দু'টি মহাসমরের মধ্যে "পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্যে নিরাপদ করার অভিপ্রায়ে" কিছুই করে নি তারা, আর সেই জন্যেই "পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্যে নিরাপদ করার অভিপ্রায়ে" ফের এক নতুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় তাদের।

এখনই যদি আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীকে স্বৈরতন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা আরম্ভ না করি, তবে পৃথিবীকে স্বৈরতন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে দশ কি পনেরো বছরের মধ্যে রুশিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হতে পারে আমাদের।

হয় শান্তির সময় লড়তে হবে তোমায় গণতন্ত্রের জন্যে, নয়, গণতন্ত্রের জন্যে লড়তে হবে তোমায় যুদ্ধের মধ্যে।

শান্তির সময় কী করে লড়বে তুমি গণতন্ত্রের জন্যে?

লড়বে গণতান্ত্রিক হয়ে।

প্রথম আণবিক মহাসমর প্রতিরোধ করার জন্যে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর হাতে রয়েছে কয়েকটি বৎসর—সম্ভবতঃ দশ বৎসরের মতো সময়। এই সময়ের শেষেও যদি আমেরিকা আর রুশিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক এখন যেমন রয়েছে তেমনই তিক্ত আর বিরক্ত হয়েই থাকে তবে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার রইল সমূহ সম্ভাবনা, কারণ যুদ্ধ-বিরতির পর বর্তমানে আমেরিকায় যে যুদ্ধ-বিরোধী

মনোভাব গড়ে উঠেছে ততদিনে তা' যাবে উবে, এবং রুশিয়ারও যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার বর্তমান অক্ষমতা আর বজায় থাকবে না। (স্তালিন হিসাব করে দেখেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বসমরের দরুন সোবিয়েৎ অর্থনীতির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার ঘা কাটিয়ে উঠতে তার লাগবে পনেরো বৎসর সময়।)

আগামী দশ বৎসরের মধ্যে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে সর্বত্র গণতন্ত্রের প্রসার-সাধন আর তার উন্নয়ন করতে হবে। সোবিয়েৎ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ-নিবারণের এ-ই হচ্ছে একমাত্র উপায়।

গণতন্ত্রের উন্নতি-বিধানের আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই গণতান্ত্রিক দেশগুলোর, আর থাকা চাই বাস্তব কর্মপন্থা।

গণতন্ত্রের উন্নতি-বিধানের দ্বারা গণতন্ত্রকে রক্ষা করার বিধি-ব্যবস্থা এবং সে সব বিধি-ব্যবস্থা কার্যে পরিণত করার ভার শুধু আমেরিকান রাজনীতিকদের 'পরে থাকলে চলবে না। অসীম সুখে বাস করে থাকে আমেরিকানরা, থাকে তারা বহু দূরে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতিরিক্ত আস্থা তাদের; পৃথিবীর সম্মুখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে যে সব অসুবিধা তার গভীরতা অনুধাবন করতে অপারগ তারা। "অবাধ কর্মোদ্যম আর স্বাধীনতা চমৎকার জিনিষ, নয় কি? তবে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনটা কোথায়? শুধু যদি রুশিয়া এসে বাদ না সাধত তবে সব কিছুই হতে পারত ঠিক মনের মতন।" তাই তাদের একমাত্র প্রস্তাব হচ্ছে, "রুশিয়ার সঙ্গে কড়া ব্যবহার করো," আর "কম্যুনিস্ট

দলকে রাখো দাবিয়ে।” এই মনোভাবই পৃথিবীর বৃহত্তম সমস্যার যথাযথ সমাধানে রক্ষণশীলদের আর প্রতিক্রিয়াপন্থীদের রেখেছে ব্যাহত করে। তারা জানেই না কী কঠিন এ ব্যাধি।

অবস্থা এমনই ভয়াবহ যে, এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছে এক মহাসমাধানের। কিন্তু বহু রাজনীতিক যেন এসে ঠেকে গেছেন এক অচল অনড় অবস্থার মুখে, আর জাতীয় শক্তির বেড়াজালে আটকে পড়ে অধিকাংশ লোকেরও অবস্থা হয়েছে তথৈবচ। বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী যখন আলোচনা করতে বসেন কোন সীমান্তরেখা থাকবে দশ মাইল পূবে, না সরে যাবে আট মাইল পশ্চিমে, তখন তা' দেখে-শুনে পরিতাপ করতে হয় মনে মনে; তাঁদের উচিত হচ্ছে সীমান্তরেখা মুছে ফেলবার কথা নিয়ে আলোচনা করা। আরও বেশি পরিতাপের বিষয় হচ্ছে জার্মানীকে কতটা শ্রমশিল্প-সম্ভার উৎপাদনের অনুমতি দান করা উচিত তা' নিয়ে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টকে আলাপ-আলোচনা করতে দেখা। পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ লোক যখন রয়েছে অনশনে, পড়ে আছে রোগজীর্ণ দুর্বল অবস্থায়, মারা যাচ্ছে শুধু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে, তখন যে-কোনও কারণেই হোক না কেন, উৎপাদন বন্ধ করাটা হচ্ছে এক অপরাধ। তবুও দৃশ্যতঃ সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিরাই জার্মানীর জন্যে করেছেন এ হেন এক অপব্যবস্থা। ফের লড়াই বাধিয়ে দিতে পারে জার্মানী এই হচ্ছে তাঁদের ভয়। আপন বুদ্ধিবলে মাটি, বাতাস, জল, আর তার নিজের মধ্যে থেকে যে শক্তি আহরণ করেছে মানুষ, তাকে সংযত

রাখা যে মানুষেরই পক্ষে আজ হয়ে উঠেছে অসম্ভব, এ হলো সে বিষয়েরই স্বীকৃতি।

বুদ্ধি আছে বটে এ সব রাজনীতিকদের। কিন্তু যত সব জরাজীর্ণ অচল মতবাদের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছেন এঁরা। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে এঁরা সবাই ঢালাই করতে চেষ্টা করছেন উনবিংশ শতকের ছাঁচে; কোন কাজই হচ্ছে না তাতে। জেট-বৈমানিকতা আর আণবিক বিজ্ঞানের জগৎকে জোর করে চেপে ধরে জাতীয়তাবাদের পুরাতন আঙরাখার মধ্যে পুরতে চেষ্টা করছেন এঁরা; আর তারই জন্যে শোনা যাচ্ছে ব্যথার এ কাৎরানি।

একমাত্র আন্তর্জাতিকতার মধ্যে দিয়েই রক্ষা পেতে পারে গণতন্ত্র।

উদাহরণ-স্বরূপ রুহ্‌রের (Ruhr) কথাই ধরা যাক। ইউরোপের মধ্যে শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধতম ও সব চেয়ে অগ্রণী অঞ্চল হচ্ছে রুহ্‌র্। এ হলো ইউরোপীয় শ্রমশিল্পের হৃৎপিণ্ডের মতো। কিন্তু অতীতে সে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হতো শুধু এক জার্মানীর জন্যে, আর যেহেতু জার্মানীর পক্ষে তা' ছিল প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত বড় সেই হেতু সমগ্র দেহের সন্ধানে বার হয়ে দু'-দু'বার ইউরোপ জয়ের চেষ্টা করেছিল জার্মানী।

এখন কী কর্তব্য? হৃৎপিণ্ডের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে তা' ফেলে দিতে হবে, আর তাতে করে মূল্যবান উৎপাদন বিনষ্ট করার, আর বহু লোকের প্রাণহানির কারণ হতে হবে? কোন

কোন গবর্ণমেণ্ট থেকে উঠেছিল এই প্রস্তাবই। ফ্রান্সকে দান করতে হবে সমগ্র রুহ্‌র্‌ অঞ্চল ? তা' হলে হৃৎপিণ্ডটি অতিরিক্ত রকমে বড় হয়ে উঠবে ফ্রান্সের পক্ষে, আর জার্মানীর জন্যে অবশিষ্ট থাকবে না সামান্য নাড়ীর স্পন্দনটুকুও। তবুও এই দাবিই করেছিল ফ্রান্স। অথবা সমগ্র দেহের, অর্থাৎ ইউরোপের, সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের যোগসাধন করতে হবে, যাতে করে রুহ্‌র্‌ থেকে রক্তসঞ্চালন হতে পারে জার্মানীতে, ফ্রান্সে, সমগ্র ইউরোপে ? সে-ই হবে অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকতা। ধরাপৃষ্ঠের বহু ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজন সচ্ছল ব্যবসাবাণিজ্য, সুপরিচালনা, তেজী বাজার, সাধারণ মানবকুল, আর শান্তির জন্যে। জাতীয়তা হচ্ছে স্পষ্টতঃই পঙ্গু আর অচল।

জাতিতে জাতিতে ছেঁড়া সূতোর রিফুকর্ম, তা' সে অর্থনৈতিক ব্যাপারেই হোক, নয় তো রাজনৈতিক ব্যাপারেই হোক, কোন কাজের কথাই নয়। ফ্রান্সে নির্বাচন শুরু হবার প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে ফরাসী সমাজতন্ত্রী দলের নেতা লেওঁ ব্লুম (Leon Blum) যখন ওয়াশিংটন পরিদর্শনে যান তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এক ঋণ দান করে ফ্রান্সকে। আমেরিকা চাইত না যে কম্যুনিস্টরা নির্বাচনে জয়লাভ করে। হয়তো ঋণদানের প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে যে সঙ্কট তার, কিংবা শুধু ফ্রান্সেরই সঙ্কটের, বিরুদ্ধে লড়াই করার পন্থা এ নয়। কেন না ঋণদান করা হয়েছে, তবুও কোন অসুবিধাই ঘোচেনি।

গ্রীসের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক খোলষ জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই গ্রীস পেল ঋণসাহায্য। মনে হচ্ছে বুঝি তুরস্কেরও খোলষ এসেছে পাতলা হয়ে। তুরস্কও পেল ঋণ-সাহায্য। কিন্তু যে কোন স্থানেরই খোলষ ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে, কেন না এ হচ্ছে সে-ই জীর্ণ, বহুবারের রিফু-করা পাতলা খোলষ।

ভারতবর্ষের প্রয়োজন ইস্পাতের। ভারতবর্ষ যদি পারত আমেরিকার কাছ থেকে ইস্পাতের কারখানা কিনে ফেলতে, তবে ভারতবাসীরা উপার্জন করত বেশি টাকা, আর হয়তো কিনত আরও বেশি ফরাসী মাল। তার ফলে ফরাসীরা যদি কিনত আরও বেশি গ্রীসের তামাক, রুহ্‌র্‌ যদি বিনা বাধায় পণ্য উৎপাদন করতে পারত আর কিনত আরও বেশি গ্রীসের তামাক, আর যদি গ্রীসের উত্তরাঞ্চলের শ্লাব প্রতিবেশীরা গ্রীসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিবৃত্ত হতেন, তা' হলে হয়তো গ্রীসে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত কোন মধ্যপন্থাবলম্বী গবর্ণমেণ্ট আর সুখেস্বচ্ছন্দে চলতে পারত গ্রীস। হয়তো বা গ্রীক-সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে গ্রীসের বাইরে থেকেই।

অনেক সময় জাতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করে আন্তর্জাতিক ভাবে সে বিষয়ে হাত দিলে পর। অনেক সময় অর্থনৈতিক সমস্যা হয় মূলগত সমস্যা, অথচ তৎসংক্রান্ত রাজনৈতিক বিপত্তি দূর না হওয়া অবধি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপই করা যায় না।

ব্যাপারটা খুবই সোজা ; ছাড়া ছাড়া ভাবে কাজ করলে চলবে না। কোন ব্যাঙ্কের দ্বারা চলবে না এ কাজ। কোন একটি মাত্র গবর্ণমেণ্টের দ্বারাও চলবে না। গণতন্ত্রের উন্নতি-বিধান আর যুদ্ধনিবারণের জন্যে চাই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। গণতন্ত্রের জয়লাভের এই হলো অন্তরতম কৌশল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে আন্তর্জাতিক গবর্ণমেণ্ট।

এ কথা শুনতে ভয়াবহ এবং বিপ্লবাত্মক। তা' বটে। কিন্তু এ ছাড়া ক্রমাগতই হোঁচট খেতে থাকবে পৃথিবী। হোঁচট খেতে খেতে, আর তালির পর তালি লাগিয়ে, চলতে থাকব আমরা, নষ্ট করব সময়, কিন্তু শেষ অবধি যে করেই হোক পৌঁছুব এসে এখানেই। আন্তর্জাতিক গবর্ণমেণ্টের দিকে ইতিমধ্যেই পা বাড়িয়েছি আমরা।

আন্তর্জাতিক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে শুনতে পাওয়া যায় কয়েকটা আপত্তি :

এক নম্বর আপত্তি : "লোকে আন্তর্জাতিকতার জন্যে প্রস্তুত নয় ; আগের চেয়েও বেশি জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছে পৃথিবী।"

এ কথা যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়ে থাকে, কিন্তু তা' নয়। আজকের দিনের এই ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি হচ্ছে আতঙ্ক আর নিরাপত্তার অভাব থেকে। আবার এরই ফলে উপজাত হয় নতুন করে আতঙ্ক আর নিরাপত্তার অভাব। এই ভাবে আপনা থেকেই এ আতঙ্ক আর নিরাপত্তার অভাব পরি-

পুষ্টি লাভ করতে করতে কেবলই বিকট আকার ধারণ করছে। আন্তর্জাতিকতায় এসে পৌঁছুবার জন্যে জাতীয়তাবাদের শিরদাঁড়া কবে ভেঙে পড়বে তারই অপেক্ষায় বসে বসে দিন গুণলে চলবে না। আপনা থেকে এর শিরদাঁড়া ভেঙে পড়বে না কোনদিনই। শুধু এক আন্তর্জাতিকতার উদ্ভব হলেই ভেঙে পড়বে এর শির-দাঁড়া। আন্তর্জাতিকতা ডেকে আনতে সাহায্য করবে নিরা-পত্তাকে, নিরাপত্তা দূর করবে আতঙ্ককে। যেখানে ভয় নেই সেখানে জাতীয়তাবাদও নেই। আন্তর্জাতিক গবর্ণমেন্ট জাতীয়তাবাদের ক্ষয় সাধন করবে, আর তাতে করেই দূরে সরে যাবে যুদ্ধের বিভীষিকা।

দুই নম্বর আপত্তি: "যে হচ্ছে গণতন্ত্রের ভক্ত, আর একচেটে ক্ষমতাকে চলে ভয় করে. সে কেমন করে এক মহাশাসনযন্ত্রকে (super-government) স্বীকার করবে, যে মহাশাসনযন্ত্র তার পরিধি এবং কর্মের প্রসারের বলেই অসম্ভব রকমের শক্তির ধারক হয়ে উঠতে বাধ্য ?"

চোখের 'পরে সমগ্র পৃথিবী আজ দেখছে একদিকে আমেরিকা আর রুশিয়ার ক্ষমতার সম্প্রসারণ, আর-একদিকে দুর্বলতর দেশগুলোর স্বাধীনতার সঙ্কোচন। শক্তিমানের কবল থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্যে যদি না কোন আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় তবে চলতেই থাকবে এ ব্যাপার, এবং যাবতীয় ক্ষুদ্রতর জাতি-অধ্যুষিত দেশ হয়ে উঠতে পারে এই দুই শক্তিমান জাতির প্রাধান্য লাভের দ্বন্দ্বক্ষেত্র। কোনরূপ আন্তর্জাতিক

সরকারের অভাবে একটি জাতি—হয় শুধু আমেরিকা, নয় রুশিয়া—হুকুমদারি করবে সারা পৃথিবীর উপর, আর অন্যান্য সকল জাতিকে রাখবে তার তাঁবে। বাস্তবিক সে-ই হয়ে উঠবে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহাশাসনযন্ত্র। এ বিপৎপাত ঘটবার আগেই, এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলোর স্বাধীন ভাবে কাজ করবার সময় থাকতে থাকতেই, ছোট-বড় সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশকে এক আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে একতাবদ্ধ হতে হবে। এই ঐক্যবদ্ধ সরকারের থাকবে বিশেষ কতকগুলো অধিকার, থাকবে সদস্য জাতিদের সরকারদেরও, অর্থাৎ বর্তমান জাতিদের। পরস্পরের মধ্যে বিধিনিষেধ এবং সাম্য রক্ষার ব্যবস্থার ফলে সংযত থাকবে সবলেরা; ইউরোপ, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আর আফ্রিকায় যে সব আঞ্চলিক যৌথ প্রতিষ্ঠান থাকবে, সেগুলো সেই বিশ্বজনীন শাসনযন্ত্রের দ্বারা ক্ষমতার যে-কোন রকমের অপপ্রয়োগ সম্বন্ধেই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে; অবশ্য কোন অবস্থায়ই সে আন্তর্জাতিক শাসন-যন্ত্রকে মানবিক জীবনযাত্রার যাবতীয় ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। ক্ষুদ্রতর শক্তিবর্গের অস্তিত্ব-রক্ষার সব চেয়ে চমৎকার সুযোগ হচ্ছে এই, আর আন্তর্জাতিক শাসনযন্ত্রই যখন হলো শান্তি ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় তখন এ জিনিষটি যুক্তরাষ্ট্রেরও মনঃপূত হওয়া উচিত।

তিন নম্বর আপত্তিঃ "এই প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক শাসনযন্ত্র থেকে রুশিয়াকে জেনে শুনেই বাদ দেওয়া হচ্ছে কেন?"

রুশিয়াকে বাদ দেওয়া হচ্ছে এই জন্যে যে, ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র, মিশ্র অর্থনীতি, কিংবা সামাজিক গণতন্ত্রকে (Social Democracy) নববলে বলীয়ান হয়ে উঠতে সাহায্যে করবে না রুশিয়া। মতবাদ এবং আচরণ দু'দিক থেকেই বলশেভিজ্‌ম্ হচ্ছে ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র, মিশ্র অর্থনীতি, এবং সামাজিক গণতন্ত্রের বিরোধী। এর মুখপাত্ররা এবং এর পৃষ্ঠপোষকগণ অপছন্দ করেন এ সব জিনিষ, আক্রমণও করে থাকেন এ সব ব্যাপারকে। তবে আর কী করে আশা করা যাবে যে, রুশিয়া এ সব ব্যাপারকে নববলে বলীয়ান করে তুলবে ?

যুদ্ধ-নিবারণ এবং আপন অস্তিত্ব-রক্ষার জন্যেই গণতান্ত্রিক জগৎকে সমাধান করতে হবে গণতন্ত্রের যাবতীয় সমস্যা। এ সব সমস্যার সমাধানে সোবিয়েৎ স্বৈরতন্ত্রের স্বভাবতঃই নেই বিন্দুমাত্র আগ্রহ। পক্ষান্তরে, তা' বরং জার্মানী, চীন, গ্রীস, এবং প্রায় সর্বত্রই বাড়িয়ে তুলেছে এ সব সমস্যাকে।

গণতান্ত্রিক জগতের বর্তমান বিপর্যস্ত এবং অবসাদগ্রস্ত অবস্থার কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সাধন এবং উন্নতিবিধানে তার বিলম্ব। এই বিলম্বই কম্যুনিজ্‌ম্‌কে দিয়েছে প্রসারতা-লাভের এক সুবর্ণসুযোগ। এখন গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে নিজ নিজ পরিবর্তন-সাধন এবং উন্নতিবিধান করে, তবেই ঠেকাতে হবে কম্যুনিজ্‌ম্‌কে। কিন্তু কম্যুনিজ্‌ম্‌কে ঠেকানোর কারবারে রুশিয়া নেই।

জগৎকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে এবং এমন সব

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে যাতে করে ঘটবে গণতন্ত্রের সমৃদ্ধি আর কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর ক্ষয়, এই আশায় রুশিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিজেদের শক্তিক্ষয় করে চলেছেন কূট-নীতিকরা। বাস্তবিকই কি তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এ কাজে সহযোগিতা করবে মস্কো? বাস্তবিকই কি তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের এই সব সম্মিলন এবং চুক্তি কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর সম্প্রসারণ-সাধনে রুশিয়ার আন্তরিক ইচ্ছাতে, কিংবা গণতন্ত্রী হিসাবে তাঁদের নিজেদের যে ইচ্ছা, অর্থাৎ কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর অগ্রগতি-রোধ তাতে, কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে?

রুশিয়া আর গণতান্ত্রিক দেশগুলো চায় বিপরীত জিনিষ। কী করে একসঙ্গে পথ চলবে তারা? শান্তির জন্যে? আড়ষ্ট মনোভাবকে শান্তি বলে না। শান্তির সময়েও জাতিতে জাতিতে চলে কসরৎ। সব সময়েই চলে তা। এখনও চলেছে। আজ সে কসরৎ বড়ই কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষ এক মুহূর্তে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করছে, এই ব্যাপারের অর্থ এই নয় যে তখন সে শান্তিকে তলে তলে ক্ষইয়ে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে না। শান্তির অর্থ এই হতে পারে, অনেক সময়ই তা' হয়েওছে, যে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে যুদ্ধের দিকে। পৃথিবী—অবশ্য স্পেন আর চীনকে বাদ দিয়ে—শান্তিতে ছিল ১৯৩৭ আর ১৯৩৮ সালে। কিন্তু সে শান্তি শান্তি ছিল না; আর গণতান্ত্রিক দেশগুলো যদি বুঝত যে তা'

শান্তি ছিল না, তবে দ্বিতীয় বিশ্বসমর প্রতিরোধের জন্যে সে সব দেশ কিছু-না-কিছু করতেও পারত।

অতএব এ কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, "আমি চাই শান্তি।" সেই রকমের শান্তিই কামনা করতে হবে তোমায় যা' যুদ্ধের ভূমিকা নয়, কিংবা নয় যুদ্ধের প্রস্তুতি। যাই ঘটুক না কেন, এখন বৎসর কয়েক শান্তিতেই থাকব আমরা: সে হচ্ছে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অবসাদের শান্তি। এই অবকাশটুকুর মধ্যে কী ঘটতে থাকবে? যদি রাজনৈতিক মতবাদের দ্বন্দ্বেই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সে অবসরটুকু তবে তা' শান্তি পদবাচ্য হবে না এবং সেটা স্বীকার করাই ভালো হবে আমাদের পক্ষে।

"শান্তি, শান্তি" বলে চিৎকার করে বেড়ায় যে লোক, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের এই প্রাণঘাতী প্রশ্ন সম্বন্ধে তার মতামত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা দরকার তার পক্ষে। সে কি বলতে চায় যে, পৃথিবীময় গণতান্ত্রিক দেশগুলো সমৃদ্ধ করে তুলছে গণতন্ত্রকে? যদি তার উত্তর হয় 'না', তবে সে হচ্ছে কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর সম্প্রসারণের পক্ষে, এবং এই ব্যাপারের সমাপ্তি ঘটবে যুদ্ধে, কিংবা গণতন্ত্রের সমাপ্তিতে। যদি তার উত্তর হয় 'হাঁ', যদি সে গণতন্ত্রের পক্ষ থেকে কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে চায়, তবে কম্যুনিস্ট রুশিয়া কিংবা কম্যুনিস্ট যুগোশ্লাবিয়া অথবা রুশিয়ার উপনিবেশগুলোর সঙ্গে এক সঙ্গে এ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে পারে না সে।

শান্তির সময়ে পৃথিবীর রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থ নৈতিক,

সামাজিক, কিংবা সাংস্কৃতিক সমস্যাসমূহের সমাধানে সহ-যোগিতার আগ্রহের বাস্তব লক্ষণ সোবিয়েৎ সরকার, দেখিয়ে থাকলেও, দেখিয়েছেন কমই। তত্ত্বকথা ছেড়ে যখন আমরা প্রকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে নেবে আসি তখন এরূপ সহযোগিতার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে, বাস্তবিক কার্যতঃ খুঁজে পাওয়া অসম্ভবই হয়ে পড়ে। অতএব "পৃথিবী এক" এই মনগড়া তত্ত্বকে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ঐক্য-সাধন ও উন্নতি-বিধানের কাজে বাধা দান করতে দেওয়া উচিত নয়।

একই বাড়ীতে দু'টি পরিবার পরম বন্ধুভাবে বাস করতে পারে। কিন্তু ঘরদোর ঝাঁট দেওয়ার পালা এবার কার, কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্যাস খরচ করছে কে, এই নিয়ে যদি তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে ওঠে তবে তাদের বন্ধুত্বের খাতিরেই একপক্ষের উচিত সে বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে গিয়ে ওঠা—তাতে বন্ধুত্ব বজায় থাকতে পারে।

আণবিক বিজ্ঞানীদের সভায় মুচিদের সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা থাকতে পারে না। কোন উদারনীতিকদের সভায় ফাসিস্তদের নেই প্রবেশাধিকার। উদারনীতিকদের গ্রহণ করা হয় না কম্যুনিস্ট-দলে। কুসংস্কার অথবা হীন স্বার্থপরতার বশে লোককে আলাদা করে রাখা ভব্যতার বিরোধী। কিন্তু মতবাদের পার্থক্য অথবা কর্মপদ্ধতির পার্থক্যের দরুন যে আলাদা করে রাখা হয়, তা' হচ্ছে একটি প্রাত্যহিক, অনস্বীকার্য ব্যাপার।

সোবিয়েৎ জনগণের প্রতি বিরূপ মনোভাবের দরুন সোবিয়েৎ য়ুনিয়নকে আন্তর্জাতিক সরকার থেকে আলাদা করে রাখা হবে না। এ হবে শুধু পৃথক স্বার্থ ও পৃথক কর্মপদ্ধতির স্বীকৃতি,—এই সব পার্থক্যই, বিবরণী থেকে যেরূপ বোঝা যায়, সোবিয়েৎ সরকারকে সোবিয়েৎ-বহির্ভূত জগতের সঙ্গে সহযোগিতায় বাধা দান করে এসেছে।

রুশিয়াকে বাদ দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সরকার গড়ে তুললে, তা' সোবিয়েৎ য়ুনিয়নের প্রজাদের পক্ষেও প্রচুর সুবিধার কারণস্বরূপ হয়ে উঠবে। কেন না গণতান্ত্রিক দেশগুলো যদি এ কথা বুঝতে শুরু করে যে, শান্তির জন্যে চাই তাদের নিজেদের নানা রকমের বাধাবিপত্তির সমাধান, আর যদি, মস্কো-এর সঙ্গে উষ্মাজনক অনর্থক আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পরিবর্তে, এ সব দেশ নিজেদের বিবিধ বাধাবিপত্তি দূরীকরণের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবে তাদের মন থেকে এই অলীক ধারণা দূর হয়ে যাবে যে, তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও সুখশান্তির জন্যেই রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের একান্ত প্রয়োজন। তা' ছাড়া আন্তর্জাতিক সরকার দুর্বল দেশগুলো অধিকার করা থেকে রুশিয়াকে নিবৃত্ত করবে। আন্তর্জাতিক সরকার হবে রুশিয়ার চেয়ে প্রবল। এইভাবে রুশিয়ার সম্প্রসারণ বন্ধ করার ফলে তৃতীয় বিশ্বসমর নিবারিত হবে। দীর্ঘকালের স্থায়ী শান্তি রুশিয়ায়ও এনে দেবে গণতন্ত্র।

আজ গণতান্ত্রিক জগৎ আর রুশিয়ার মধ্যে বিরুদ্ধভাব আর

উষ্মা উঠেছে প্রবল হয়ে—ক্রমশঃ তা' প্রবলতর আকার ধারণ করছে। এ সব হচ্ছে ভয়ের কথা। এ সব ব্যাপারের কারণ হচ্ছে এই যে, এই দু'টি জগৎই বাস করছে এক বাড়ীতে, আর যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেই একত্র বসবাসের ফলে, সে সব সমাধানযোগ্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলেছে সেই অবস্থারই মধ্যে থেকে। পৃথক হয়ে যাক এরা, তা' হলেই রুশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ এবং কূটনৈতিক সম্বন্ধ উঠবে ভালো হয়ে।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোর যদি থাকত এমন কোন অস্ত্র যার বলে তারা নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতি কাটিয়ে উঠতে পারে, তবে লোপ পেয়ে যেত রুশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ, এবং রুশিয়ার সঙ্গে লড়াই করার দুশ্চিন্তা। এই কাজেই তখন মনোযোগ দিত এ সব দেশ। সাফল্য থেকে আসত শান্তি।

অস্ত্রশস্ত্রের 'পরে নির্ভর করে না শান্তি, নির্ভর করে না কূটনীতির 'পরেও। শান্তির নির্ভর হচ্ছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ও নৈতিক আত্মোন্নতি আর আন্তর্জাতিকতার 'পরে।

চার নম্বর আপত্তি: "জাতিপুঞ্জের (United Nations) কী হবে? আন্তর্জাতিক সরকার কি এসে জাতিপুঞ্জের স্থান অধিকার করে বসে জাতিপুঞ্জকে ধ্বংস করে ফেলবে না?"

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভয় ছিল যে, আমেরিকার জনসাধারণ হয়তো জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণে বাধা দেবে, আর তাতে করে জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) বেলায় যেমনটি হয়েছিল সেভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাত-পা এবারও দেবে বেঁধে; এই

ভয়ের বশেই যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ১৯৪৪ আর ১৯৪৫ সালে জোর প্রচারকার্য চালিয়ে এর দর দিয়েছে বাড়িয়ে। এরই জন্যে অতিরিক্ত আশার জাল বোনা হয়েছে জাতিপুঞ্জকে ঘিরে। এ প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ কার্যকারিতা আছে, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মতো ক্ষমতা এর নেই। ইতিমধ্যেই, এর জীবনযাত্রা সবে শুরু হতে না হতেই, রাজনীতিকরা এর সম্পর্কে ঠিক সেই ভাবেই ব্যবহার করতে লেগে গেছেন, আগেকার দিনে বিভিন্ন দেশের সরকার জাতিসঙ্ঘ সম্পর্কে যেভাবে ব্যবহার করতেন, এবং এ-ও ঠিক সেই একই কারণে। তাঁরা একে অগ্রাহ্য করেই চলছেন। ফাসিস্ত ইতালীর বিরুদ্ধে জাতিসঙ্ঘ তেল এবং অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, বড় বড় শক্তিরাই তা' দিয়েছিল গোপনে বানচাল করে। সে অকৃতকার্যতার পর, London Non-Intervention Committee-র কোলের 'পরে বসিয়ে দেওয়া হয় স্পেন সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে; এই কমিটী ইতরের মতো তার উদ্দেশ্যের বিকৃতি সাধন করে ফ্রাঙ্কোকে জয়লাভে সাহায্য করলে। ১৯৩৮ সালে চেকোশ্লোভাক সংক্রান্ত সঙ্কট যখন দেখা দিল তখন যদিও জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন চলছিল, তবুও সে প্রশ্ন আলাদা করে রাখা হয় নেভিল চেম্বারলেন আর এতুয়াদ´ দালাদিয়ের-এর বে-দরদী খোশখেয়ালের জন্যে, আর তাঁরা দু'জন তখন ছুটে যান মিউনিকের বেদীমূলে এবং সেখানে গিয়ে বলিদান করে আসেন মেষশাবকটিকে।

ঠিক এইভাবেই আজ সত্যিকারের দরকারী যত সব প্রশ্ন তা' নিয়ে বিধিব্যবস্থা হচ্ছে জাতিপুঞ্জের বাইরে, কারণ জাতিপুঞ্জের নেই অর্থবল, নেই পুলিশী ফৌজ, নেই সার্বভৌমত্ব, নেই কোন শক্তি।

এর সব চেয়ে বড় দোষ হচ্ছে 'ভেটো' করবার ক্ষমতা। স্যান ফ্র্যান্সিসকো শনদ, যাকে স্বর্গরাজ্যের ছাড়পত্র বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল সবাই, তার পাঠ অনুসারে একমাত্র নিরপত্তা-পরিষৎই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে যুদ্ধ নিবারণ করতে পারে। এগারো জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই নিরাপত্তা-পরিষৎ : পঞ্চ-মহারথী (যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েৎ য়ুনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, আর চীন), এরা সব হচ্ছে স্থায়ী সদস্য, আর অল্পকালের জন্যে নির্বাচিত ছয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অথবা মাঝারি রকমের জাতি। স্থায়ী সদস্যদের প্রত্যেকেরই রয়েছে 'ভেটো' করবার অধিকার। ধরা যাক পঞ্চ-মহারথীর কেউ করলে এক আক্রমণাত্মক কাজ। জুরীদের অপর দশ জন সদস্যই ভোট দিলে 'অপরাধী' বলে, কিন্তু একাদশ সদস্য, অর্থাৎ অপরাধী আক্রমণকারী নিজে, ভোট দিলে 'না', আর তখন জাতিপুঞ্জ, জাতিপুঞ্জ হিসাবে, তার কিছুই করতে পারে না। তখন এর সদস্যদের, শান্তি রক্ষার জন্যে কাজ করতে গিয়েই, কাজ করতে হবে জাতিপুঞ্জের বাইরে এসে, অর্থাৎ জাতিপুঞ্জকে ভেঙে দিয়ে। স্পষ্টতঃই 'ভেটো' হচ্ছে জাতীয়

সার্বভৌমত্বের এক অন্যায় রকমের বহিঃপ্রকাশ। শক্তিমান জাতি হচ্ছে আইনের উর্ধ্বে। সে হলো সার্বভৌম।

স্যান ফ্র্যান্সিসকো শনদে ভেটো সংক্রান্ত ব্যাপারটা যে স্থানলাভ করেছে সব চেয়ে শক্তিমান জাতি যুক্তরাষ্ট্রের এবং শক্তির মাদকতায় সব চেয়ে মত্ত রুশিয়ার আগ্রহাতিশয্যের ফলে এইটেই হচ্ছে গিয়ে এক তাৎপর্যময় ব্যাপার। সে যাই হোক, জাতিপুঞ্জের মধ্যে অসংখ্য বার ভেটো চালিয়েছেন সোবিয়েৎ সরকার, যুক্তরাষ্ট্র নয়।

ক্ষমতাকে সংযত করা যায় সুসংহত শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট আইনের বলে। আত্মরক্ষার জন্যে আইন প্রয়োগের প্রয়োজন সব চেয়ে কম হলো প্রবল জাতির পক্ষে, আর তার শিকার হতে চলেছে যে জাতি তাকে রক্ষা করার জন্যে আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে সব চেয়ে কম আগ্রহ থাকে সেই প্রবল জাতির।

ভেটো সংক্রান্ত ক্ষমতার কিছু কিছু পরিত্যাগ করার আগ্রহ দেখিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চীন, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড, নিউ জীল্যাণ্ড, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি নানা দেশের সরকার এবং বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি শান্তির পরিপন্থী বলে খোলা-খুলি ভাবেই ভেটো সংক্রান্ত অধিকারকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু ভেটো অধিকারের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচন-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করেছেন সোবিয়েৎ সরকার এবং যিনিই এর ব্যবহার নিয়ে করেছেন সমালোচনা তাঁরই গায়ের চামড়া নিয়েছেন ছিঁড়ে। সোবিয়েৎ সরকারের মুখপাত্রেরা জাতীয়

সার্বভৌমত্বের আদর্শ রক্ষার জন্যে করে এসেছেন জোর ওকালতি। রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ নীতিতে যে নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটেছে সেদিক থেকে এ ব্যাপারটা স্বাভাবিকই বটে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোবিয়েৎসমূহ যখন ছিল কম জাতীয়তাবাদী তখন তারা জাতীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে এমন জোর ওকালতি করত না।

উঠিয়ে দেওয়া উচিত ভেটোর ব্যাপারটাকে। জাতিপুঞ্জকে প্রকৃতপক্ষে কার্যকর আন্তর্জাতিক সরকারে পরিণত করার পথে সে-ই হবে এক লম্বা ধাপ।

কেউ কেউ এই যুক্তি দেখিয়ে থাকেন যে, ভেটো ছাড়া সোবিয়েৎ য়ুনিয়ন সব সময়ই ধনতান্ত্রিক জাতিদের একতার ফলে একঘরে হয়ে থাকত। ভেটো রয়েছে বলে একা রুশিয়াই পারে সব শক্তিকে একঘরে করে রাখতে। ভাষান্তরে, এই অদ্ভুত যুক্তি অনুসারে, সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে রুশিয়াকে ভোটে পরাজিত করাটা অন্যায়, কিন্তু একা রুশিয়ার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভোটে পরাভূত করাটা হচ্ছে এক চমৎকার ব্যবস্থা। এ-ই হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের অঙ্কশাস্ত্র, এই তার যুক্তিবিজ্ঞান। এ হলো সংগ্রাম-প্রমত্ত জাতীয়তাবাদ, বলশেভিক জাতীয়তাবাদ। রুশিয়া যদি কেবলই সোবিয়েৎ-বর্হিভূত জগতের অবিচলিত বৈরিতা উপলব্ধি করতে থাকে, কী করে কাজ করবে তবে জাতিপুঞ্জ ?

পরিত্যাগ করতে হবে এই ভেটো। তাতে যদি রুশিয়া

বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, জাতিপুঞ্জকে ত্যাগ করে চলে যাবার স্বাধীনতা রয়েছে তার। একমাত্র যে ভিত্তির 'পরে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করতে পারে তা' স্বীকার করতে যখনই সে প্রস্তুত হবে তখনই তাকে সাদরে ফিরে নেওয়া হবে জাতিপুঞ্জে : সে ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিকতা।

১৯৩৯ সালে ঠিক যে মুহূর্তটি থেকে মস্কো তার এই বর্তমান প্রসার সাধনের পথে পা বাড়িয়েছে তার পূর্বে যে অবধি না স্তালিন তাঁকে বরখাস্ত করেন সে অবধি সমবেত নিরপত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্রদূত এবং তার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন রুশিয়ার পর-রাষ্ট্র-মন্ত্রী ম্যাক্সিম লিৎবিনোব (Maxim Litvinov)। জেনেভায় জাতিসঙ্ঘে সোবিয়েতের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে লিৎবিনোব নিয়মিত ভাবে আক্রমণ করে এসেছেন তথাকথিত 'বিশ্বজনীনতা'র ভাবকে। বিশ্বজনীনতা বা ঐক্যমতে আস্থা ছিল না তাঁর, কারণ এরই দৌলতে জার্মানী, ইতালী, কিংবা জাপান সমর্থ হয়েছিল জাতিসঙ্ঘকে পঙ্গু করে ফেলতে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৭ সালে স্পেনের রাজকীয় দলের জন্যে জাহাজে করে যে সাহায্য পাঠানো হচ্ছিল, মুসোলিনির "অজানা ডুবো জাহাজগুলোর" দ্বারা সেই সব জাহাজ ডুবিয়ে দেবার মতো দস্যুপনার কাজ সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে নিয়োনে (Nyon) যে সম্মিলন আহুত হয় তা' থেকে বুঝেসুঝেই কায়দা করে লিৎবিনোব ইতালীকে দেন সরিয়ে। লিৎবিনোব জানতেন যে ইতালীর উপস্থিতির ফলে ভেঙে যাবে সম্মিলন। ইতালী

উপস্থিত ছিল না, তাই সভার অন্যান্য উদ্যোক্তারা একমত হতে পারলেন, এবং কিছুকালের জন্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের সম্মিলিত টহলদার নৌবহর ভূমধ্যসাগরে ফাসিস্ত জলদস্যুপনা রোধ করতে সমর্থও হয়।

ভেটোর মধ্যেই রয়েছে 'বিশ্বজনীনতা', ঐক্যমত, এবং আক্রমণকারী আইনভঙ্গকারী জাতির হাতে উদ্যত চাবুক। এ হচ্ছে এক ব্যক্তির দ্বারা শাসিত একটি জাতির স্বৈরতন্ত্র। এ ধরণের জাতিপুঞ্জ বাঁচাতে পারে না গণতন্ত্রকে। গণতন্ত্রকে বাঁচাবার আগ্রহে মরছেনও না স্তালিন।

জাতিপুঞ্জের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তি কমিশনসমূহ আর ব্যক্তিবর্গ সৎকাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন জাতিপুঞ্জকে। জাতিসঙ্ঘেও ছিল এইরূপ নানা কমিশন আর ব্যক্তি। কিন্তু উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রাজনীতিকরা সচরাচর জাতিপুঞ্জকে কাজে লাগিয়ে চলেছেন পরস্পরকে উদ্ব্যস্ত করবার অভিপ্রায়ে।

পৃথিবীর মহাব্যাধিগুলো দূর করবার জন্যে যে জাতিপুঞ্জ করতে পারে না কিছুই, তেমন জাতিপুঞ্জের সার্থকতাটা কী? রুশিয়া যে শান্তি ও স্বাধীনতাকে ভালোবাসে তার প্রমাণ পেলে, রুশিয়াকে নিয়েই চলা ভালো জাতিপুঞ্জের পক্ষে। কিন্তু ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে আমাদের এই পৃথিবীর পক্ষে যে সব উপায় অবলম্বন করা দরকার সে সব উপায় অবলম্বনে জাতিপুঞ্জের মধ্যে এবং জাতিপুঞ্জের বাইরে রুশিয়া যে ভাবে এতাবৎ বাধা দিয়ে আসছে, যদি সে তেম্নি ভাবেই ক্রমাগত বাধা দান

করতে থাকে, তবে রুশিয়াকে বাদ দিয়েই চলা ভালো জাতি-পুঞ্জের পক্ষে।

জাতিপুঞ্জকে যতদিন অবধি না গণতন্ত্রের উন্নতিবিধানের এক যন্ত্ররূপে পরিণত করা যায়, ততদিন অবধি রুশিয়া একে ব্যবহার করবে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ আনয়নের, আর শেষ অবধি গণতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনের অস্ত্ররূপে।

অবিলম্বে জাতিপুঞ্জের শনদে পরিবর্তন সাধন করে, সমৃদ্ধি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এবং শান্তি আনয়নে সক্ষম আন্তর্জাতিক সরকারে পরিণত করতে হবে জাতিপুঞ্জকে।

আন্তর্জাতিক সরকার নয় জাতিপুঞ্জ। ঢেলে সাজতে হবে একে আন্তর্জাতিক সরকার রূপে। খুব সম্ভব যে মুহূর্তে বিভিন্ন জাতি একে আন্তর্জাতিক সরকার রূপে ঢেলে সাজতে বসবে সেই মুহূর্ত থেকেই একে ঢেলে সাজা শুরু হবে রুশিয়াকে বাদ দিয়ে এক আন্তর্জাতিক সরকার রূপে। দুঃখের বিষয়ই বটে। কিন্তু অন্যতর বিধান কী-ই বা আছে ? আন্তর্জাতিক সরকার গড়ে তোলার চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়ে, আমাদের জন্যে যা' না হলেই নয় সেই শান্তি ও গণতন্ত্রকে রক্ষার চেষ্টা বাদ দিতে হবে ? সে হবে রুশিয়ার বাধাদানকারী এবং শুধু কাগজপত্রে লেখা সদস্যপদ রক্ষার জন্যে অতিরিক্ত উচ্চমূল্য দান।

আন্তর্জাতিক সরকার ছাড়া মানবজাতি আজ যেমন চলেছে তেমনি গা ভাসিয়ে চলবে অরাজকতার মুখে। এরূপ অবস্থা হবে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ আর রুশীয় সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল,

এবং শেষ অবধি এই দুই শক্তির মধ্যে মহাযুদ্ধের সহায়ক। জাতিপুঞ্জে রুশিয়ার অসহযোগের দরুন সে হবে অতিরিক্ত মূল্যদান।

আন্তর্জাতিক সরকার সৃষ্টি যেমনটি মনে হয় তার চেয়ে অনেক সহজ হবে। জাতিপুঞ্জের অনেকগুলো এজেন্সী ইতিমধ্যেই কাজে লিপ্ত হয়েছে, এ সব এজেন্সীর মধ্যে রুশিয়া নেই। আরও আন্তর্জাতিক এজেন্সীর প্রয়োজন আছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সরকারী বরুচ-পরিকল্পনা (Baruch Plan) অনুযায়ী আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি Atomic Development Authority (ADA) গঠনের প্রস্তাব রয়েছে; এই প্রতিষ্ঠান হবে প্রয়োজন হলে পৃথিবীতে আণবিক বোমা তৈরির একমাত্র অধিকারী, এবং সেইজন্যে পৃথিবীময় যেখানে যত য়ুরেনিয়ম আর অন্যান্য আণবিক বিস্ফোরক পদার্থ রয়েছে সে সব সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা করবারও অধিকার থাকবে এর। রুশিয়ানরা প্রমত্ত হয়ে প্রত্যাখ্যান করে এ পরিকল্পনা। রাষ্ট্রদূত গ্রোমাইকো (Gromyko), স্তালিনের মুখপাত্র হিসাবে, ADA-কে ঘোষণা করেন অপ্রয়োজনীয় বলে; শুধু আমেরিকা তার সব আণবিক বোমা নষ্ট করে ফেলুক এবং আর যেন একটিও তৈরি না করে। কিন্তু কেমন করে লোকে জানবে রুশিয়া, কি আর্জেন্তিনা, কি স্পেন, কি তুরস্ক গোপনে বোমা তৈরি করছে কি না? রুশিয়া কি তার সমস্ত জায়গা কোনরূপ বাধানিষেধ ছাড়া পরিদর্শন করতে দেবে? বারকয়েক অবশ্য ক্রেমলিন অস্পষ্ট

ভাবে এরূপ ধারণা পোষণ করতে দিয়েছে যে বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে পরিদর্শন-কার্যের অনুমতি দেওয়া হবে। কিন্তু ধরাবাঁধা গণ্ডির মধ্যে পরিদর্শনকে পরিদর্শন বলে না, অতএব এ বিষয়ে রুশিয়ার জবাব হয়ে দাঁড়িয়েছে 'না'। স্বৈরতন্ত্র কখনও বাইরের লোককে, কিংবা এমন কি তার নিজের লোককেও, বিনা বাধায় সব দেখে শুনে ঘুরে বেড়াতে দিতে পারে না।

১৯৪৭ সালের ১৯শে মে নিউ ইয়র্কে এক বক্তৃতায় সোবিয়েতের সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব আঁদ্রেই এ. গ্রোমাইকো অবাধ পরিদর্শনে আপত্তি করেন, কারণ "ব্যাপারটা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আর স্বাধীনতার সঙ্গে সুসঙ্গত নয়।" তিনি আরও বলেন, "জাতিপুঞ্জ হচ্ছে বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমবায়। এর সদস্যদের সার্বভৌমত্ব আর স্বাধীনতা হানির অর্থ হচ্ছে এর ভিত্তিমূল ধ্বংস করা।" কিন্তু জাতিপুঞ্জ যে যুদ্ধভীতি সম্পর্কে কিছু করতে অপারগ তারও ভিত্তিমূল হচ্ছে গিয়ে এই সার্বভৌমত্ব।

আণবিক বোমা নিয়ন্ত্রণের জন্যে পরিকল্পিত বরুচ-পরিকল্পনা রুশিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে এসেছে এক ঘোর পরিবর্তন। এরই ফলে ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, গ্রীস আর তুরস্ককে কম্যুনিস্ট প্রসারের হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন। আমেরিকার হাতে রয়েছে আণবিক বোমা, এ-ই যদি হয় রুশিয়ার ভয়ের কারণ তবে তার পক্ষে বরুচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করাই উচিত ছিল, কেন না সে পরিকল্পনা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের

এবং অন্যান্য কোন দেশেরই হাতে আণবিক বোমা থাকত না, তা' কেউ তৈরিও করতে পারত না।

কিন্তু বরুচ-পরিকল্পনা চিরকালের জন্যে দিত রুশিয়ার পক্ষে আণবিক বোমা তৈরির পথ বন্ধ করে। সেটা সুবিধাজনক হতো না মস্কো-এর পক্ষে। সোবিয়েৎ সরকার চান আণবিক বোমা। নিজের আণবিক বোমা না থাকার চেয়ে ক্রেমলিন বরং এতে রাজি যে থাক আমেরিকার হাতেও আণবিক বোমা। কেন? অনেক রকমের সম্ভাব্য কারণ আছে: স্তালিন জানেন যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের, বিশেষতঃ আমেরিকার, লোকেদের মনে হিরোশিমা আর নাগাসাকির 'পরে আণবিক বোমা ফেলার দরুন যে অপরাধ-বোধ রয়েছে তার ফলে শান্তিপ্রিয় দেশগুলোর 'পরে আণবিক বোমা ফেলার সম্ভাবনা খুবই কম। আমেরিকার আণবিক বোমার ভয়ে তাই ভীত নন স্তালিন। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন যে, রুশিয়ার হাতে আণবিক বোমা থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের 'পরে বিশেষ এক সুযোগ লাভ হবে রুশিয়ার, কেন না যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড়তর জনবসতি, বড় বড় শহর, আর সুনিবিড় শ্রমশিল্পকেন্দ্র-সমূহ যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ করে রেখেছে। শেষকথা হচ্ছে এই যে, কোন বিষয়েরই আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে কোনরূপ আস্থা প্রদর্শন করেননি স্তালিন। জাতীয় শক্তির 'পরেই আস্থা তাঁর, আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থায় নয়।

আন্তর্জাতিকতার মধ্যে দিয়ে আণবিক বোমাকে অবৈধ ঘোষণায় রুশিয়ার অসম্মতি 'এক জগৎ' সম্বন্ধীয় ভাবাদর্শের বাস্তবে

পরিণতি-লাভকে ভীষণ ভাবে দিয়েছে পিছিয়ে, এবং এরই সঙ্গে অন্যান্য অসংখ্য ব্যাপারে রুশিয়ার অসহযোগিতার মনোভাব রাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়াই করে আণবিক সমর রোধ করার ব্যাপারটাকে জীবনমরণ-সমস্যার মতোই করে তুলেছে জরুরী।

এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে প্রথমেই চাই এক আন্তর্জাতিক সরকারের প্রতিষ্ঠা।

আণবিক শক্তির উন্নতিকারী সমিতিকে (Atomic Development Authority) চালাবে সে আন্তর্জাতিক সরকার : এর তলায় শ্রমশিল্পশক্তির একান্ত প্রয়োজন যাদের সেই সব অনগ্রসর জাতি-সমেত, যাবতীয় জাতি, অল্পকালের মধ্যেই আণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারবে, তা' ছাড়া তারা সবাই থাকবে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণে যার হাতে রয়েছে আণবিক বোমার ভাণ্ডার।

আন্তর্জাতিক সরকারের থাকবে এক পুলিশী ফৌজ। ইতিমধ্যে যে বিশ্ব-ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা' চালাবার ভারও থাকবে এর হাতে। রুহ্‌র্‌ অঞ্চলে শাসনকার্য চালাবে এই সরকার। ইয়াং-সী, রাইন, এবং অন্যান্য নদনদীতে 'টেনেসী-উপত্যকা-প্রতিষ্ঠান' গড়ে তুলবে এ। বিনা শুল্কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণেরও ভার থাকবে এর 'পরে। সাংস্কৃতিক আদর্শের আদান-প্রদানে উৎসাহ দান করতে হবে একে। (এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জাতিপুঞ্জে রয়েছে UNESCO, কিন্তু রুশিয়া যোগদান করেনি তাতে।) আশা করা যায় মানবিক অধিকার রক্ষা করবে

আন্তর্জাতিক সরকার। আন্তর্জাতিক জলপথসমূহ (দার্দানেলিস, সুয়েজ, জিব্রাল্টার, পানামা, রাইন প্রভৃতি) দেখাশোনা করবার ভার থাকবে এর 'পরে এবং তাতে করে দূর হবে পারস্পরিক ঈর্ষ্যা ও বিসংবাদ। কোন জাতীয় সরকার যে সব কাজে হাত দিতে অপারগ এমন সব প্রয়োজনীয় কাজ করবে এই আন্তর্জাতিক সরকার।

বিভিন্ন জাতীয় সরকারের শক্তি-হ্রাসের একটা উপায়-স্বরূপ হবে এই আন্তর্জাতিক সরকার। তাতে করে জাতীয় স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা যাবে কমে। অধিকন্তু এরই অধিকারে থাকবে যত প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পকেন্দ্র, উদাহরণস্বরূপ হলো রুহ্‌র্‌ অঞ্চলের কথা। কোন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়সঙ্ঘ (cartel) কর্তৃক, অথবা আমেরিকান মূলধনের দ্বারা, অধিকৃত হওয়ার চেয়ে এই ধরণের অধিকারে অধিকাংশ ইউরোপীয়ই সম্মতিদান করবে।

বিবিধ অর্থনৈতিক কাজ থেকেই তার চল্‌তি খরচা চালাবার মতো প্রচুর রাজস্ব পাবে আন্তর্জাতিক সরকার।

এই প্রাথমিক অবস্থায় আন্তর্জাতিক সরকার হবে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক প্রদত্ত সার্বভৌমত্বের অংশভাক। জাতিপুঞ্জের বিবিধ এজেন্সী আর বিবিধ আন্তর্জাতিক সংস্থার একত্র সমবায়ে গঠিত হবে এ সরকার।

কিন্তু জনগণের দ্বারা নির্বাচিত না হওয়া অবধি, এবং জনগণকে একসূত্রে বাঁধবার জন্যে আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত, কোন সরকারই প্রকৃতপক্ষে সরকার পদবাচ্য হয়ে ওঠে না।

১৯৪৫ সালের ২৩শে নবেম্বর হাউস-অব-কমন্সে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব আর্নেস্ট বেভিন যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তার অন্তরালে ছিল এই যুক্তিই। সে ছিল এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব। তিনি বলেন, "সমগ্র ভাবে বিশ্বের জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত এক বিশ্বসভা সৃষ্টির জন্যে আমাদের প্রয়োজন হয়েছে এক অভিনব গবেষণার ; এই বিশ্বজনগণের কাছেই দায়ী থাকবে সেই সব সরকার যারা মিলে গঠন করেছে জাতিপুঞ্জকে, এবং যারাই, প্রকৃতপক্ষে, করবে সেই বিশ্ব-আইন রচনা যা' তারা, অর্থাৎ এই জনগণ, তখন গ্রহণ করবে স্বেচ্ছায় এবং এক নৈতিক দায়িত্ব বলে তা' কার্যে পরিণত করে তোলবার অভিপ্রায়ে। কেন না একমাত্র তাদেরই ভোট থেকে সঞ্জাত হবে সে ক্ষমতা, এবং তাদেরই প্রত্যক্ষ-ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তব্য হবে তা' কাজে পরিণত করা।"

এই হচ্ছে বিশ্বজাতীয়তা এবং এ হলো গণতান্ত্রিক ভাবধারায় পরিসিক্ত। এই জন্যেই এ সব ভাবধারার তীব্র বিরোধিতা করে থাকে মস্কো। বেভিনের বক্তৃতার কয়েক সপ্তাহ পরে পূর্বতন পররাষ্ট্র-সচিব অ্যাণ্টনি ইডেন এই ধরণের এক উক্তি করেন, এবং তখন মস্কো রেডিয়ো থেকে বেভিন আর ইডেনকে উপলক্ষ্য করে বর্ষিত হতে থাকে অপভাষণ এবং তাঁদের "বিশ্ব-পার্লামেণ্ট" সম্বন্ধীয় ধারণাকে "অবাস্তব স্বপ্ন" এবং "ক্ষতিকর ও প্রতি-ক্রিয়াশীল" বলে বিদ্রূপও করা হয়।

এ সব বিষয়ে সোবিয়েৎ সরকার সম্পূর্ণ সুসঙ্গত আচরণ করে থাকেন। যখন তারা নিজেদের জাতীয় পার্লামেণ্ট সম্বন্ধেই

স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে না, তখন কী করে কোন স্বৈরতন্ত্র জনগণকে স্বাধীন ভাবে এক বিশ্ব-পার্লামেণ্টের জন্যে ভোট দিতে দিতে পারে—বিশেষতঃ যখন ধরে নেওয়া চলে যে তাতে থাকবে বিভিন্ন প্রতিযোগী দল এবং প্রতিযোগী পদপ্রার্থীরা ?

এই সব কারণে শুধু গণতান্ত্রিক দেশগুলোই আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হতে পারে। এ সব দেশ যদি রুশিয়ার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে, তবে কোনদিনই তাদের যাত্রা শুরু হবে না, এবং তাতে করে গণতান্ত্রিক জগৎকে চিরকালের জন্যেই বিভেদে বিভক্ত করে রাখতে পারবে—আর ঠিক এইটেই চায় সে। গণতান্ত্রিক ভেদবিভেদ গণতন্ত্রকে শক্তিহীন করে তুলতে সাহায্য করে থাকে মস্কৌকে।

রুশিয়াকে নিয়ে আন্তর্জাতিক শাসন কার্যতঃ অসম্ভব। রুশিয়াকে বাদ দিয়ে এ হচ্ছে কার্যতঃ সম্ভবপর।

আন্তর্জাতিক সরকার প্রতিষ্ঠার ফলে জীবনযাত্রা নির্বাহের এবং আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার এমন পরিষ্কার রকমের আর এমনই সব সুদূরপ্রসারী সুযোগ-সুবিধা ঘটবে যে, যে সব দেশ মস্কৌ-এর মুঠোর মধ্যে আটকে নেই সে সব দেশের প্রায় সবই স্বেচ্ছায় এসে যোগদান করবে তাতে। তবে যতদিন পর্যন্ত না এ সব দেশ আন্তর্জাতিক সরকারে যোগদানের সুযোগ-সুবিধা দেখে তাতে যোগদান করার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয় ততদিন অবধি তারা চলতে পারবে নিজেদের মনমতো পথেই। অনুরূপ ভাবে আবার রুশিয়ার যে-কোনও তাঁবেদারও এতে যোগ দিয়ে

মস্কো-এর প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারবে। একদিন হয়তো শেষে এতে এসে যোগদান করবে এক গণতান্ত্রিক রুশিয়াও।

আন্তর্জাতিক সরকার স্থাপনের ব্যাপারটাই তৎক্ষণাৎ গণ-তান্ত্রিক জগতের সমগ্র আবহাওয়া আর মনোভাবে পরিবর্তন সাধন করবে। ব্যষ্টি এবং জাতি সকলেরই পক্ষে এ হবে এক সঞ্জীবন সুধার মতো। যতদিন অবধি না সকলে যুদ্ধ নিবারণের এবং যুদ্ধের বিবিধ কারণ দূরীকরণের উপযোগী কোন এক কার্য-করী ব্যবস্থা হতে দেখছে ততদিন অবধি আজকের এই পরবর্তী যুদ্ধ সংক্রান্ত ভয় যাবতীয় নরনারী এবং দেশকে খিন্ন করে রাখতে চলেছে। শুধু এক আন্তর্জাতিক সরকারই করতে পারে এমনতর এক সুব্যবস্থা।

আন্তর্জাতিক সরকার গণতান্ত্রিক জগতে কমুনিজ্‌ম্‌-এর শক্তি হ্রাস করবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কম্যুনিস্টরা হচ্ছে জাতীয়তা-বাদী। বৈদেশিক বিপৎপাত থেকে নিজ নিজ দেশের রক্ষক বলে জাহির করে থাকে তারা নিজেদের। এতে করে অনু-বর্তীদের দ্বারা তাদের দল ভারী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে কম্যুনিস্টরা দাবি করে থাকে যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে রক্ষকস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে তারা, এবং কম্যুনিস্ট রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ কম্যুনিস্ট ফ্রান্সই অবসান ঘটাবে জার্মান আতঙ্কের। এতে করে ফ্রান্সে ঘটবে গণতন্ত্রেরও অবসান। কিন্তু আন্তর্জাতিক সরকার জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিরাপত্তা সম্বন্ধে

নিশ্চয়তা দান করতে পারবে ; তাতে করে দিন দিন বেড়ে উঠবে জার্মানী আর ফ্রান্সের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগ, এবং তারই ফলে ধ্বংস হবে এই দুই জাতির মধ্যেকার পুরুষ-পরম্পরাগত বিদ্বেষ ; ফলে নিশ্চিত হয়ে উঠবে ফরাসী সমৃদ্ধি। এই সহজ মনোভাব দুর্বল করে ফেলবে কম্যুনিস্টদের।

জাতীয়তা, বিভেদ, যুদ্ধভীতি, এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি, এ সব হলো কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর সহায়। হিংসাকে নীতি বলে প্রচার করে থাকে কম্যুনিস্টরা ; হিংসাকে কার্যে প্রয়োগ করে থাকে তারা। হিংসাকে কার্যে প্রয়োগ করার ব্যাপারে দক্ষতা রয়েছে তাদের। ইউরোপে ফাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল। ধর্মঘটে হিংসার প্রয়োগে পেছ-পা নয় তারা। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে হিংসা রয়েছে তাকে তারা উৎসাহ দান করে থাকে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে তার সুযোগ। তারা হচ্ছে পশুবলের উপাসক, বিসংবাদের মধ্যেই তাদের সমৃদ্ধি।

আমরা বাস করছি এক হিংসাময় যুগে ; এই হিংসা হলো কম্যুনিস্ট আর ফাসিস্তদের পক্ষে লাভজনক—এ জিনিষটিকে বৈধ বলে মনে করে তারা। গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে, এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও, সমস্যার সমাধান করুক, সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেতে থাকবে কম্যুনিজ্‌ম্‌।

বন্য পশ্চিমসীমান্তবর্তী (আমেরিকার) কোন শহরে, যেখানে বন্দুকধারী দস্যুদলের দয়ার 'পরে লোকের ধনপ্রাণ নির্ভর করছে

সেখানে, উপযুক্ত রকমের পুলিশী ক্ষমতা নিয়ে যদি কোন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটে তা' হলে যে ফল হয়, নিয়ম, নিরাপত্তা, এবং সন্নীতির 'পরে আন্তর্জাতিক সরকারেরও প্রভাব হবে সেই রকম। কাজকারবার আর লোকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা হবে স্বাভাবিক; ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত শালীনতার ঘটবে শ্রীবৃদ্ধি। ভয়ভাবনা যাবে দূরে। সোবিয়েৎ-বহির্ভূত জগৎ, এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস, রুশিয়ার লোকেরাও, ফেলবে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

তরোয়াল আর গাদাবন্দুকের জোরে জয়লাভ ঘটেনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। তেম্নি পুরাতন অচল ভাবধারা নিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে জয়লাভ করা যাবে না এ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধে। আণবিক-বিজ্ঞান, বৈদ্যুত-বিজ্ঞান, আর জেট-পরিচালনার যুগে আন্তর্জাতিকতার হাত থেকে রেহাই নেই। বিজ্ঞানের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে রাজনীতিকে।

রুশিয়া, বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দল, আর ফাসিস্‌ম্‌-এর পক্ষে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করা উপযুক্তই হয়েছিল। স্বৈরতন্ত্রের যা' উপজীব্য সেই ভয়, বিদ্বেষ, আর অযৌক্তিক উন্মাদনাকে বাড়িয়ে চলতে থাকে জাতীয়তাবাদ।

বাইরের জগতের সঙ্গে সোবিয়েৎ প্রজাদের পার্থক্য সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলবার জন্মেই প্রয়োগ করা হয়েছে জাতীয়তাবাদ। মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের মতো যে-কোনও ভাব সর্বনাশ করবে স্তালিনবাদের (Stalinism)।

জাতীয়তার জন্যে স্তালিন যখন বর্জন করেন আন্তর্জাতিকতাকে তখন তাঁর চেষ্টা হয় রুশিয়ার প্রাচীনপন্থী সনাতন গ্রীক চার্চকে জিইয়ে তোলার, আর ফিউডাল যুগের নাইট, রাজকুমার, আর জারদের স্মৃতি ঘিরে এক দৈবী দ্যুতিরেখা আঁকবার। এ সবই হচ্ছে এক ছাঁচে ঢালাই-করা।

জাতীয় কম্যুনিজ্‌ম্‌ হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল অতীতের পর্যায়-ভুক্ত ; রাইফেল যেমন আণবিক বোমার কাছে অসহায়, এ-ও তেম্নি অসহায় প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের কাছে।

আমেরিকার জাতীয়তাবাদ আর রুশিয়ার জাতীয়তাবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধলে তার সমাপ্তি ঘটবে কোন-একটির জয়লাভে এবং সমগ্র পৃথিবীর 'পরে একটি মাত্র দেশের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র আর জাতীয় কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর দ্বন্দ্ব সমাপ্তি লাভ করতে পারে শুধু এক আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রেরই জয়লাভে, কেন না তার পেছনে থাকবে প্রগতি, শুভবুদ্ধি, এবং স্বাধীনতার সমবেত শক্তি

জয়লাভ করবার জন্যে গণতন্ত্রকে এ বিষয়ে নিঃসংশয় হতে হবে যে, তা' বাস্তবিকই প্রগতি, শুভবুদ্ধি, এবং স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্ব করছে। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর এক আন্তর্জাতিক সরকার অবশ্যই এ তিনটির ধারক হয়ে উঠবে, এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে হবে শক্তিরও ধারক।

চতুর্দশ অধ্যায়

আপন অন্তরে করো সন্ধানী আলোকপাত

গণতান্ত্রিক জগতের সম্মুখে রয়েছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আর গণতান্ত্রিক উপাদানের সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব। তা' হলে পর গণতন্ত্র হবে ঘরে বাইরে স্তালিনবাদের আক্রমণ থেকে মুক্ত। এই হলো শান্তির পথ, সর্বোত্তম পন্থা, এবং সম্ভবতঃ তৃতীয় বিশ্ব-সমর নিবারণের একমাত্র উপায়। সোবিয়েৎ রুশিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধের উন্নতিবিধান করবারও এ-ই হচ্ছে পথ।

আণবিক শক্তি আর বৈমানিকতা ভেঙে ফেলতে শুরু করেছে জাতীয় রাষ্ট্রের (nation state) ধারণা। বাস্তবিক বহু বিভিন্ন অর্থেই বিস্ফোরক হয়ে উঠতে পারে আণবিক শক্তি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে এ। ঔপনিবেশিক জনগণের অভ্যুত্থানও এইভাবে করছে নানারূপ পরিবর্তন সাধন। গণতান্ত্রিক জগতের সংস্কার সাধন প্রয়োজন। রুশিয়া এই প্রক্রিয়াটিকেই কেবল করে তুলছে ত্বরান্বিত।

আমি এ কথা মনে করিনে যে, তার সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তা-বাদ, স্বৈরতন্ত্র, আর তুলনায় সাংস্কৃতিক, শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক ও দৈন্য সহকারে সোবিয়েৎ-বহির্ভূত জগৎকে দান করবার মতো বিশেষ কিছু আছে বলশেভিক রুশিয়ার।

একজন সাধারণ রুশ, তা' সে জারদের আমলের লোকই হোক আর সোবিয়েৎ যুগের লোকই হোক,—মোটের উপর বলতে গেলে এবং প্রধানতঃ সঠিক ভাবেই বলতে গেলে—ইউরোপকে একই সঙ্গে ভালোওবাসে আবার অপছন্দও করে থাকে। বিদেশীকে সে ভয়ও করে, ভক্তিও করে। ইউরোপকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে সে, আবার চায় তাকে ধ্বংসও করতে। ইউরোপের 'পরে রুশিয়ার কর্তৃত্ব চাইনে আমি ; ইউরোপকে দেখতে চাইনে রুশিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে। আমি বরং চাই ইউরোপেরই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক রুশিয়া। এ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করে যান লেনিন। বলশেভিকবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রুশিয়াকে ইউরোপে পরিণত করা। বলশেভিকবাদ ছিল অতীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। পরে স্তালিন এসে আঁকড়ে ধরলেন অতীতকে, আর তাঁর উদ্দেশ্যকে করে তুললেন বিকৃত। এখন মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে রুশিয়া ইউরোপকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে তাকে ধ্বংস করবার জন্যে। তাতে করে হবে রুশিয়ারও ক্ষতি, পৃথিবীরও ক্ষতি।

এশিয়ার যা' যা' প্রয়োজন তার কী আছে রুশিয়ার ? নিয়মানুবর্তিতা ? নিয়মানুবর্তিতা নেই রুশিয়ায়। নিয়মানুবর্তিতা হচ্ছে আপনা থেকে প্রযুক্ত। রুশিয়ায় রয়েছে ব্যবস্থাপন (regimentation), সে হলো জোর করে চাপানো ব্যাপার। সোবিয়েৎ প্রজার (citizen) চেয়ে ঢের বেশি নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে চীনা, কি ভারতীয়ের স্বভাবে। আজকের রুশ গান্ধী-প্রবর্তিত আইন

অসামঞ্জের নিয়মানুবর্তিতা পালনে অক্ষম। জমির বিলিব্যবস্থা?
জমির বিলিব্যবস্থার জন্যে মরে যাচ্ছে এশিয়া, কিন্তু স্তালিন-প্রবর্তিত একত্রীকরণ (collectivization) হচ্ছে এক নতুন ধরনের ভূমিদাসত্ব (serfdom); অধিকতর ব্যবস্থাপন। গতিশীলতা? হাঁ, রুশিয়ায় রয়েছে বটে গতি, রয়েছে সোরগোল। কিসের জন্যে? ব্যষ্টির জীবন-বিকাশ নেই তো সেখানে।

স্তালিন যদি এশিয়া শাসন করতেন তবে পিষে মারতেন তিনি এশিয়ার মধ্যে মহত্তম ভাবের বিকাশকে—মহাত্মা গান্ধীকে। যে সব এশিয়াবাসী চেয়ে আছে মস্কো-এর দিকে, এবং সামগ্রিক জাপানের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছে যারা, তারা সব হলো সব চেয়ে কম গান্ধীপন্থী, তারা হচ্ছে সব চেয়ে বেশি গান্ধীবৈরী। তারা সব হচ্ছে কাঁচা, সৌখিন সামরিক,—সেলাম-ঠুকিয়ে লোক আর উঁচুগলায় বুলি ঝাড়তে ওস্তাদ। তারা ভাবে তাদের চালচলন হচ্ছে স্বাধীন লোকের মতো, কিংবা এই হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের পথ। এ হচ্ছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর জাতীয় স্বাধীনতা দুই-ই হারাবার পথ। স্তালিন-প্রবর্তিত পন্থা অনুসরণ করে যিনি এ পন্থাকে প্রায় ত্রুটিহীন করে গড়ে তুলেছেন শুধু সেই স্তালিনের কাছেই আত্মদান করতে পারে তারা।

কম্যুনিস্টদের আকস্মিক আক্রমণ আর ব্যূহভেদ করবার কৌশলের একটা মারাত্মক মোহ রয়েছে দুর্বলচেতা ব্যক্তিদের 'পরে, কিংবা সেই সব উদারনৈতিক আর শ্রমিকদলীয়দের 'পরে যাঁরা দেখছেন তাঁরা বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারছেন না।

এই সব লোকেদের অনেক সময় লোভও হয় সামগ্রিকতন্ত্রীদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কৌশল আর 'নিয়মানুবর্তিতা'র পদ্ধতি নকল করতে : সোরগোলে মুখর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভাসমিতি, কুচকাওয়াজে রত সৈন্যদল, গগনভেদী চিৎকার, অতিরঞ্জিত প্রচারকার্য, এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি অসংযত অপভাষণ। ঠিক এম্নি, এশিয়ার নতুন নতুন গবর্মেন্টগুলোর মনে এ ভাব আসতে পারে যে, যদি তারা তাদের মাংসপেশী শক্ত করে তোলে, পাশবিক ভাবে পারে বলপ্রয়োগ করতে, এবং কী ক্ষিপ্রগতিতে এবং কেমন উৎসাহের সঙ্গে তারা এক-একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে তা' দেখিয়ে পারে তাদের "গতিশীলতা" প্রমাণ করতে তবেই তারা লাভ করবে সাফল্য।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সকল রকমের সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং রাজনৈতিক সমস্যার অন্তরালে রয়েছে একটি মূলগত সমস্যা : সে হলো নৈতিক সমস্যা, বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শোভন সম্পর্কের সমস্যা, আর এইখানেই দান করবার মতো বড়-কিছুই, কিংবা একেবারে কিছুই, নেই রুশিয়ার ; স্তালিনবাদ বস্তুটিই হচ্ছে দুর্নীতিমূলক।

গণতন্ত্র পারে মহাত্মা গান্ধীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে, মহাসেনানী স্তালিনের কাছে নয়। গান্ধীর কাছ থেকে গণতন্ত্র পারে তার নিজের মধ্যেই যা' সর্বোত্তম তাতে অবিচলিত নিষ্ঠা রক্ষা করার শিক্ষা গ্রহণ করতে। স্তালিনের অনুসরণ করার ফলে আত্মঘাতী হতে হবে গণতন্ত্রকে।

গণতন্ত্র চিরকালই ছিল অপূর্ণ, তবুও তার ফল হয়েছে শুভ। কিন্তু এখন তা' হয়েছে প্রবল ভাবে আক্রান্ত, এর অবস্থা এখন হচ্ছে রোগবীজাণুর সঙ্গে সংগ্রামরত দেহের মতো : দেহকে এখন থাকতে হবে সর্বোত্তম অবস্থায়, পেতে হবে নতুন সঞ্জীবনী সুধা, উন্মুক্ত করে দিতে হবে সংগুপ্ত শক্তির ভাণ্ডার। গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত মূল্যবান স্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলির—যারা কখনও কোন স্বৈরতন্ত্রের অধীনে বাস করেনি শুধু তারাই এ সব নিয়ে বিদ্রূপ করতে পারে—পরিধিবিস্তার এবং পূর্ণতা সাধন করতে হবে। কারণ রুশিয়া কর্তৃক এই দ্বন্দ্বে আহূত হওয়ার ফলে লোকে হয়ে উঠেছে সন্দিগ্ধ। এক অদ্ভুত অবস্থা এটা : সোবিয়েৎ য়ুনিয়নে না আছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, না আছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। কাচের ঘরে বাস করে থাকে বলশেভিকরা। তবুও ঢিল ছোঁড়া হলো তাদের স্বভাব। এ কাজ তারা যে করতে পারে তার কারণ হলো তাদের সে কাচের ঘর লোহার বেড়াজালে ঘেরা, আর কেউই এমন কোন ঢিল ছুঁড়তে পারে না যা' গিয়ে লাগবে সোবিয়েৎ-জনগণের গায়ে। তবুও পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট আর সোবিয়েতের সমালোচনা, এবং এদের কারও দ্বারাই অনুপ্রাণিত নয় এমন সব সমালোচনাও, লোককে গণতন্ত্রের মূলীভূত উপাদানসমূহ আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে দেখতে প্রবৃত্ত করেছে। তাঁরা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে দেখছেন এবং এর অধিকতর উৎকর্ষ দাবি করছেন।

গান্ধীর উপদেশ গ্রহণ করলে লাভই হবে গণতন্ত্রের : "আপন অন্তরে করো সন্ধানী আলোকপাত।"

সমগ্রভাবে গণতান্ত্রিক জগৎকে আজ অন্তরে সন্ধানী আলোকপাত করতে হবে। আত্মজিজ্ঞাসায় ব্রতী হতে হবে আজ গণতন্ত্রকে : যখন ফ্রাঙ্কোর স্বৈরতন্ত্রের মতো কয়েকটি স্বৈরতন্ত্র রয়েছে আজ গণতান্ত্রিক জগতের মধ্যেই তখন কি স্বৈর-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারে গণতন্ত্র? প্রধান শক্তিত্রয়, কিংবা শক্তিচতুষ্টয়ের পক্ষে ক্ষুদ্রতর দেশগুলোর মতামত-টুকুও না নিয়ে তাদের ভাগ্যনির্ণয় করা কি গণতন্ত্রসম্মত হয়েছে? কোন স্বাধীন জাতিকে গ্রাস করতে উদ্যত স্বৈরতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য দান করা কি গণতন্ত্রসম্মত? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির নিরাপত্তার বিনিময়ে বড় বড় শক্তির পক্ষে নিরাপত্তা কামনা করা কি গণতন্ত্রসম্মত : তারা কি জানে না যে ভূমিভাগে নেই কোনরূপ নিরাপত্তা? জাতিপুঞ্জে বড় বড় শক্তির যে ভেটো সংক্রান্ত অধিকার আছে তা' কি গণতন্ত্রসম্মত? উপনিবেশ-গুলোর স্বাধীনতা-স্পৃহাকে বিনষ্ট করা কি গণতন্ত্রসম্মত? "জোর যার মুল্লুক তার" এই কি গণতন্ত্রের নীতি, না, এ বন্য মনোভাব? অক্ষশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে পর যে সব জাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে সব জাতিকে বিশেষ না ভেবে চিন্তেই "শান্তিপ্রিয়" আখ্যায় অভিহিত করার অভ্যাস ত্যাগ করে, শুধু যারা এক বিশ্বজনীন সরকারের কাছে নিজেদের সার্বভৌমত্বের অংশবিশেষ

ছেড়ে দিতে প্রস্তুত তাদেরই এই আখ্যায় অভিহিত করবেন কি কূটনীতিকরা ?

ব্রিটিশ শ্রমিকদলীয় সরকার যদি সাফল্য লাভ করতে অসমর্থ হন তবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না গণতান্ত্রিক জগতের। ইউরোপে ইংল্যাণ্ডের এবং এশিয়ায় ভারতবর্ষের নিবিড় ও সমান সহযোগ ব্যতীত আমেরিকার যাবতীয় স্বর্ণস্তূপ আর পণ্যভাণ্ডার পূর্ব-গোলার্ধে রোধ করতে পারবে না কম্যুনিজ্‌ম্‌কে। যুক্তরাষ্ট্র যদি সমাজতন্ত্রী এবং মিশ্র অর্থনীতি-ব্যবস্থার 'পরে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রগুলোর প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন, কিংবা অন্ততঃপক্ষে সহনশীল, হয়ে উঠতে না পারে তবে ইউরোপ এবং এশিয়ায় কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর পরাভব সম্ভবপর হবে না। এখন যখন ইংল্যাণ্ডে বহুকালের মতো মানবিক শক্তির অল্পতার ফলে বেকার অবস্থায় থাকার ভয় দূর হয়ে গেছে তখন ব্রিটিশ ট্রেড-য়ুনিয়ন-গুলোর উচিত বিদেশী শ্রমিকদের সেখানে আগমনের বিরোধিতা করা থেকে নিবৃত্ত হওয়া। ফ্রান্সের এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠা উচিত যে, উৎপাদনে অক্ষম, অসুখী, খিন্ন জার্মানী শেষ অবধি গিয়ে ভিড়বে রুশ-জার্মান ঐক্যের মধ্যে এবং সেই সম্মিলিত দল ফ্রান্স শুদ্ধ ইউরোপের 'পরে করবে আধিপত্য বিস্তার। জার্মান-দের উচিত তাদের ক্রিয়াকলাপ এবং ভোটের দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা যে, রুশিয়ার হস্তশায়ী আয়ুধবিশেষ হয়ে থাকতে নারাজ তারা। তার অনুকরণীয় পররাষ্ট্রনীতি সত্ত্বেও, অস্ট্রেলিয়া নিষিদ্ধ করে রেখেছে অশ্বেতকায় জাতিদের সেখানে বসতিস্থাপন।

ব্যাপারটা গণতন্ত্রসম্মতও নয়, পৃথিবীতে গণতন্ত্র স্থাপনের অনুকূলও নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের নীতি গণতন্ত্রের প্রতি এশিয়ার আস্থাহানি করে থাকে। হিন্দু ও মুসলিমের পক্ষে ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর প্রজা বলে নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করার অভ্যাস শুরু করা উচিত। শুধু অস্ত্রবলে কম্যুনিস্টদের পরাভূত করতে পারবে না চীনের জাতীয় সরকার; যতদিন অবধি কুয়োমিন্‌টাং দল এবং কেন্দ্রীয় সরকার মৌমাছির চাকের মতো ভর্তি হয়ে থাকবে সেই সব জমিদার আর রণনায়কের দ্বারা যাঁরা হচ্ছেন ভূমিসংস্কারের বিরোধী, যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্দাম হয়ে উঠেছে উৎকোচ-গ্রহণ, ফাটকার কারবার, আর আমলাতান্ত্রিক অকর্মণ্যতা, ততদিন অবধি চীনা কম্যুনিস্টদের বন্ধুদল ভারী হয়ে উঠতে থাকবে জমি-লোলুপ কৃষককুলের মধ্যে।

এ সব প্রয়োজনই সহজে মেটাতে পারা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক জগতে যদি থাকে এক আন্তর্জাতিক সরকার। এরূপ এক সরকারের মধ্যে থেকে সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক দেশগুলো অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত করবে আদর্শ।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশকে সন্ধানী আলোকপাত করতে হবে অন্তরে। কুসংস্কার আর ভয়ের বশে ভোটের অধিকার সঙ্কুচিত করা গণতন্ত্র নয়। যেখানে কোন ক্যাথলিক, কি ইহুদী, সরকারী কাজে নির্বাচিত হতে পারে না, যেখানে শুধু ধনীরা কিংবা "অভিজাতরা" কূটনৈতিক, কি অপর পদে নিযুক্ত হবার অধিকারী, যেখানে ধনী ব্যক্তিরা আর দুর্নীতিপরায়ণ,

অন্যায়কারী রাজনীতিকেরা রাজনৈতিক দলবিশেষকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, এবং যেখানে জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত ব্যক্তিরা উচ্চ বেতনভুক লবিগৃহের লোকদের পরামর্শ অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করে থাকেন, গণতন্ত্র সেখানে বিদ্রূপের বস্তু।

কোন গবর্ণমেণ্ট কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বহিষ্কারে উৎসাহী? অত্যাচারিত এবং বিপদগ্রস্ত লোকদের আশ্রয় দান করতে পরাঙ্মুখ কি কোন গবর্ণমেণ্ট? এরূপ গবর্ণমেণ্ট ভঙ্গ করছেন গণতন্ত্রের নীতি।

যারা আমাদের সঙ্গে একমত তাদের স্বাধীনতা দান করা সহজ। গণতন্ত্রের পরীক্ষাই হচ্ছে যারা ভিন্ন মতাবলম্বী তাঁদের স্বাধীনতা। ব্যক্তি কি শ্রেণী তাদের মতামতের জন্যে অত্যাচার ভোগ করে থাকে কি? অথবা তারা কি তাদের মতামত প্রকাশ করতে অসুবিধা বোধ করে, কিংবা তা' প্রকাশ করা অসম্ভব কি তাদের পক্ষে? এ-ই হচ্ছে স্তালিনবাদ। হিটলার, মুসোলিনি, এবং জাপানীরা যা' করেছে তা' হচ্ছে এই। এ-ই করে থাকেন ফ্রাঙ্কো। পল রোবসন যা' বলতে কি গাইতে চান তা' বলুন তিনি মুখের কথায়, কি তাঁর গানে। গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনাকে ভোঁতা করে দিতে পারেন আপনারা তাঁকে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দান করে। রুশিয়ায় স্তালিনবাদের বিরুদ্ধে কথা কইতে, কি গান গাইতে পারবেন না তিনি। তাঁকে সে কথা বলতে পারেন আপনারা, বলতে পারেন তাঁর বন্ধুবর্গকে, এবং তাই করে গণ-

তন্ত্রীদের দল ভারী করে তুলতে পারেন। যাই হোক না কেন, আপনারা পারেন না একই সঙ্গে স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাস রাখতে এবং স্বাধীনতা অস্বীকার করতে।

যে ব্যক্তি রয়েছে উপবাসী, কিংবা বেকার, অথবা যে শিক্ষা সে পেতে চায় তা' থেকে বঞ্চিত, সম্পূর্ণ স্বাধীন নয় সে। অস্বাস্থ্যকর, এবং অপরাধ ও দুর্নীতির লীলাভূমি বস্তিগুলো গণতন্ত্র-সম্মত বস্তু নয়। গণতন্ত্র যদি তার শিক্ষকদের বেতন দানে কৃপণতা করে তবে তাতে করে ঘটে না গণতন্ত্রের উৎকর্ষ। বিত্তহীন বার্ধক্যের ভয় প্রায়ই মাঝবয়সী লোকদের মনে সঞ্চার করে থাকে কঠিনতা, লোভ, পাপাচার, আর ফাটকাবাজির মোহ, এবং তাতে করে গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত নৈতিকতার ক্ষয় সাধন করে থাকে।

জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের সুদূরপ্রসারী অভাব এবং অনিরাপত্তার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন নির্বাচন এবং মতামত প্রকাশ ও দল গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতাও গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দান করতে পারে না।

যে ব্যক্তির প্রবংশ কিংবা ধর্মের 'পরে চলে অত্যাচার সে-ও সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরের নিকট এক শহরতলিতে একবার আমি দেখি এক প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে 'বাধানিষেধের সুব্যবস্থা'। তার অর্থ হলো এই যে কোন ইহুদী বা নিগ্রোকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না সেখানে। এ হচ্ছে হিটলারী ব্যবস্থা। এ আবার 'সুব্যবস্থা' হবে কী করে?

ব্যাপারটা খৃষ্টধর্মসম্মতও নয়। কী করে গণতন্ত্রের পর্যায়ে পড়বে এ হেন ব্যবস্থা ?

গণতন্ত্রে সামগ্রিকতন্ত্রসম্মত যা' কিছু রয়েছে তা' বাতিল করে দাও, সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের ঘরে বাইরে যে সব শত্রু আছে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি যাবে সরে। রচনাত্মক কোন কাজই করো না, তার বদলে কমুনিস্টদের কিংবা অন্য সকলের দিকে চেয়ে শুধু চেঁচাও 'লাল' বলে, তাতে করে লোককে কমুনিস্ট করে তুলবে তুমি। করো হিটলারের মতো আচরণ, তার ফলে তৈরি হয়ে উঠবে যত নাৎসী, ফাসিস্ত, আর কম্যুনিস্ট।

প্রত্যেকটি গণতন্ত্রী দেশই যদি নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে নিজ নিজ গণতন্ত্রবিরোধী ত্রুটিবিচ্যুতি আবিষ্কার করে সে সব সংশোধন করত তবে পৃথিবীময় এ জীবনমরণ-সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো না কোনও গণতন্ত্রী দেশকে।

প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেক নর, নারী, ও শিশুকে পালন করে চলতে হবে গান্ধীর শিক্ষা, এবং সন্ধানী আলোকপাত করতে হবে তার আপন অন্তরে। প্রত্যেকেই ব্যাপারটাকে যতখানি বাস্তবে পরিণত করে তুলতে চায় তা' করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লং বীচে এক ডিনার-সভায় স্তালিনের রুশিয়ার বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক যুদ্ধ সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে আমি গান্ধীর এই ধারণাটির উল্লেখ করি যে, বর্তমান জগৎ অতিরিক্ত মনোযোগ দান করেছে "পাওয়ার" 'পরে, প্রায়

কোনরূপ মনোযোগই নেই তাই "হওয়ার" 'পরে। "থামো, গড়ে তোলো নিজেকে" এই হলো মহাত্মার জীবনবেদ। সভার কাজ শেষ হলে পর একজন লোক এসে চিকিৎসক বলে তাঁর আত্মপরিচয় দিলেন।

খানিক উদ্বেগের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি, "সাধারণ একজন প্রজা কী করতে পারে ?"

আমি বল্লুম, "দেখুন, দৈনিক আপনি দেখে থাকেন পঞ্চান্ন জন, কি আশি জন রোগী।"

তিনি বল্লেন, "আমার পারিশ্রমিকের হার কমিয়ে দেব আমি।"

গণতন্ত্রের দিক থেকে এ রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রকৃতি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন সে চিকিৎসক।

এক সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে দুটি কচি ছেলেকে একটা দোকানের সামনে সবে-পড়া ভারী ভারী বরফের চাঁই কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করতে দেখে থেমে দাঁড়ালুম আমি। খুব পরিশ্রমের সঙ্গেই কাজ করছিল তারা। যখন তাদের একজন এক মুহূর্ত পিঠ সোজা করবার জন্যে কাজ থামালে তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কে কাজে লাগিয়েছে তোমাদের ?" দোকানটা তখন ছিল বন্ধ।

সে বল্লে, 'কেউ না ; আমরা এম্নি এম্নি কাজ করছি।" আমি তাদের কিছু পয়সা দিতে গেলুম। "না, ধন্যবাদ", বল্লে তারা, "আমরা হচ্ছি বয়-স্কাউট।"

যখন তারা বড় হয়ে উঠবে তখনও কি তারা সমাজ-সেবার জন্যে এরূপ প্রস্তুত থাকবে? না কি তখন "জীবন", অর্থাৎ যার মানে হলো "পাওয়ার" জন্যে উন্মত্ত ধাবন, তা' নষ্ট করে ফেলবে তাদের? সংসারে ভালো ছেলের সংখ্যা কি বয়স্ক ভালো লোকের চেয়ে বেশি নয়?

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেড-য়ুনিয়ন গড়ে তোলা আর ধর্মঘট করার জন্যে নিন্দাবাদ হয়ে থাকে। "স্কুলের শিক্ষক হচ্ছেন জনসেবক।" শিক্ষকের যেমন রয়েছে শিশুদের সম্বন্ধে সামাজিক কর্তব্য, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, রেডিয়ো, গ্রন্থ-প্রকাশনের ব্যবসায়, প্রত্যেকেরই তেমনই রয়েছে বয়স্কদের সম্বন্ধে সামাজিক দায়িত্ব। সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী কি নিজেকে জনসেবক বলে বিবেচনা করে থাকেন? অথবা তাঁর ধারণা কি এই যে সংবাদ পরিবেষণ, শিক্ষাদান, এবং উন্নতিবিধান তাঁর কাজ নয়, তাঁর কাজ হচ্ছে তাঁর পাঠকদের মজা দেওয়া, আর খুশী করা, আর কাগজ বিক্রী করা?

প্রায় যাবতীয় ব্যক্তিই সামাজিক দায়িত্ব অবহেলা করে থাকেন। গণতন্ত্রী দেশের প্রজারা সাধারণতঃ মনে করেন যে, ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের কর্তব্যের ইতি হলো। আর যদি তাঁরা কখনও কোন কংগ্রেসের সদস্যকে পাঠান কোনও টেলিগ্রাম, কিংবা সরকারের ক্রিয়াকলাপের 'পরে রাখেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং সরকারের ভুলচুকের বিরুদ্ধে করেন তীব্র প্রতিবাদ, তবে নিজেদের পৌর গুণগ্রাম সম্বন্ধে নিজেদের অভিনন্দিত করতে

থাকেন তাঁরা। কিন্তু স্বাধীন নির্বাচন আর সুশাসনের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ গণতন্ত্র।

মহাত্মা গান্ধী বলেন কোন-একটা অবস্থার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম, অবস্থাটা গুরুতর আকার ধারণ করে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবার পূর্বেই তাদের উচিত সেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা। ভাষান্তরে, তাঁর আস্থা আত্মচেষ্টা আর সমবেত চেষ্টার 'পরে, ঠিক আইন পাশ করার 'পরে নয়। তাঁর হচ্ছে চরম মতামত: আইনের দ্বারা সময়বিশেষে সাহায্য হয় বটে। কিন্তু আইন করে ভ্রাতৃস্নেহ আনতে পারবে না তুমি, পারবে না সত্য, কি দাক্ষিণ্য, কি ন্যায়সঙ্গত আচরণ, কি সহিষ্ণুতা এনে দিতে। আইনের খাতায় গণতন্ত্রের নাম উঠেছে বলেই গণতন্ত্রকে যে জীবন্ত ব্যাপার বলে স্বীকার করতে হবে তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ নেই। শুধু জীবন্ত মানুষেরাই তাদের প্রতিটি কার্যের দ্বারা একে জীবন্ত ব্যাপারে পরিণত করে তুলতে পারে।

গান্ধীর চিত্তে নেই কোনরূপ বিদ্বেষ, নেই ঈর্ষ্যা, নেই বিষ, নেই বিরক্তি। ত্রিশ বৎসর ধরে যুদ্ধ করে এসেছেন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কখনও কোনও ইংরেজের প্রতি একটিও কটুবাক্য ব্যবহার না করে। যে সব ভাইস্‌রয় তাঁকে পাঠিয়েছেন কারাবাসে তাঁদের অবধি বন্ধু হয়ে রয়েছেন তিনি। একটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করেছেন তিনি, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধতা করেন নি। তাঁর পদ্ধতিই তাঁকে করেছে অপরাজেয়। এতে করে পেয়েছেন তিনি অভাবনীয় সংঘাতশক্তি।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে বিহার প্রদেশে এক প্রার্থনাসভায় গান্ধী বলেন, "জমিদারি ব্যবস্থার ভক্ত নই আমি। প্রায়ই আমি এর বিরুদ্ধে কথা বলেছি। তবুও আমি খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করছি যে, আমি জমিদারদের শত্রু নই। শত্রু বলে মানিনে আমি কাউকেই। সর্বজনস্বীকৃত এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সংস্কারের রাজপথ হলো আত্মনিগ্রহ। এ পথ থেকে সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে পর তার ফলে শুধু হয় যে অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে হিংসাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল সে অন্যায়ের রূপান্তর মাত্র।"

মুসলমানদের 'পরে অত্যাচার করার জন্যে হিন্দুদের শাস্তি-বিধানের অভিপ্রায়ে বিহারে আরম্ভ হয়েছিল এই সফর। এই একই সফরের সময় গান্ধী এক প্রার্থনাসভায় বলেন যে তিনি এক তিরস্কার-পূর্ণ পত্র পেয়েছেন। তিনি বলেন, "কেউ যদি আমায় গালি পাড়ে তবে কখনও তা' ফিরিয়ে দেওয়া চলতে পারে না আমার পক্ষে। এক অন্যায়ের পরিবর্তে আর-এক অন্যায় ফিরিয়ে দিলে পর প্রতিকারের স্থানে হয় তার বৃদ্ধি। বলবত্তর হিংসার দ্বারা হিংসার নিবৃত্তি সাধন করা যায় না, এ হচ্ছে এক সনাতন নীতি…।"

কত সময়ই না একটিমাত্র কটুবাক্য পর্যবসিত হয়েছে এক প্রচণ্ড কলহে আর মনোভঙ্গে, কারণ যাদের মধ্যে এর উৎপত্তি তারা পারে না ক্ষমা করতে, তা' প্রত্যাহার করতে, কি শান্ত হতে! কত সময়ই না কোন-এক সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি অধিকতর

ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে, যার কোনও ক্ষমতাই নেই এমন এক ব্যক্তির 'পরে নিজের গায়ের ঝাল মেটায়! কত সময়ই না অত্যাচারিতেরা চায় অত্যাচারী হয়ে উঠতে! নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে, কি নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে, কত অশোভন ব্যাপারই না ঘটে থাকে! একই ব্রতে ব্রতী নিষ্ঠাবান লোকেদের মধ্যেও শুধু পরস্পরের পদগৌরব সম্বন্ধে ঈর্ষ্যা থেকেই কতই না প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়!

জনসেবার জন্যে যখনই প্রয়োজন তখনই নিজেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে দিয়ে থাকেন গান্ধী। সেই হচ্ছে তাঁর শক্তি। সর্বদাই কর্মরত তিনি, তবুও সর্বদাই বিনম্র। তাঁর মহত্তম অবদান হচ্ছে তাঁর নিজের জীবনযাত্রাপদ্ধতি।

মহাত্মাকে আদর্শস্বরূপ সম্মুখে রেখে, গণতান্ত্রিক দেশের প্রজারা অর্থ, গর্ব, মর্যাদা, এবং ক্ষমতাকে কর্মের মূলমন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান না করে, যে সব বিরোধ, সংঘাত, এবং অন্যায় স্বাধীনতাকে খর্ব করছে এবং ব্যষ্টির বিকাশকে দিচ্ছে বাধা, সে সব সমাধানের চেষ্টা শুরু করতে পারেন।

অবস্থাবিশেষে পরিবর্তনশীল হলেও, বিশেষ একটা সীমার বাইরে অর্থের দ্বারা চিত্তের প্রশান্তি লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ, অর্থের অনুসরণ অশান্তিও আনতে পারে। দরিদ্রদের মতোই ধনীরাও মনে করতে পারে যে তারা নিরাপদ নয়। সুখ, ক্ষমতা, আর গর্বের জন্যে অর্থসঞ্চয় করা হচ্ছে ব্যষ্টির এক ব্যাধি, এবং ব্যষ্টি থেকেই তা' সমগ্রভাবে সমাজেরও এক ব্যাধি হয়ে

দাঁড়ায়। মানুষ যদি এ ব্যাপারটাকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেত (আর এ সব কী জন্যে এ প্রশ্ন যদি সে নিজেকে করে সততার সঙ্গে তার উত্তরও দিত তবে অবশ্যই সে দেখতে পেত) তবে সে পেতে পারত এক পৃথক রকমের মূল্যবোধ। আজ, প্রায় সব লোকের চোখেই, অর্থ হচ্ছে সব চেয়ে মূল্যবান পদার্থ; এ হচ্ছে পরিমাপ আর মাপকাঠি দুই-ই: "দশ লাখ ডলারের মতো আমার মনে হচ্ছে নিজেকে।"

অর্থকে যে এইরূপ উন্মত্ত হয়ে চরম মূল্যের প্রাধান্য দান করা হয়েছে, তার ফলে লোকের ব্যক্তিত্বের ঘটেছে সর্বনাশ। আধুনিক ব্যক্তিত্ববাদের উৎকণ্ঠাজনক ভিত্তি হলো কার আছে কত, কে কেমন লোক তা' নয়। এ দু'টি ব্যাপার সর্বদা একও নয়।

"কাঠখোট্টা" ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা নিঃশেষে অপচয় করে ফেলেছে পেন্‌সিন্‌ভ্যানিয়ার তৈলসম্পদ। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের কাষ্ঠসম্পদ নষ্ট করেছে এবং এখনও করে চলেছে তারা। ধনদৌলতে নিজেদের ঐশ্বর্যবান করে তুলেছে তারা, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র করে তুলেছে সমাজকে। ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পুরস্কৃত করে থাকে সমর্থকে, কর্মশিক্ষাপ্রাপ্তকে, পরিশ্রমীকে; কিন্তু তা' লুঠের মাল দান করে থাকে বলবানকে, কূটবুদ্ধিকে, এবং দুর্নীতিপরায়ণকেও।

গান্ধীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হচ্ছে তাঁর অহিংসায় আস্থা থেকে। আর কিছুই নয়, শুধু ন্যায়বোধ এবং তাঁর অটল

সঙ্কল্প নিয়ে অন্যায়ের শক্তিকে অবজ্ঞা করে থাকেন তিনি। যখন গান্ধী অবজ্ঞা করেন অর্থের শক্তিকে তখন তিনি হচ্ছেন ধনতন্ত্রের বিরোধী। যখন অবজ্ঞা করেন তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে তখন হলেন গণতন্ত্রী।

গান্ধী হচ্ছেন স্তালিনের প্রতিষেধক, কারণ মহাত্মা হলেন শক্তিমান সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির প্রতীক। গান্ধী দণ্ডায়মান হন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির বিপক্ষে—এবং করেন জয়লাভ। এ কাজ সাধন করেন তিনি বিনা অর্থে, বিনা হিংসায়, এমন কি বিশেষ দল গঠনের দ্বারাও নয়। একটি ভাবাদর্শের বলে এবং সদুপায় ও সদুপদেশের ফলে যে শক্তি সঞ্জাত হয় তারই দ্বারা এ কার্য সাধন করেন তিনি। কেউ কেউ বলবেন ভারতবর্ষের বাইরে কাজ হয় না এতে। কে দেখেছে চেষ্টা করে?

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিয়ে বড়াই করে থাকে আমাদের সমাজ, এবং প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ভাবে যে ধনদৌলত আর মানযশের পথ খোলা রয়েছে তার সামনে। তবুও ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে এই অনুভূতি যে, সামাজিক ভাবে সে হচ্ছে তুচ্ছ এবং অকর্মণ্য। বিজ্ঞান, কিংবা উৎপাদন অথবা বণ্টন সম্বন্ধীয় কোন সমস্যা উপস্থাপিত করো তার সামনে, তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে সমস্যার সমাধানে লেগে যাবে সে। উত্থাপন করো দারিদ্র্য কিংবা রাজনীতি, অথবা বিশ্বশান্তির সমস্যা, সে বলবে, "কিছুই করা যেতে পারে না এ বিষয়ে।" একমাত্র অর্থ আর ক্ষমতা লাভের জন্যে যার প্রয়োজন তা' ছাড়া ব্যক্তির

আর প্রায় সকল শক্তিই হরণ করতে আরম্ভ করেছে আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। গান্ধী হচ্ছেন প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে একক অথবা দলগত ভাবে ব্যক্তির প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতায় আস্থাবান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল লক্ষ লক্ষ লোক। যুদ্ধজয়ের জন্যে লক্ষ লক্ষ বেসামরিক ব্যক্তি দিয়েছে রক্ত, কর্ম, অর্থ, সময়, এবং সাহসিকতা। যুদ্ধজয়ের জন্যে আরও খারাপ অবস্থায় বেঁচে থাকতে কিংবা মরতে প্রস্তুত রয়েছে মানুষ। যুদ্ধ নিবারণের জন্যে আরও ভালো ভাবে থাকতে রাজি নয় লোকে। গান্ধীবাদ চায় ভালো ভাবে থাকুক মানুষ। সন্ন্যাসীর বেশে থাকতে বলে না তা' মানুষকে। তা' বলে মানুষকে কম স্বার্থপর হতে, কম লোভ করতে, টাকা টাকা করে কম মাথা খারাপ করতে, কম আত্মসর্বস্ব হতে; তা' বলে মানুষকে বেশি দয়ালু হতে, বেশি সৎ হতে, বেশি মৈত্রীসম্পন্ন হতে, যারা ভিন্ন রকমের তাদের প্রতি অধিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে, অধিক জনসেবার বোধ ফুটিয়ে তুলতে। কেউ কেউ বলেন, 'না, এ হচ্ছে বড়ই অস্পষ্ট।' প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ অবধি না প্রথম লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছ তুমি ততক্ষণ অবধি অস্পষ্টই বটে এ সব কথা।

শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, কারখানার মালিক, জমিদার, আপিসের ম্যানেজার, শিল্পী, সম্পাদক, ট্রলী-পরিচালক, পুলিশ-ম্যান, দোকানদার, খদ্দের, শ্রমিক, সকলেই, শুধু ইচ্ছে করলেই,

প্রায় প্রত্যেক মিনিটে নিজের আর পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। যাঁরা ধনদৌলত আর ক্ষমতার মালিক তাঁরা এই বর্তমানের অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই, কিংবা এর কিছু কিছু রদবদল করে, জীবনযাত্রার পন্থার উন্নতি বিধান করতে পারেন।

আইন কিংবা ব্যবসার খাতিরে যতটা দরকার, অনেকে তাঁদের আশেপাশের লোকজনের প্রতি তার চেয়েও সদ্ব্যবহার করে থাকেন; তাঁরা তা' করে থাকেন তাঁদের চরিত্র-মাধুর্যের গুণে। প্রত্যেকেই সচরাচর যেরূপ আচরণ করে থাকে, ইচ্ছে করলে তার চেয়ে ভালো আচরণ করতে পারে। নিজের এবং সমাজের উন্নতির জন্যে প্রত্যেকটি সুযোগ অন্বেষণের এবং সদ্ব্যবহারের চেষ্টা আরম্ভ করলে, বর্তমানের এই পরাজিতের মনোভাব যাবে দূর হয়ে, লোকেও আর বলবে না, "এ বিষয়ে কিছুই করতে পারিনে আমি। এ আমার সাধ্যের অতীত।"

গান্ধীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তি হলো মানুষের 'পরে তাঁর আস্থা। তাঁর প্রিয় বুলি হচ্ছে, "করো, নয় মরো।" আর যেহেতু মরতে চান না তিনি, তাঁর নীতিকথার সারমর্ম হলো "করো।" যারা বলে এ বিষয়ে কিছুই করবার নেই তারা সব সচরাচর হচ্ছে সেই সব লোক যারা কোন দিনই দেখেনি চেষ্টা করে। আমাদের চারধারে রয়েছে নানারূপ সামাজিক ক্ষত, তার পরিচর্যা দরকার; রয়েছে রাজনীতি, তার বিশুদ্ধীকরণ দরকার; রয়েছে

অন্যায়, তার প্রতিবিধান আবশ্যক; রয়েছে অর্থনৈতিক পরিবর্তন, তার গতিবেগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আটাত্তর বৎসর বয়সে, অগণিত বাধাবিপত্তির মুখে, গান্ধী গেলেন বিদ্বেষ আর জিঘাংসার বিষে জর্জর এক রক্তপ্লাবিত ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের শত্রুতার দুরূহ সমস্যা সমাধান করতে। কোন কোন দুষ্কৃতকারীর অনুতাপ জাগিয়ে তুললেন তিনি; অপর কেউ কেউ, তাদের মধ্যে হত্যাকারীরাও ছিল, এসে আত্মসমর্পণ করলে তাঁর কাছে, কিংবা পুলিশের কাছে; অপর অনেকে প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ দান করলে টাকা। সমস্যার সমাধান করে যাননি তিনি, কিন্তু তাঁর ক্ষমতায় যতটা কুলিয়েছে ততটাই ছিল তাঁর কাছে ন্যূনতম কর্তব্য।

পা রাখবার মতো এক ফালি স্বাধীন ঠাঁই পেলে তাঁর ব্যক্তিগত শক্তির যাদুদণ্ড-স্পর্শে পৃথিবী আন্দোলিত করে তোলবার দায়িত্ব নিতে সম্মত আছেন গান্ধী। বড়-কেউই গান্ধী হয়ে উঠতে পারে না, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে গান্ধীর একবিন্দু শক্তির সঞ্চার ঘটলে তার সমবেত ফলে মস্কো-এর সমস্ত স্তালিনদের, আর শতকরা ৫০ ভাগে গড়া সকল স্তালিন আর হিটলারকে, আর শতকরা ১০ ভাগ আর ২ ভাগে গড়া যে সব স্তালিন আর হিটলার গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে বাস করে গণতন্ত্রের বিশুদ্ধতা হানি করছে তাদের সবাইকে, পরাভব স্বীকার করতে হবে।

গান্ধীর শক্তিতে স্তালিনের পরাভব হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ব্যক্তিগত শালীনতা, অতএব গণতন্ত্র, অতএব শান্তি, রক্ষা করার একমাত্র পন্থা।

আপন অন্তরে করো সন্ধানী আলোকপাত।

শেষ